রায়-পরিবার

গার্হস্থ্য উপন্যাস

'ললনা-সুহৃদ্' 'দম্পতি-সুহৃদ্' ইত্যাদি প্রণেতা

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৩২৯

মূল্য ১।০ দেড় টাকা

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সপ্তদশ সংস্করণ

প্রিণ্টার—অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস্"
৭৭ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্র

দেবোপম, পূতচরিত্র, পূজ্যপাদ, জ্যেষ্ঠতাত,

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল

শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এল্

মহোদয়ের পাদপদ্মে,

গ্রন্থকারের বহু যত্ন ও বহু পরিশ্রমের ফল

এই ক্ষুদ্র

'রায়-পরিবার'

গ্রন্থ

ভক্তি ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় লিখিত উপন্যাসের বড় একটা অভাব নাই। তবে, নিঃসঙ্কোচে আপন আপন ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা পিতা-মাতার হস্তে প্রদান করা যাইতে পারে, বা সকলের সাক্ষাতে পাঠ করা যাইতে পারে, এরূপ উপন্যাস বড় অধিক নাই, এ কথা বলিলে, বোধ হয়, অন্যায় বলা হইবে না। এদিকে, শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই উপন্যাস পাঠের প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। ইহা বিবেচনা করিয়া, এই উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে আর একখানি নূতন উপন্যাস লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইলাম। 'রায়-পরিবার' গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইহাতে অতিরঞ্জিত বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই। বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহারই একটি চিত্র এই পুস্তকে অঙ্কিত হইয়াছে। এই সামান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গীয় সমাজ বিন্দুমাত্র উপকৃত হইলেই আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

আমতলী,
আশ্বিন, ১৩০২ সাল। } শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রায়-পরিবার

গার্হস্থ্য উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিনটি বৌ

পবিত্র-সলিল ব্রহ্মপুত্র নদের একটি ক্ষুদ্রতর শাখার উপর গঙ্গাতীর একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে কালীকান্ত রায় নামক একজন মধ্যবিত্ত-অবস্থাপন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাস।

বৈশাখ মাস—বড় গরম পড়িয়াছে। একদিন অপরাহ্নে রায় মহাশয়ের অন্দর-বাটীর একখানা ইষ্টকালয়ের ছাদের উপর বসিয়া পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া একটি রমণী কাঁথা সেলাই করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটি যুবতী তাহার নিকট গিয়া, একটু ব্যস্ততা-সহকারে, উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'দেখ বড়দিদি! এমন ক'রে ক'দিন পারা যায়? আজ রাঁধ্‌বে কে?'

'এখনো বেলা আছে, ভাব্‌না কি? তবে আজ কর্ত্তা-ঠাকুর বাড়ী আস্‌তে পারেন, একটু শীগ্‌গির হ'লেই ভাল।'

এই কথা বলিয়া রমণী হাতের ছুঁচ কাঁথাতে গাঁথিয়া রাখিয়া অপরার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। বলিল, 'দেখ মেজ-বৌ এক কাজ ক'ত্তে পার? নইলে এর উপায় নাই।'

মেজ-বৌ ব্যস্ততা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কাজ বড়দিদি?'

বড়-বৌ মেজ-বৌর অতি নিকটস্থ হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, 'দেখ মেজ-বৌ! সংসারের প্রায় সকল কাজই আমরা করি, কিন্তু তবু আমাদের নাম নাই—পোড়াকপালের এম্‌নি গুণ, সুখ্যাতের বেলা ছোট-বৌ।'

মেজ-বৌ। ঐ দুঃখেই ত বলি! নইলে আমরা ত বুড়ো হই নাই; কাজ-কম্ম যে জানি না, তাও নয়। যদি বশ থাকত, তবে এমন তিনটে সংসারের কাজ একা ক'রে দিতে পাত্তুম।

মেজ-বৌর বাক্যে বড়-বৌ মনে মনে আনন্দিতা হইয়া বলিল, 'দেখ, মেজ-বৌ! এর একটা কিছু ফিকির ক'ত্তে হবে—যে ক'রেই হউক, ছোট-বৌকে জব্দ করা চাই; নইলে আমাদের মান থাকে না। তোমাতে আমাতে যদি এক হ'য়ে কাজ করি, তবে আর ক'দিন লাগে?'

মেজ-বৌ। আমারও দিদি, তাই ইচ্ছে। আর দেখেছ দিদি! ক'দিন ধ'রে কি দেমাকটাই প্রকাশ ক'চ্চে? ওর সোয়ামী কলেজে পড়ে' ইংরিজি জানে, কল্‌কেতায় থাকে ব'লে যেন মাটিতে পা দিতে চায় না—

মেজ-বৌর কথা শেষ না হইতেই বড়-বৌ বলিল, 'আর, ওর কাপড় পরিষ্কার হওয়া চাই, বিছানা একটু ময়লা হ'লে চলে না, হপ্তা হপ্তা চিঠি আস্‌ছে—যেন কি একটা ভারি কাণ্ড।'

মেজ-বৌ। কিন্তু দিদি! কি ক'রে জব্দ ক'রবে? শ্বশুর, শাশুড়ী সকলেই যে ছোট-বৌর দিকে টেনে কথা কয়!

বড়-বৌ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাত নাড়িয়া ব্যস্ততা সহকারে বলিল, 'তা হউক না,—আমার কথা শোন—ছোট-বৌ রেঁধে আস্‌বে আর আমরা তার রাঁধা ব্যান্নুনে নুন মিশিয়ে দেব—ভাতের হাঁড়িতে বালি ঢেলে দেব—তবেই তার রান্নার ব্যাখ্যানা বেরুবে।'

মেজ-বৌ। আর তার আস্ত কাপড় রোদে শুকাতে দিলে টেনে ছিঁড়ে দেব।

বড়-বৌ। আরও কত কৌশল আছে। যে যেমন, তার সঙ্গে তেম্‌নি ব্যাভার না ক'ল্লে কি হ'য়ে থাকে? কেমন, পার্‌বে ত?

মেজ-বৌ। কেন পার্‌বো না?—কিন্তু দিদি! তোমায় সব ব'লে দিতে হবে, নইলে আমার বুদ্ধিতে কুলাবে না।

তারপর মেজ-বৌ একটু হাসিয়া বলিল, 'সত্যি, বড়দিদি ! আমার কিন্তু এত কৌশল মনে হয় না !'

বড়-বৌ। তার জন্য ভাবনা ক'র্ত্তে হবে না, যদি আমার কথামত কাজ কর, তবে আর চিন্তা নাই। কিন্তু মেজ-বৌ ! এক কথা—এ সব কথা যেন কখনও প্রকাশ না হয়—সাবধান ! তা হ'লে কিন্তু সর্ব্বনাশ হবে।

তারপর সিঁড়ির দিকে পদধ্বনি শুনিয়া একটু চমকিত হইয়া ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া বলিল, 'চুপ কর—ঐ আস্‌ছেন বুঝি !'

কথা শেষ করিয়া বড়-বৌ একটু দূরে গিয়া অন্য দিকে চাহিয়া চুল খুলিয়া আবার চুল বাঁধিতে লাগিল। মেজ-বৌ তদবস্থায় সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি সুন্দরী রমণী দুই বৎসরের একটি বালক কোলে করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ছাদের উপর আসিয়া বলিল, "এই যে বড়দিদি এখানে ! ননী-গোপাল 'মা মা' ক'রে কাঁদ্‌ছিল। আমি সমস্ত বাড়ী খুঁজে তারপর ননীকে নিয়ে এখানে এলুম।" এই কথা বলিয়া সুন্দরী সস্নেহে দুই তিনবার ননীর গণ্ডদেশে মধুর চুম্বন করিল।

বড় বৌ চুলবাঁধা শেষ করিয়া ছোট-বৌর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'বেশ ক'রেছ বোন্‌, আমি কাঁথা সেলাই বন্ধ ক'রে, সবে উঠ্‌ছি, এখনি নীচে যেতুম। তা' খোকাকে এনেছ, বেশ ক'রেছ।'

কথা সমাপ্ত করিয়া বড়-বৌ ননীকে আপন কোলে টানিয়া লইয়া স্তন-পান করাইতে লাগিল। মেজ-বৌ চুপ্‌ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কোন কথা বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট-বৌ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিষণ্ণ-বদনে বলিল, 'আমি এসেছি ব'লে তোমাদের কথা বন্ধ হ'ল কেন, বড়দিদি ? আমি চ'লে যাব ?'

বড়-বৌ মুখ ভার করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিল, 'না, চ'লে যাবার দরকার কি ? এ কি আর আমাদের কেনা ছাদ !'

ছোট-বৌ এই কথায় আরও দুঃখ পাইল। বলিল, 'বড়দিদি! আমি যদি কোন দোষ ক'রে থাকি, বল। তোমরা ত আমার পর নও। আমি সবে নূতন এসেছি। এখনও সংসারের কাজ-কর্ম্ম ভাল জানি না—তোমরা শিখিয়ে দিলে শিখ্‌তে পারি।—আমি কি তোমাদের একজন নই?'

ছোট-বৌর কাতরোক্তিতে কাহারও মন ভিজিল না। বড়-বৌ স্বাভাবিক-কর্কশ-স্বরে বলিল, 'তা তুমি আমাদের একজন হ'তে যাবে কেন বোন্! তোমার সোয়ামী কলেজে পড়ে, তুমি লেখাপড়া জান, চিঠি-পত্র লিখ্‌তে পার, পশমের কাজ ক'ত্তে পার—'

মেজ-বৌ এই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া বলিল, 'আমরা তোমায় কি শিখাতে পারি, বরং তোমার কাছে শিখ্‌তে পারি। আমরা কি এক অক্ষর লিখ্‌তে পারি, না তোমার মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে পারি?'

ছোট-বৌ দুঃখিতা হইয়া বলিল, 'ঠাট্টা কর কেন, মেজ-দিদি?'

মেজ-বৌ বড়-বৌকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'শুন্‌লে বড়-দিদি! এ ঠাট্টা হ'ল! তা তোমার সঙ্গে আমাদের মুখ্যু মানুষের কথা কওয়াই ভার! আমরা ত ভাই শাস্তর-টাস্তর পড়ি নি।'

বড়-বৌ মেজ-বৌর কথায় সায় দিয়া বলিল, 'এ আর ঠাট্টা কি?—আচ্ছা ছোট-বৌ! যদি রাগ না কর, তবে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—'

ছোট-বৌ। রাগ ক'র্‌ব কেন দিদি? আমার ভালর জন্যে ব'ল্‌বে, তাতে আমি রাগ ক'র্‌ব কেন?

বড়-বৌ। বলি, মেয়েমানুষের অত লেখা পড়া ক'রে লাভ কি? মেয়েমানুষ ত আর খাতা লিখ্‌তে ব'স্‌বে না, আপিসেও বেরুবে না!

মেজ-বৌ। ইস্কুল ক'রে ছেলেও পড়াবে না!

ছোট-বৌ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সরলভাবে বলিল, 'তা লাভ লোক্‌সান্ তত বুঝ্‌তে পারি না, আমার বলে, ভাই অবসর পেলে দু এক পাতা পড়ি।—এতে ত কিছু ক্ষেতি দেখ্‌তে পাই না দিদি!'

বড়-বৌ। ক্ষেতি নাই কেন, বুঝ্‌লেই ক্ষেতি। যে সময়টা বই নিয়ে থাক, সে সময়ে সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌লে কি লাভ হয় না?

ছোট-বৌ। কাজের সময় ত আমি বই ছুঁই না। দুপুরবেলা কিংবা রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে থাকে, তখন ইচ্ছা হয় দু পাতা পড়ি, না হয় ঘুমিয়ে থাকি। এতে কাজের কি বাধা হয় দিদি?

বড়-বৌ একটু বিরক্তিসহকারে বলিল, 'তোমার কথায় আঁটা দায়! না বুঝ্‌লে কি ক'রে বুঝাব বোন্! এই দেখ দেখি, রাত্তিরে যে আলো জ্বেলে বই পড়, এতে যে তেল খরচ হয়, সেটা কি লোক্‌সান হয় না? তেল ত পয়সা দিয়ে আন্‌তে হয়! ঘর ক'রে থাক্‌তে গেলে, সব দিক্ দেখ্‌তে হয়। এমন ক'রে সামিগ্‌গীর লোক্‌সান ক'র্‌লে কি সে ঘরে লক্ষ্মী থাকে?

ছোট-বৌ। না হয়, এখন থেকে আর তেল পুড়িয়ে বই পড়্‌ব না। তোমরা আমায় যা ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'রব—আমি কি তোমাদের ছাড়া? কিন্তু দিদি! তোমাদের পায়ে পড়ি—অমনতর ক'রে তোমরা আমার উপর মুখ ভার ক'রে থেকো না, এতে আমার বড় দুঃখ হয়।

অতঃপর মেজ-বৌ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নীচের আঙ্গিনা হইতে শব্দ হইল—

'বৌ! ছোট-বৌ! তোমরা সব কোথায় গেলে?'

'মা ডাক্‌ছেন' বলিয়া ছোট-বৌ দ্রুতপদে নীচে নামিল। বড়-বৌ অবসর বুঝিয়া মেজ-বৌর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে বোন্! কেমন একচখো শাশুড়ী! এ দিকে বলা হ'চ্ছে 'তোমরা সব কোথা গেলে,' কিন্তু নামটি কর্‌বার বেলা ছোট-বৌর! যেন আমরা এ সংসারে কেউ নই!"

অনেকক্ষণ দুই জনে কি পরামর্শ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল—দুই জনে এক সঙ্গে নীচে নামিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালীকান্ত রায়ের পারিবারিক অবস্থা

রায় মহাশয়ের বয়স কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ একজন খ্যাতনামা মহাজনের অধীনে মাসিক দশ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। মহাজনের নাম উদ্ধবচন্দ্র পাল। গঙ্গাতীর গ্রামের দেড় ক্রোশ উত্তরে গণেশপুর বন্দর। এই বন্দরে উক্ত মহাজনের প্রধান গদি স্থাপিত। এখানে চারি পাঁচজন মুহুরী আছে। রায় মহাশয় এই গদির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। এই গদিতে টাকা ধার দেওয়া, হুণ্ডী ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের কাজ হয়। রায় মহাশয় অতি সৎপ্রকৃতি-বিশিষ্ট সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি—মহাজনের মঙ্গলের প্রতি তাহার সর্ব্বদা দৃষ্টি। মহাজন এজন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন ও ভালবাসেন। মহাজন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাকে কিছু কিছু দস্তরী প্রদান করিতে হইবে—ইহা রায় মহাশয়ের প্রাপ্য ছিল। এ কারণে বেতন কম হইলেও রায় মহাশয়ের প্রতি মাসে গড়ে পঞ্চাশ টাকার কম উপার্জ্জন হইত না। এতদুপরি মহাজন তাঁহার সচ্চরিত্রতায় এত প্রীত ছিলেন যে, দোল, দুর্গোৎসব, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি রায় মহাশয়ের বাড়ীর প্রত্যেক কার্য্যেই তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। এ কারণে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া প্রতিমাসেই কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত হইত। রায় মহাশয় এই উদ্বৃত্ত টাকাগুলি সুদে খাটাইতেন। পঁচিশ বৎসরের অল্প অল্প সঞ্চয়, সুদসহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উহা এখন বিশ সহস্র টাকায় পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সামান্য পৈতৃক ভূসম্পত্তিও ছিল।

রায় মহাশয়ের পরিবারে এখন বালক-বালিকাসহ ষোল সতর জন লোক—স্বয়ং কর্ত্তা, গিন্নীঠাকুরাণি, তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, দুই পৌত্র, তিনটি পৌত্রী, ভৃত্য ভজহরি, পরিচারিকা মঙ্গলা এবং কখন কখন আরও দুই একজন অতিরিক্ত লোক থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকমলের বয়স ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে; মধ্যম কৃষ্ণকমল তাহার তিন বৎসরের কনিষ্ঠ; কনিষ্ঠ স্বর্ণকমলের বয়স একুশ বৎসর। কালীকান্ত রায়ের শরীরের বর্ণ শ্যাম, মুখশ্রী ও গঠন সুন্দর; তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা কৃপাময়ী সময়ে সুন্দরী ছিলেন। রামকমল ও কৃষ্ণকমল পিতার বর্ণ ও অঙ্গ-গঠন, আর স্বর্ণকমল পিতার গঠন ও জননীর গৌরকান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। বড়-বৌ পঞ্চবিংশতি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনটি সন্তানের মা হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বেশ আছে—দেখিলে উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়; শরীরের রং খুব পরিষ্কার না হইলেও কাল নহে; নামটি তাঁহার মহামায়া। মেজ-বৌ মুক্তকেশী, উনিশ বৎসরের যুবতী, দুটি বালিকার মা, শ্যামবর্ণা হইলেও কুরূপা নহেন; তাঁহার সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল চক্ষু, সুগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদ, নিতম্বচুম্বী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি দেখিলে কেহই তাঁহাকে সুন্দরী না বলিতে পারে না। ছোট-বৌ সুকুমারী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা। তাহার সুকুমার দেহ-তটিনীতে সবে জো'র লাগিয়াছে, এখনও ভরে নাই, ভর ভর হইয়াছে; সুকুমারী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুগঠিতা, সুকেশা ও সুনয়না; তাহার উজ্জ্বল দীপ্তিপূর্ণ, সুন্দর ও সরলতাব্যঞ্জক মুখশ্রী, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপূর্ণ আয়তলোচন, নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি, সুগঠিত ও সুলক্ষণাক্রান্ত হস্ত, পদ ও অঙ্গগঠন ইত্যাদির সমাবেশ তাহাকে বাস্তবিকই বড় সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। রামকমলের একটি কন্যা—নবলক্ষ্মী, বয়স আট বৎসর; আর দুটি পুত্র—নন্দগোপাল ও ননীগোপাল; বয়স যথাক্রমে পাঁচ বৎসর ও দুই বৎসর। কৃষ্ণকমলের দুটি কন্যা—সুশীলা, সরলা। সুশীলা চারি বৎসরের বালিকা, সরলা দেড় বৎসরের শিশু। এই পাঁচটি বালকবালিকার মধ্যে

কে অধিক সুন্দর, তাহা বলা সহজ নহে। শরীরের রঙ্ প্রায় সকলেরই একরূপ—উজ্জ্বল শ্যাম; মুখের গঠনও একরূপ। তবে রামকমলের পুত্র-কন্যাগণ বয়সের তুলনায় ক্ষীণকায়; আর সুশীলা ও সরলা একটু হৃষ্টপুষ্ট;—এইমাত্র প্রভেদ। ভৃত্য ভজহরির বয়স প্রায় চল্লিশ। মঙ্গলা বালবিধবা; শৈশব-সময় হইতে সে এই পরিবারে প্রতিপালিতা হইয়া আসিতেছে। তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইয়াছে।

কালীকান্ত রায়ের যখন প্রথম 'চাকরী' হয়, রামকমল তখন পাঁচ বৎসরের বালক। রায় মহাশয়ের হাতে তখন পয়সা ছিল না। পৈতৃক ধন যাহা কিছু ছিল, চাকরী হইবার পূর্ব্বে কয়েক বৎসরে তাহা ব্যয় করিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং রামকমলকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারিলেন না। বঙ্গবিদ্যালয়েও সে অধিক দিন যাতায়াত করে নাই। রায় মহাশয় নিজেই অবকাশমত তাহাকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতেন। সেই পিতৃদত্ত বিদ্যাবলে রামকমল এখন গণেশপুরের বন্দরে আর একজন মহাজনের গদিতে আট টাকা বেতনে মুহুরীগিরি করিতেছে। কৃষ্ণকমল ছয় বৎসরে সাতটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িয়া বিদ্যা শেষ করে। প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষার পরই তাহার স্কুল-পরিবর্ত্তন হইত, নতুবা যে, তাহাকে চিরদিনই এক শ্রেণীতে থাকিতে হয়। এইরূপে কৃষ্ণকমল দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সে যে স্কুলে পড়িত, একজন ইংরেজ স্কুলপরিদর্শক সেই স্কুল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকমলের সৌভাগ্যক্রমে তাহার উপরই প্রশ্ন হইল। তাহার উত্তর শুনিয়া সাহেব, তাঁহার সহচর ও শিক্ষকগণ অনেকক্ষণ হাসিলেন: সাহেব তাহার নামটি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যাইবার সময় কৃষ্ণকমলের হাত ধরিয়া তাহাকে পঞ্চম শ্রেণীতে লইয়া গিয়া, তথায় বসাইয়া রাখিয়া, চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে অবতীর্ণ হওয়ায় স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র, দপ্তরী, দ্বাররক্ষক—সকলেই কৃষ্ণ-কমলের অগাধ বিদ্যার পরিচয় পাইল—সকলেই তাহার প্রতি বিদ্রূপকটাক্ষ-

পাত করিতে লাগিল। কৃষ্ণকমলের বড় লজ্জা বোধ হইল। সে বাড়ীতে যাইয়া পিতার নিকট বলিল, 'আমাকে কম মাইনে দিতে বলে, আর পুরাণো বই প'ড়্‌তে বলে, আমি পড়্‌ব না।'

সেই অবধি তাহার বিদ্যা শেষ হইল। এখন সে গঙ্গাতীর গ্রামের পাঠ-শালার গুরুমহাশয়রূপে মাসে চারি পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। কনিষ্ঠ স্বর্ণকমল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার এক কলেজে পাঠ করিতেছে।

কালীকান্ত রায় গঙ্গাতীর-গ্রামের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ হয়। 'চাকুরী'-প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়াও পৈতৃক দোল-দুর্গোৎসব কিছুই ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বাড়ী দুই খণ্ডে বিভক্ত। অন্দরবাটী ইষ্টক-নির্ম্মিত, জীর্ণ-প্রাচীর-বেষ্টিত। বহির্ব্বাটীতে চারিখানা সুন্দর সুদৃঢ় চৌ-চালা গৃহ। অন্দরবাটীতে দুইখানা ক্ষুদ্র ইষ্টকালয়—প্রত্যেক ইষ্টকালয়ে দুটি কক্ষ ও একটি বারান্দা; একখানা বৃহৎ চৌ-চালা গৃহ। আর একখানা ইষ্টকা-লয়ের প্রাচীর পর্য্যন্ত হইয়া রহিয়াছে। চৌ-চালা গৃহের পশ্চাদ্ভাগে চারি-খানা ক্ষুদ্র গৃহ—রন্ধনশালা, মঙ্গলার গৃহ, ঢেঁকিঘর ইত্যাদি। রায় মহাশয় তিন পুত্রের জন্য তিনখানা ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তবে একখানা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে বটে। সম্প্রতি একখানা ইষ্টকালয়ে রামকমল সপরিবারে বাস করিতেছে; আর একখানার এক প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণকমল, অপর প্রকোষ্ঠে বাড়ী আসিলে স্বর্ণকমল শয়ন করে। স্বয়ং রায় মহাশয় প্রথমাবধি ঐ চৌ-চালা গৃহেই বাস করিয়া আসিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুকুমারী ও গিরিবালা

আষাঢ় মাস,—অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা সুকুমারী অপরাহ্ণে, ননীগোপালকে ক্রোড়ে লইয়া আপন শয়ন-কক্ষের একখানা দীর্ঘ কাষ্ঠাসনে বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছে। ননী-গোপাল স্থিরনেত্রে পত্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পত্র পাঠ করিতে করিতে সুকুমারী তিন চারিবার ননীর মুখচুম্বন করিল। এমন সময় চৌ-চালা গৃহ হইতে শব্দ হইল, 'ছোট-বৌ—ছোট-বৌ!'

সুকুমারী ব্যস্ততা-সহকারে 'যাই মা' বলিয়া পত্রখানা হাতে লইয়াই শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, 'কেন মা?'

গিন্নী কৃপাময়ী ছোট-বৌকে দেখিয়া বলিলেন, 'রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেটাকে কোলে ক'রে থাক, তোমার কোমরে ব্যথা হয় না? কাল তোমার বাপের বাড়ী থেকে আম, সন্দেশ এসেছে, এ পর্য্যন্ত একটুও মুখে দেওনি। এই আম সন্দেশ নাও, খাও দেখি।'

বলিয়া একখানা পিতলের থালায় কয়েকটি আম ও সাত আটটি সন্দেশ দিলেন। সুকুমারী 'খাব এখন' বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, গিন্নী তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ঐ ত তোমার দোষ! আর 'খাব এখন' কথায় কাজ নাই, এখনি আমার সাম্‌নে ব'সে খেতে হবে। সকলে খেয়েছে, শুধু তুমিই বাকি।"

সরলা সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইয়া ঈষৎ হাসিল। গিন্নী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমার সাম্‌নে খাবে, তাতে লজ্জা কি মা! এখানে ব'সে না খাও, তোমার ঘরে নিয়ে যাও। শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে এসো।—

আমার পাকা চুল বেছে দিতে হবে, যাও মা লক্ষ্মি! শীগ্‌গির খেয়ে এসো। ঐ পত্রখানা কার, মা! স্বর্ণকমলের বুঝি—বাছা ভাল আছে ত?'

তাহার হস্তে যে স্বামীর পত্র রহিয়াছে, তাহা সুকুমারীর এখন মনে হইল। লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখখানা রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল; হঠাৎ সে কোন কথা বলিতে পারিল না। গিন্নি তাহার অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, 'লজ্জা কি মা!—স্বর্ণকমল ভাল আছে ত?'

এইবার সুকুমারী কোনরূপে অস্ফুট স্বরে বলিল, 'হাঁ মা!'

লজ্জায় সুকুমারী শাশুড়ীর নিকট আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, আম-সন্দেশের থালাটি গ্রহণ করিয়া নিজ কক্ষে গেল। সন্দেশের থালাটি ও পত্রখানা তাকের উপর রাখিয়া ননীগোপালের গণ্ডদেশ চুম্বন করিতে লাগিল। ননী ঐ থালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল, 'আমি হাবো।' সুকুমারী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিল, 'তুমি হাবে? না, তোমায় খেতে দিব না।' বলিয়া পুনরপি তাহার মুখ-চুম্বন করিল। তারপর একখানা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া একটু একটু করিয়া ননীর ক্ষুদ্রমুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। একখানা ছুরী দ্বারা একটা আমের খোসা ছাড়াইয়া তাহাও একটু একটু করিয়া কাটিয়া ননীকে খাওয়াইতে লাগিল। এমন সময় দ্বারদেশে একটু শব্দ হইল—সুকুমারীর চক্ষু সেই-দিকে গেল। একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সুকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমারী তাহাকে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-মনে বলিল, 'এস ভাই, তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

যুবতী সুকুমারীর পার্শ্বে বসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—'কি, আমার কথা ভাবছিলে, না—নন্দরাণী মা-যশোদা হ'য়ে, সাধের ননীগোপালকে ননী খাওয়াচ্ছিলে?'

এখানে যুবতীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহার নাম গিরি-বালা। গিরিবালা কালীকান্ত রায়ের জ্ঞাতিকন্যা—তাহার পিত্রালয়ও

গঙ্গাতীর গ্রামে, রায়-বাড়ী হইতে তাহার পিতৃ-গৃহ অল্প ব্যবধান। গিরিবালার পিতার অবস্থা ভাল নহে, কিন্তু সে চন্দনবাগ গ্রামের জমীদার রাধাকান্ত লাহিড়ীর পুত্রবধূ। রাধাকান্তের পুত্রের নাম দীনেশচন্দ্র। দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলের সমপাঠী ও পরমসুহৃদ্। সুকুমারীর পিত্রালয়ও চন্দনবাগ গ্রামে—গিরিবালার স্বামি-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে। সুকুমারী বাল্যকাল হইতে দীনেশবাবুকে 'দাদা' বলিয়া ডাকে। দীনেশবাবু সুকুমারীর চরিত্র-মাধুর্য্যবশতঃ তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। চন্দনবাগ গ্রামেই গিরির সহিত সুকুমারীর প্রথম পরিচয় ও সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। গিরিবালা যেমন সুন্দরী, তেমনই বুদ্ধিমতী। স্বামীর অনুগ্রহ ও চেষ্টায় সে একটু লেখা-পড়াও শিখিয়াছে। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ইত্যাদি গ্রন্থ সে পড়িতে ও বুঝিতে পারে। সম্প্রতি সে স্বামীর গৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে।

সুকুমারী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কবে এলে ভাই ?'

'এই ত আজ চার দিন।'

'এর মধ্যে একদিন আমায় দেখ্‌তে এলে না।'

'রোজ আস্‌ব ভাবি, কিন্তু ভাই, দিন-রাত বৃষ্টি—এক পা বেরুবার যো নাই।' তারপর বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওই দেখ! ফের বৃষ্টি নাব্‌ল! বাড়ী যাব কি ক'রে, ভাই ?'

'এখানেই আজ থাক না, কেন ?—সেখানকার সকলে ভাল আছে ত ?'

'হাঁ, সকলেই ভাল আছে।'

'দীনেশ দাদা ভাল আছেন ?'

গিরিবালা সুন্দর মুখে মধুর হাসি হাসিয়া, সুকুমারীর গণ্ডদ্বয় টিপিয়া দিয়া বলিল, 'খপ্‌ ক'রে, অত বড় নামটা নিয়ে ফেল্‌লে ?'

সুকুমারী হাসিয়া বলিল, 'নামটা কি অনেক বড় ?'

গিরিবালা যেন একটু ব্যস্ততা-সহকারে বলিল, 'অনেক বড় না ? দ-র

দীর্ঘ ঈ, দন্ত্য নয়-একার, তালব্য শ, চ, নয়-দয়-র-ফলা—দেখ দেখি কত বড় !'

মৃদুহাসিনী সুকুমারী বলিল, 'তা, বড় বৈ কি ! তিনি ভাল আছেন ত ?'

গিরি। ভাল মন্দ কেমন ক'রে জান্‌ব ভাই ! কলেজ খুলেছে—সাত আট দিন হ'ল, কল্‌কেতায় চ'লে গ্যাছেন ! যাবার বেলা ব'লে গেলেন, সেখানে পৌঁছেই চিঠি লিখ্‌ব ; কিন্তু, কৈ ?—আজও চিঠি পেলুম না ! তা, ওদের কি জান, বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চ'লে গেলে, আর বৃন্দাবনের কথা মনে থাকে না।'

বলিয়া যুবতী একটু মৃদু হাসি হাসিল।

সুকুমারী। সবে আট দিন হ'য়েছে—এখনো চিঠি আস্‌বার সময় বয়ে যায় নাই।

গিরিবালা ব্যস্ততা-সহকারে বলিল, 'কেন ?—হিসাব কর না কেন। পথে এক দিন, সেখানে পৌঁছে একটু সুস্থির হ'তে দু'দিনই ধর ; ডাকে চিঠি আস্‌তে দু'দিন।—হ'লো পাঁচ দিন। আজ আট দিন হ'লো, তবু পত্র আস্‌ছে না। লিখ্‌লে এতদিন দু'খানা পত্র আস্‌তে পারে। যাক্‌ সে কথা। বলি, তোমার তিনি গেলেন কবে ?'

সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিল, 'তাও আজ সাত আট দিন।'

গিরি। চিঠিপত্র পেয়েছ, না সিন্নি মান্‌তে হবে ?

সুকুমারী স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, সে সহসা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—একটু হাসিল মাত্র।

গিরিবালা সেই হাসিতেই উত্তর বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'বুঝেছি—হঁ, বুঝেছি ! আপনার কাজ গুছিয়ে, পরকে বলা হ'চ্ছে যে, এখনো পত্র আস্‌বার সময় বয়ে যায় নাই। বটেই তো ! কেন, আমরা বুড়ো হ'য়েছি ব'লে বুঝি ?—তা বুড়ো হয়েছি ব'লে কি সোহাগ ক'ত্তে ভুলে গিয়েছি ? তা—পত্রখানা, আমায় এখনি দেখাতে হ'চ্ছে।'

সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইল—লজ্জা হইলেই তাহার সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিত। গিরিবালার কথায় সে যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'তুমি বুড়ো হ'লে কবে ভাই ?

গিরিবালা কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর করিল; 'কেন, এই আট দিন ধ'রে। মেয়ে মানুষ, স্বামী কাছে থাক্‌লেই যুবতী, স্বামী দূরে গেলেই বুড়ী—তা বয়স যতই হউক না। তুমি যে এই চৌদ্দ বছরের সুন্দর ছুঁড়ী, তুমিও ত এখন বুড়ী হ'য়েছ !'

বলিয়া যুবতী সুকুমারীর চিবুক ধরিয়া মাথাটি নাড়িয়া দিয়া বলিল, 'হুঁ —যাক্, এখন পত্রখানা দেখাবে কি না বল ?'

সুকুমারী। দেখ্‌তে চাও দেখ্‌বে, কিন্তু তার আগে একটা কাজ কত্তে হ'বে—

গিরি। বল, পত্রখানা দেখাবে ? একটা ছেড়ে দশটা কাজ ক'র্‌ব এখন।

'আচ্ছা দেখাব। এখন একটু জলযোগ কর দেখি।'

বলিয়া সুকুমারী সেই আম সন্দেশের থালাটি গিরিবালার সম্মুখে রাখিল। গিরিবালা তাহা দেখিয়া বলিল, 'এখন আমি খেতে পার্‌ব না, ভাই !'

সুকুমারী। গরীবের বাড়ীতে খেলেই বড়-মানুষের জাত যায়, না ? খেতেই হ'বে।

বলিয়া সুকুমারী মৃদু হাসি হাসিল।

গিরিবালা এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ওসব কথা ব'ল্‌বে, তবে একা সব খেয়ে ফেল্‌ব !'

সুকুমারী। অত অনুগ্রহ হ'বে না !

গিরিবালা। না, ঠাট্টা নয়, এত কে খাবে ?

সুকুমারী। তুমি খাবে, আমি খাব, ননী খাবে—এ আর বেশী কি ?

'আচ্ছা, খাও তবে,' বলিয়া যুবতী একটা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া আধখানা

জোর করিয়া সুকুমারীর মুখে গুঁজিয়া দিল, একটু ননীর মুখে দিল, আর বাকিটুকু আপন গালে দিল। সুকুমারী ননীকে গিরিবালার নিকট রাখিয়া জল আনিতে গেল। কাকী মাকে না দেখিয়া ননী কাঁদিয়া ফেলিল। সুকুমারী আসিয়া জল রাখিয়া ননীকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল—তাহার মুখে সন্দেশের টুক্‌রা দিতে লাগিল—তাহার কান্না থামিল। সুকুমারী খাইতেছে না দেখিয়া গিরিবালা বলিল, 'হিসেবের বেলা তিনজনে খাবে, এখন খাওনা কেন?'

'এই খাচ্ছি' বলিয়া সুকুমারী পুনরায় ননীর মুখে সন্দেশ ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। গিরি মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'দেখ, ও-সব চালাকিতে ভুলবে না—খাবে ত খাও, নইলে আমি সব বাইরে ফেলে দিচ্ছি।'

অগত্যা সুকুমারী একটি সন্দেশ ও একটা আম উদরসাৎ করিল। এ দিকে মহামায়ার কর্ণে ননীগোপালের ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছিয়াছিল। সে দ্রুত-পদে সুকুমারীর কক্ষে আসিয়া, কোন কথা না বলিয়া, তাহার কোল হইতে ননীকে যেন ক্রোধের সহিত বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল। তারপর ননীর গালে, পৃষ্ঠে, বেশ কয়েকটি উত্তম-মধ্যম প্রদান করিতে করিতে সক্রোধে বলিল, 'কেন রে! হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! এই গু না খেলেই কি নয়? গু খাবে—আর কান্না জুড়ে দেবে!'

কথা সমাপ্ত করিয়া মহামায়া, ননীর গাল-দুটা সজোরে টিপিয়া দিল। হতভাগা ননী সুকুমারীর দিকে চাহিয়া 'কাকী মা, কাকী মা' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বড় বৌর রাগ ইহাতে আরও বৃদ্ধি পাইল। "ফের 'কাকী মা' বল্‌বি, তবে তোকে মেরে ফেল্‌ব" বলিয়া সে পুনরায় শিশুটিকে মারিতে লাগিল। সুকুমারী ননীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে বড়-বৌ আপন পুত্র লইয়া অদৃশ্য হইল। সুকুমারীর চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। গিরিবালা অবাক্ হইয়া বলিল, 'এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড গা! এমন ত কোথাও দেখি নাই!'

সুকুমারী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, 'দেখ ভাই, আমার কি দোষ? কেন বৃথা ছেলেটা'কে মেরে খুন ক'র্‌লে?'

যুবতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'তোমার দোষ—পরের পুত্রে পুত্রবতী মা-যশোমতী হ'তে যাচ্ছিলে। তুমি ভালবেসে ছেলেটাকে মার খাওয়ালে। আর যেখানে সেখানে, না বুঝে-সুঝে, অমনতর ক'রে ভালবাসা দেখিও না।'

'দু বছরের শিশু, ওকে বিনা দোষে কি মারটাই মারলে!' বলিয়া সুকুমারী বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু ঢাকিল। যুবতী তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'ভবিষ্যতে একটু বুঝে-সুজে চলিও, গতিক বড় ভাল নয়।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গিরিবালার সমালোচনা

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গিন্নী কৃপাময়ী আবার ডাকিলেন, 'ছোট-বৌ, অ-ছোট-বৌ!'

সুকুমারী মলিনমুখে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া তাঁহার পাকা-চুল বাছিবার যোগাড় ক'রিতে লাগিল। গিন্নী বলিলেন, 'আমার মাথায় আজ পাকা-চুল বড় নাই——আজ থাক্। বলি, হ'য়েছে কি?'

গিরিবালা আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল। সুকুমারী চক্ষে বস্ত্র দিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। গিন্নী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? এ আর তোমার দোষ কি?'

তার পর গিরিবালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওদের ব্যাভারটা দেখে আমি অবাক্ হ'য়েছি; ওরা ভেবেছে কি? প্রতি কাজে আমার যে ক'রে জ্বালাতন ক'র্‌ছে, তা আর ব'ল্‌ব কি?'

এইরূপ আরও দুই চারিটী কথার পর গিরিবালা বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিল, কিন্তু গিন্নী তাহাতে সম্মতি দিলেন না, বলিলেন, 'এখনো একটু একটু বৃষ্টি হ'চ্ছে—ভিজে ভিজে কোথা যাবে? আজ এখানেই থাক—আমি তোমাদের বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

গিরিবালা অগত্যা স্বীকৃত হইল—সুকুমারী হাতে আকাশ পাইল। পুনরায় দুজনে মিলিয়া সুকুমারীর শয়নকক্ষে গেল।

এদিকে মহামায়া অতি উচ্চৈঃস্বরে একে একে সুকুমারী, গিরিবালা, শ্বশ্রূঠাকুরাণী, সুকুমারীর চৌদ্দপুরুষ, স্বর্ণকমল, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি ইংরেজ-ওয়ালাগণের আঠারপুরুষ, আর লেখাপড়াজানা মেয়েদের একুশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া ফেলিল। গিন্নীঠাকুরাণী কত বারণ করিলেন—কত অনুনয় করিলেন, অগত্যা দীনেশচন্দ্র, গিরিবালার নামোল্লেখ করিতে কত নিষেধ করিলেন, কিন্তু বড়-বৌ মহামায়া সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। অবশেষে কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিতে লাগিল, 'এত অত্যাচার আমার'সহ্য হয় না—একটু সন্দেশের জন্য পরের ছেলেকে মারিবার ওরা কে?' ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া রামকমলের চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল! এইরূপে অনেকক্ষণ ঝড় বহিয়া রাত্রি দশটার পর থামিল। সুকুমারী ও গিরিবালা একত্র আহার করিয়া শয়নকক্ষে গেল। যুবতী পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'বাপ রে! বাঘিনী আর কি! মাগীর কি গলাটা দেখেছ?'

ভয়বিহ্বলা সুকুমারী গিরিবালার হস্ত ধরিয়া বলিল, 'তুমি থাম ভাই, ওদের কথায় কাজ নাই, আবার এখনি লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে যাবে!'

যুবতী অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, 'লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে যায়, রাবণ বধ ক'রব—তার আর ভাবনা কি? মেগো ভাতারের হাতে প'ড়েছেন, তাই রক্ষে—'

সুকুমারী। তুমি ভাই একদিন দেখ্‌লে, এমন ত রোজ হয়। আমার বড় ভয় করে।

তার পর সুকুমারী গিরিবালার মন অন্য বিষয়ে ধাবিত করিবার জন্য বলিল, 'থাক্ ও সব কথা—এখন চিঠি দেখ্‌বে এস !'

সুকুমারী পত্রখানা আনিয়া গিরিবালার হস্তে দিল ; যুবতী সস্মিতবদনে প্রদীপের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত করিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল, 'সেই এক-ই কথা ;—দ্বেষ-হিংসা ক'রো না, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি করিবে, উচ্চ কথা কহিও না, বিবাদ-বিসংবাদ ক'রো না, ওদের ছেলে-মেয়েগুলিকে আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসিবে। এক কালেজেরই প'ড়ো কি না !'

অতঃপর সুকুমারীর পরিহিত বস্ত্রের প্রতি যুবতীর দৃষ্টি পড়িল। তাহার পরিধানে একখানা নূতন ঢাকাই-শাড়ী, তাহার একাংশ ছিন্ন। যুবতী তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যসহকারে বলিল—"এ কি এ ! এমন সুন্দর নূতন কাপড়খানা ছিঁড়িলে কি ক'রে ?"

সুকুমারী। আমি ছিঁড়িনি—কাল রদ্দুরে শুকুতে দিয়েছিলুম—

গিরিবালা তাহার কথা সম্পূর্ণ না হইতেই বলিল, 'রদ্দুরের তেজে ছিঁড়ে গেছে বুঝি ! আমি এখন সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। পাড়ায় যা শুনেছি, তা সত্য বটে ; এ সব ওদেরই কাজ !' তার পর কাপড়খানা ধরিয়া ছিন্ন স্থান দেখিয়া বলিল, 'টেনে না ছিঁড়্‌লে কখনও ত এমনভাবে ছিঁড়্‌তে পারে না—কি হিংসুটে গা !'

সরলা সুকুমারী আপনার স্বাভাবিক মিষ্ট-স্বরে বলিল, 'হয় ত কোন অবুঝ ছেলে ছিঁড়েছে ! ওরা ছিঁড়্‌বে কেন ? ওদের লাভ কি ?'

গিরিবালা। ঐ ত তোমার বুদ্ধি ! কেবল লাভের জন্যই কি মানুষ সব কাজ করে ? এই যে, এখন বৃথা এত লোকের শ্রাদ্ধটা ক'র্‌লে, এতে কি লাভ হ'লো ? জান, এ সব বুদ্ধির দোষ, কুশিক্ষার দোষ। আচ্ছা, আর পূর্ব্বে কখন তোমার আস্ত কাপড় ছেঁড়া পেয়েছ ?

সুকুমারী। তা' অনেক দিন। আমি মনে ক'ত্তুম, অবুঝ ছেলেরা এ সব করে।

গিরিবালা। তুমি কি-ই বা না মনে কর! পুরুষদের মত ভাবলে কি চলে? ওঁরা ভাবেন, পৃথিবীময় বুঝি কেবল সীতা, সাবিত্রী! তাই বলেন, কারু সঙ্গে ঝগড়া ক'রো না, কারুকে কিছু ব'লো না; তা এ সব ছোট-লোকের মেয়েগুলিকে মধ্যে মধ্যে দু'একটা কথা না ব'ল্‌লে যে এদের স্পর্দ্ধা আরও বেড়ে যায়। আর দেখেছ একটা কাণ্ড ভাই, ঝগ্‌ড়াটে হিংসুটে মাগীগুলির আবার তেম্‌নি মূর্খ গোঁয়ার স্বামীও জোটে!

সুকুমারী ভীতা হইয়া বলিল, 'থাক্ এ সব কথা ভাই, চল শুইগে।'

তারপর দরজায় অর্গল বন্ধ করিয়া, দীপটা নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া যুবতী-দ্বয় শয্যায় গেল। নানা বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে গিরিবালা সুকুমারীর কাণে কাণে বলিল, 'দেখ, চোর ধ'রে দিতে পারি; কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুন্‌ছে।'

সুকুমারী সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়া। সে বলিল, 'দরকার কি ভাই? যার যা ইচ্ছে করুক্, আমাদের ত কিছু ক্ষেতি হ'চ্ছে না।'

সে কথা গিরিবালা শুনিয়াও শুনিল না। রঙ্গ দেখিবার জন্য একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'কে রে দরজায়? বসো।'

এই কথা বলিবামাত্রই বাহিরে দ্রুত-পাদবিক্ষেপের শব্দ শুনা গেল। গিরিবালা হাসিয়া বলিল, 'ঐ শোন পায়ের শব্দ—দৌড়ে পালাচ্ছেন! যে ঘরেতে রাঙ্গা-বৌ, সেই ঘরেতে চুরি! হিংসুটে মাগীরা তোমার রূপটুকু চুরি ক'ত্তে এসেছিলো।'

গিরিবালা আজ সুকুমারীকে অনেক কথা বলিল, সংসার-শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিল। পরদিন প্রাতঃকালে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল। সুকুমারী মলিন-বদনে জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার কবে আস্‌বে?'

গিরিবালা। অবসর পেলে রোজই আস্‌ব।

সুকুমারী। সঙ্গে দাস-দাসী এসেছে—তোমার আবার অনবকাশ কি ভাই ?

গিরিবালা সুকুমারীর সরলতা ও হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল 'আচ্ছা, রোজই আস্‌ব।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্ত্তা ও গিন্নী

আশ্বিন মাস। দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী। প্রবাসবাসী বাঙ্গালীর প্রাণ বাড়ী বাড়ী করিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে। কেহ দেড় মাস, কেহ এক মাস, কেহ এক পক্ষ, আর কেহ বা এক সপ্তাহের ছুটীতেই বাড়ী ছুটিয়াছেন; রাস্তা, ঘাট, রেল, জাহাজ, হাট, বাজার ইত্যাদিতে লোকে লোকারণ্য। আনন্দময়ীর আগমন-প্রতীক্ষায় বঙ্গদেশ আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছে; বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া সকলেরই মুখে আজ আনন্দরেখা প্রতিভাত হইতেছে। কত বিরহিণী আজ আশায় বুক বাঁধিয়া পথপানে চাহিয়া আছে। কত দুঃখ-দারিদ্র-পীড়িত বৃদ্ধ জনক-জননী আজ প্রবাসবাসী উপার্জ্জনশীল পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কত ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী আজ নববস্ত্রে অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতে পারিবে ভরসায়, আনন্দিত হইতেছে। সকলেই আজ আশায় উৎসাহিত, আনন্দে উৎফুল্ল। এমন সুখের দিন বুঝি বঙ্গে বড় ঘটে না—এমন জাতীয় জীবনের প্রদর্শনী বুঝি আর দেখিতে পাই না। কিন্তু সুখ দুঃখ অবিমিশ্র নহে। কেবল সুখের বা কেবল দুঃখের রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যে কারণে একের হৃদয়ে আনন্দ-সুধা ঢালিয়া

দিতেছে, ভিন্ন-অবস্থাপন্ন আর এক ব্যক্তি আবার সেই কারণেই বিষ-দহনে দগ্ধ হইতেছে। ইহাই পৃথিবীর নিয়ম। পুরাতন রাজার মৃত্যু হইল—নূতন রাজা রাজ্য পাইলেন। এই রাজ্যপ্রাপ্তি উপলক্ষে কত উৎসবানন্দ, নৃত্য-গীত, রঙ্গ-রস, ভোজ তামাসা চলিতে লাগিল, কত সহস্র লোকের আনন্দপ্রস্রবণ বহিতে লাগিল; ঠিক সেই সময়ে, সেই মুহূর্ত্তে; কত শত যুবক, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অন্ন-বস্ত্র ও ভালবাসার কাঙ্গাল করিয়া চলিয়া গেল, কত শত সহস্র লোক অশ্রু-জলে ভাসিতে লাগিল, 'হা হতোস্মি' রবে আকাশ পূর্ণ হইল! আবার, আরও কত লোক ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল, তাহাদের জন্য কেহ হাসিলও না, কাঁদিলও না! কিন্তু হাসি-কান্না নিরর্থক হউক, আর সার্থকই হউক, পৃথিবীর সহিত উহাদের জন্ম, পৃথিবীর সহিত উহাদের লয়—পূর্ব্বে বা পরে নহে। সুতরাং উহা উপেক্ষার জিনিস নহে।

পূজার আর আট দিন মাত্র বাকি আছে। বৃদ্ধ কালীকান্ত রায় গণেশপুরের বন্দর হইতে বাড়ী আসিয়া রাত্রিকালীন ভোজন-কার্য্য সম্পাদন করিয়া অন্দরবাটীর বড় চৌ-চালা গৃহের তক্তপোষের উপর বসিয়া পান চিবাইতেছেন, গিন্নী কৃপাময়ী পাখা দ্বারা বাতাস করিয়া মশা তাড়াইতেছেন। গিন্নী ধীরে ধীরে পূজার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন, 'আজকের বারে অধিবাস, এখন পর্য্যন্ত যে কোন যোগাড়ই ক'ল্লে না? কি ক'র্‌বে, তাও ব'ল্‌ছ না।'

রায় মহাশয় বিরক্তি সহকারে বলিলেন, 'ব'ল্‌ব আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমার কিছু ভাল লাগে না—যা' হ'বার হবে।'

গিন্নী। ভাল ত লাগ্‌বে না—তা ত বুঝি! কিন্তু তা ব'ল্লেই ত হ'বে না—মান অপমান সবই তোমার। যতদিন বেঁচে আছ, ভাল মন্দ ত তোমাকেই শুন্‌তে হবে। ওদের চেনে কে? বাইরের লোকে ত আর ভিতরকার খবর বুঝ্‌বে না।

কর্ত্তা। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বিবাদ-বিসংবাদ, এতে কি আর মানুষ থাকৃতে পারে?

গিন্নী। আজকাল যেন আরও বেড়ে উঠেছে। এখন আর কারুকে গ্রাহ্য নাই। যার স্ত্রী, সে শাসন না ক'র্লে কি হ'য়ে থাকে? তা ওরা শাসন ক'র্বে দূরের কথা, বরং উস্‌কে দেয়!

রায় মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'ঐ কুষ্মাণ্ড দুটা আমায় হাড়ে নাড়ে পুড়িয়ে মার্বে। হ'য়ে ম'রে গেলে উৎপাত যেত। বড়টা হ'য়েছে, টাকা টাকা ক'রে পাগল। কার সর্ব্বনাশ ক'রে টাকা ক'র্বে, তাই হ'য়েছে ওর ভাবনা। ওর অদৃষ্টে জেল আছে, তা' আমি ঠিক দিয়ে রেখেছি। আপন ভাই, আমি বর্ত্তমানেই ওদের ঠকাবার ফিকির ক'চ্ছে! 'ক ভয়ানক অর্থলোভ! আর মেজোটা গণ্ডমূর্খ, হিতাহিত জ্ঞান নাই, বৌ যা' ব'লে দেবে, তাই ওর বেদ। হতভাগা আবার একটা ইস্কুল ক'রে পাড়ার ছেলেদের মাথা খাচ্ছে। ওদের দু'ভাইকে যা' বলা যাবে, তার বিপরীত ক'র্বে; প্রতি কথায় তর্ক ক'র্বে, এমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।'

গিন্নী। তা, আবার বৌ দুটি জুটেছে তেমনি। দিন-রাত ঝগড়া ক'র্বে—আর ছোট-বৌর হিংসায় ম'র্বে।

কর্ত্তা। 'যেমন দেব, তেমন দেবী', বৌদের দোষ কি? মেয়েমানুষ মোমের পুতুল, বুদ্ধি থাকলে ওদের যেমন ক'রে ইচ্ছা তেমন ক'রে ভেঙ্গে চূরে গ'ড়ে নেওয়া যায়। ভাল স্বামীর হাতে প'ড়লে এরাই হয় ত' ভাল হ'তে পার্ত।

গিন্নী। ভাল লোকের মেয়ে হ'লে, স্বভাব আপনি ভাল হয়। দেখ দেখি, ছোট-বৌ-মা আমার কেমন লক্ষ্মী!

কর্ত্তা। যেমন স্বর্ণকমল, তেমনি ছোট-বৌ। এদের দেখ্‌লে আমার চক্ষু জুড়ায়, সব কষ্ট ভুলে যাই। কেমন মিষ্ট কথা, নরম স্বভাব; হাজার

হউক লেখাপড়া শিখেছে, না হবে কেন। ছোট-বৌ-মা যখন প্রথম বই প'ড়্‌তে লাগ্‌ল, তখন স্বর্ণকমলের উপর আমার একটু রাগ হ'য়েছিল এখন দেখ্‌ছি, যারা বই পড়ে—লেখাপড়া জানে, তারাই ভাল।

গিন্নী। ছোট-বৌর বড় বুদ্ধি, হাঁ না ক'র্‌তে মনের কথা বুঝে ফেলে কেমন সরল মন; বড়-বৌ, মেজ-বৌ ওর হিংসায় মরে, সর্ব্বদা ওকে গালাগালি দেয়, দুর্ব্বাকা বলে, মেমসাহেব ব'লে, কত ঠাট্টা করে, তবু কারু প্রতি ওর রাগ নাই। সে যা' বলে, তাই করে—কাজ ছাড়া থাকে না, কেমন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। আজ চার বছর হ'ল, স্বর্ণকমলের বে হ'য়েছে, এর মধ্যে ছোট-বৌ একদিন কারু নামে একটি কথা বলে নাই! এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমি আর ত্রিজগতে দেখি নাই। কথা ব'ল্লে যেন মধু বরিষণ হয়—প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যাতনা সহ্য ক'র্ত্তে না পা'র্লে চুপটি ক'রে কাঁদে, তবু একটি কথা কয় না।

কর্ত্তা। ছোট-বৌমা এ সংসারের লক্ষ্মী, ভগবানের আশীর্ব্বাদে স্বর্ণকমল বেঁচে থাক্‌লে আমার মান-সম্ভ্রম বজায় থাক্‌বে। নইলে এ ভিটেতে ঘুঘু চ'র্‌বে।

গিন্নী। ষাট্—বাছারা বেঁচে থাক্। ছোট-বৌ ওদের কি কু-দৃষ্টিতেই প'ড়েছে! বাছা আমার রেঁধে আসে, আর বড়-বৌ, মেজ-বৌ কিনা সেই রাঁধা বেন্নুনে নুন মিশিয়ে দেয়! আর আস্ত কাপড় ছিঁড়ে দেয়! এমন কীর্ত্তি কোথাও শুনি নাই। আবার এ কথা মুখে ব'ল্লে, বড়-বৌ, মেজ-বৌ গ'র্জ্জে উঠেন, আর রামকমল, কৃষ্ণকমল স্ত্রীর পক্ষ হ'য়ে ছোট-বৌকে আর আমাকে মিথ্যাবাদী বলেন, যা-ইচ্ছা-তাই গালাগালি দেন।

রায় মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'আর সে সব কথা আমায় রোজ রোজ ব'লো না। ও-সব কথা শুন্‌লে আমি ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হই। হতভাগাদের ইচ্ছে—আমি বর্ত্তমানেই পৃথক্ হয়।'

গিন্নী কৃপাময়ী দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন, 'থাক্ সে কথা। বলি পূজার কি ক'র্‌বে?'

কর্ত্তা। আর আর বছর যে রকম হয়, এবারও তেমনি হ'বে। আমার ইচ্ছা, পূজার পর কাশীধামে চ'লে যাই। আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এ সব দেখে শুনে দুশ্চিন্তায় আমার শরীর, মন দিন দিন খারাপ হ'চ্ছে। আর অধিক কাল বাঁচ্‌ব না। মান থাক্‌তে পালানো ভাল। আর মান বা আছেই কোথা? ছেলে দুটা কথা শুনে না, বৌরাও শ্বশুর-শাশুড়ী ব'লে গ্রাহ্য করে না। এর পর আরও কত কি হবে!

গিন্নী কৃপাময়ী দুঃখিত-অন্তরে বলিলেন, 'আর হবে কি, এখন ভগবান্ পার ক'ল্লেই বাঁচ। কাশীধামের কথা যে ব'লছ, ছোট-বৌকে ছেড়ে কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। আর ওকে এখানে রেখে গেলে, ওরা গলা টিপেই মেরে ফেল্‌বে।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দম্পতি-যুগল

শীতের ছুটিতে স্বর্ণকমল আজ কিছু দীর্ঘকাল পরে বাড়ী আসিয়াছে! সুকুমারীর মনে আজ কত কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। স্বর্ণকমলও সুকুমারীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু একে হিন্দু-পরিবার, তদুপরি বড়-বৌ ও মেজ-বৌর তীব্র বিদ্রূপের ভয়, সুতরাং দম্পতি-যুগলকে অগত্যা বাধ্য হইয়া রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে। সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা আসিল, অন্ধকার গাঢ় হইল, সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া পুরুষেরা বহির্ব্বাটীতে গেলেন, আর রমণীরা নিজ শয়নকক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুকুমারী পান চিবাইতে চিবাইতে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, আলোটা উজ্জ্বল করিয়া, শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শয়ন-গৃহের একপ্রান্তে একখানা ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ টেবিল, তাহার নিকট একখানা চেয়ার। স্বর্ণকমল বাড়ী আসিলে এখানে বসিয়া লেখা-পড়া করে। টেবিলের উপর একটি ক্ষুদ্র ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে। সুকুমারীর চক্ষু ঘড়ির উপর পড়িল ; অস্ফুটস্বরে, 'দশটা বেজে গেল !' বলিয়া সে শয্যা হইতে উঠিয়া টেবিলের নিকটে গেল, আলোটা টেবিলের উপর রাখিল, তার পর' চেয়ারে বসিয়া একখানা বাঙ্গালা পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিল। কোন পৃষ্ঠার এক ছত্র, কোন পৃষ্ঠার দুই ছত্র, কোন পৃষ্ঠার শুধু পত্রাঙ্কটি পড়িয়া সে শতাধিক পৃষ্ঠা উল্টাইল, তবুও স্বর্ণকমল আসিল না ! অতঃপর একটি পেন্‌সিল লইয়া একখানা সাদা কাগজে কত কি লিখিল, লিখিয়া কাটিল, আবার লিখিল। স্বর্ণকমল মৃদু-পাদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজার অর্গল বন্ধ করিল। অর্গলের শব্দে সুকুমারী চমকিয়া উঠিয়া ব্যস্ততা-সহকারে বই, কাগজ, পেন্‌সিল ফেলিয়া রাখিয়া তক্তপোষের নিকট গেল। স্বর্ণকমল দ্রুতগতিতে তাহার পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া স্বীয় হস্ত দ্বারা সুকুমারীর কোমল হস্ত দুখানি ধরিয়া সস্মিত-বদনে বলিল, 'কোথা পালাচ্ছ ?—হচ্ছিল কি ?'

সুকুমারী লজ্জায় কথা বলিতে পারিল না। নিঃশব্দে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। স্বর্ণকমল দক্ষিণ হস্তে স্ত্রীর সুকোমল গণ্ডদ্বয় টিপিয়া দিয়া বলিল, 'এখনো শোও নি ?'

এবারও লজ্জশীলা সুকুমারীর মুখে কথা ফুটিল না।

স্বর্ণকমল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার পত্রের উত্তর দেও নাই কেন ?

সুকুমারী সে কথার উত্তর না দিয়া, সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, 'এলে, তবু ভাল !'

সুকুমারীর বুকটা ধড়ফড় করিতে লাগিল ! যেন কথা বলিয়া কি একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে।

স্বর্ণকমল বলিল, 'কেন, বড় দেরী হ'য়েছে না কি ?'

সুকুমারী সাহস আর একটু বাড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমি ভাবছি, তুমি বুঝি ফের কল্‌কাতায় চ'লে গেলে !'

স্বর্ণকমল। কেন, রাত কটা বেজেছে ?

সুকুমারী। কল্‌কাতার ঘড়ীতে এখনো সাতটা বাজে নি।

অতঃপর স্বর্ণকমল বাম হস্ত দ্বারা সুকুমারীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া স্ত্রীকে লইয়া টেবিলের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং চেয়ারখানিতে বসিল, সুকুমারী তাহার বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণকমল। কল্‌কাতার ঘড়ী বুঝি বড় ধীরে চলে ?

সুকুমারী। কল্‌কাতায় যারা থাকে তারাও বড় ধীরে চলে।

স্বর্ণকমল। 'কিসে বুঝলে ?' বলিয়া পুনরায় তাহার গাল টিপিয়া দিল ; সুকুমারী আজ অপূর্ব্ব সাহসে বুক বাঁধিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞের ন্যায় বলিতে লাগিল, 'তোমার বিলম্ব দেখে। বক্তৃতার বেলা বলা হয়, রাত্রি দশটার সময় শয়ন করা উচিত আর সূর্য্য না উঠ্‌তে ওঠা উচিত, দেখ দেখি কটা বেজেছে ?—হয় তোমাদের কল্‌কাতার ঘড়ীতে এখনো সাতটা বাজে নি, নতুবা তোমরা যেরূপ বল, সেরূপ কাজ কর না।'

বলিতে বলিতে সেই পৌষ মাসের শীতেও সুকুমারীর কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। তৎপরে স্বর্ণকমল ঘড়ীর দিকে চাহিয়া একটু আশ্চর্য্য-সহকারে বলিল, 'এ ঘড়ীটা চ'লছে !—এগারটা বাজে যে ! রোজ চাবি দিতে না কি ?'

সুকুমারী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'তা কেন ?—অমনি চলে !'

স্বর্ণকমল। হাতের গুণে বুঝি ?—এতক্ষণ এখানে ব'সে কি ক'চ্ছিলে ?

সুকুমারী। হরিঠাকুরকে ডা'ক্‌ছিলুম।

স্বর্ণকমল একটু হাসিয়া বলিল, 'এত ভক্তি কবে হ'লো ?'

সুকুমারী। বিপদে প'ড়ে ভক্তি হয়।

স্বর্ণকমল। হঠাৎ এত বড় কি বিপদটা হ'লো ?

সুকুমারী লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিল, 'তুমি খেয়ে দেয়ে কোথা চ'লে গেলে, আস্‌তে এত দেরী ক'চ্ছিলে, তাই ভাবলুম—'

স্বর্ণকমল স্ত্রীর কথা শেষ না হইতেই বলিল, 'তোমরা কি আমাদের জন্য ভাব ?'

সুকুমারী একটু ব্যথিত-হৃদয়ে বলিল, 'না, তা কেন ! তোমরা যেমন নিষ্ঠুর !'

স্বর্ণকমল সুকুমারীকে কোলে বসাইয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিল; সুকুমারীর একটু অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহার অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া কবরী খুলিল, বেণী দ্বারা সুকুমারীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লমনে সুন্দরী স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "নিষ্ঠুরতা এখনো কিছু করিনি। তুমি আমার জন্য যত না ব্যস্ত হ'য়েছ, আমি তোমাকে দেখ্‌বার জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যস্ত হয়েছিলুম, কিন্তু কি ক'রব ? বাবা, বড়-দাদা, মেজ-দাদা ব'সে রয়েছেন, তাঁদের ফেলে কি ক'রে আসি ? বাবা ব'ল্লেন, 'আমার বৃদ্ধাবস্থা, কখন্ কি হয় বলা যায় না, এখন তোমরা তিন ভাই বাড়ীতে আছ, সব বুঝে শুনে নেও।' পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদ সম্বন্ধে আরও কত কথা ব'ল্লেন।—সে সব কথা কা'ল হ'বে। আজ ঢের রাত হ'য়েছে—চল শুইগে। রাত জাগ্‌লে অসুখ হ'বে। বেণীর মালায় তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ! সাদা গলায় কাল মালা—বেশ মানিয়েছে !

সুকুমারী লজ্জিতা হইয়া বলিল, 'ফের কবে যাবে ?'

স্বর্ণকমল একটু হাসিয়া বলিল, 'যদি বলি, কা'ল ?'

সুকুমারী। তা' তোমাদের আশ্চর্য্য নাই ! না—সত্যি ক'দিনের ছুটী ?

স্বর্ণকমল। অনেক দিনের—

সুকুমারী। তবু, শুন্‌তে কি আর দোষ আছে ?

স্বর্ণকমল। প্রায় দু'মাসের।

সুকুমারী একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এবার তবে অনেক খবর জেনে যেতে পারবে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কেন এমন হয়?

স্বর্ণকমল প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা-ত্যাগ করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গঙ্গাতীরের বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া একটু ভ্রমণ করে। তারপর সামান্য একটু জলযোগের পর কোন দিন কোন পুস্তকের দুই এক পাতা কিংবা সংবাদপত্র পাঠ করে, কোন দিন পিতা কিংবা ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সাংসারিক প্রসঙ্গে কথোপকথন করে। যথাসময়ে স্নান আহার করিয়া কোন দিন নিদ্রাগত হয়, কোন দিন বা পাড়ার ভদ্রযুবকগণের সহিত তাস বা পাশা খেলায় নিযুক্ত হয়। অপরাহ্নে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী বেড়াইতে যায়। তাহার সৌজন্য ও ভদ্রব্যবহারে সকলেই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত হইতে লাগিল।

সুকুমারী এখন আর বালিকা নহে। আপনার স্বাভাবিক লজ্জা একটু পরিত্যাগ করিয়া সে এখন স্বামীর সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে শিখিতেছে; স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে স্বামীর উপদেশ ও কথোপকথনের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইতেছে; স্বামি-হৃদয়ের গূঢ়স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহার মনোগত ভাব টানিয়া বাহির করিতে শিক্ষিতা হইতেছে। এইরূপে প্রেমের প্রতিদান হওয়ায়, নব-দম্পতীর দাম্পত্য-প্রেম ক্রমেই অধিকতর গাঢ় হইতেছে। সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া পতি-পত্নী একত্র মিলিত হইয়া পরমানন্দে সদ্-গ্রন্থাদি পাঠ করে। সুশীলা সুকুমারী এ পর্য্যন্ত স্বামীর নিকট পারিবারিক প্রসঙ্গে

কোন কথাই বলে নাই। এ দিকে স্বর্ণকমলের ছুটী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—আর সাত আট দিন মাত্র বাকি। ভার্য্যা সুকুমারী দুই হস্তে স্বামীর দক্ষিণ হস্তখানা ধরিয়া—স্বামীর বুকে মাথাটি রাখিয়া, অতি ব্যথিত-হৃদয়ে, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, মৃদুস্বরে বলিল, 'তুমি ত' আর দু'দিন বাদে চ'লে যাবে, তখন আমার দশা কি হবে, ভগবান্ জানেন; আমার বড় ভয় হ'চ্ছে!'

স্বর্ণকমল ইতিমধ্যে পারিবারিক অবস্থা অনেকটা জানিতে পারিয়াছিল; সুকুমারীর উপরে যে অযথা অনেক প্রকারের অত্যাচার হয়, তাহাও তাহার কাণে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু তবুও স্ত্রীর আব্দারে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায়, সে সুকুমারীর কথার প্রত্যুত্তরে বলিল, "এ তোমার অন্যায় কথা, আপনার বাড়ীতে থাক্‌বে, ভয় কি?'

সুকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মলিন-বদনে বলিল, 'হ'লে কি হয়, বড়-দিদি, মেজ-দিদির যে আমি চক্ষুশূল হ'য়েছি।'

স্বর্ণকমল। হ'য়ে থাক ত' সে তোমার নিজের দোষে; ব্যবহারের দোষে মিত্র শত্রু হয়, আবার সুব্যবহার দ্বারা পরম শত্রুকেও মিত্র করিয়া লওয়া যায়। তুমি হয় ত' তাঁদের প্রতি ভাল ব্যবহার কর না, তাঁদের ছেলেমেয়েগুলিকে স্নেহ যত্ন কর না, তাঁদের অজ্ঞতায় উপহাস কর; নতুবা কি বিনা কারণে ঘরের লোক পর হ'তে পারে?

সুকুমারী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'কৈ না! আমি ত' কখনো তাঁদের প্রতি কোনরূপ তাচ্ছিল্য বা কুব্যবহার করি না, বরং প্রাণপণ ক'রে তাঁদের মন রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করি। আমি বই পড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি, গায়ে ফুঁ দিয়ে চলি, মেমসাহেব হ'য়েছি, এইরূপ কত কথা ব'লে আমায় ঠাট্টা করেন; পাড়ার মেয়েদের কাছে কত প্রকারে আমার নিন্দা করেন। তবু আমি—'

স্বর্ণকমল, সুকুমারীর কথা সম্পূর্ণ না হইতেই বলিল, 'তা' ব'ল্লেই বা, তাদের কথায় জবাব না দিলেই ত হয়!'

সুকুমারী। আমি কি আর কথায় জবাব দেই! জবাব দিলে কি আর রক্ষা আছে?

স্বর্ণকমল। সভা বুঝে কীর্ত্তন গাইতে হয়—যে, যে কথার মর্ম্ম না বুঝ্‌তে পারবে, তার কাছে সে কথা না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মনে কর, একটা কৃষকের কাছে যদি বলা যায় যে, পৃথিবী গোল কিংবা পৃথিবীটা ঘুরছে, সে তাহা কথনই বুঝ্‌তে পার্‌বে না, বরং বক্তাকে পাগল মনে ক'র্‌বে।

সুকুমারী ব্যগ্রতা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন ক'রে পৃথিবীটা ঘুরছে, আমি তা' ভুলে গিয়েছি; আমায় তা' বুঝিয়ে দিতে হবে।'

স্বর্ণ। তা' হবে আর একদিন—লেখাপড়া শেখার যে কত গুণ, এতে মানুষের মন যে কত উন্নত হয়, আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যে স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে কত প্রয়োজন, তা' অনেক 'পুরুষ-মানুষেই' বুঝ্‌তে পারে না, তোমার বড়দিদি, মেজদিদি বুঝবে কি! যার যা' বুঝ্‌বার শক্তি নাই, তার সঙ্গে সে বিষয়ে বাক্যব্যয় করাই অন্যায়। তোমার বড়দিদি, মেজ-দিদির যদি লেখাপড়ার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা বুঝ্‌বার শক্তি থাক্‌ত, তবে আর তাঁরা তোমাকে ঠাট্টা ক'ত্তেন না।—তাঁরাও তোমার মত ক'ত্তেন। সুতরাং এটা তাঁদের দোষ নয়, অজ্ঞতা! তোমার এ ঠাট্টায় বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে আপন কর্ত্তব্য পালন করা উচিত।

সুকুমারী। তাই ত করি। আমি ত কখনও এ সব কথা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করি না।

স্বর্ণ। তুমি কিছু না ব'ল্‌লে কি তাঁরা গায় এসে প'ড়ে তোমার শত্রু হন?

সুকুমারী হৃদয়ে একটু যাতনা পাইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল, 'তা' কি ক'র্‌ব বল! তুমি যখন এত কথা পাড়্‌লে, তখন আজ দু'একটি কথা ব'ল্‌তে হবে—আমার বাক্স খুলে দেখ, একখানাও আস্ত কাপড় পাবে না।

আমি রদ্দুরে কাপড় শুকাতে দিই, তাও কি আমার দোষে ছেঁড়া হয়ে থাকে? আমার বইগুলি দেখ, সবগুলির পাতা ছেঁড়া! এও কি আমার দোষ? আর আমি কি প্রতিদিনই রাঁধতে গিয়ে ভুল ক'রে ঝোলে, তরকারীতে দুই তিন বার নুণ দিই?—প্রতিদিনই কি আমি ভুল ক'রে শ্বশুর-শাশুড়ীর খাওয়া নষ্ট করি?'

বলিতে বলিতে সুকুমারীর চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া, দুই বিন্দু জল পড়িল। সুকুমারী স্বামীর অলক্ষিতে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আমি যদি তাদের কোন কথায় উত্তর দিই, তবে বলে,—'তুমি লেখাপড়া জান, তোমার সঙ্গে কি আমরা কথায় এঁটে উঠ্‌তে পারি?' যদি চুপ ক'রে থাকি, তবে বলে,—'উনি আমাদের মুখ্যু মানুষের সঙ্গে কথা কইবেন কেন? নিজে বিদ্বান্ লোক; সোয়ামী ইংরাজীওয়ালা—আমাদের মত নয়!' আমি যদি শাগ্‌গির ক'রে রাঁধ্‌তে যাই, তবে বলে—'আমরা ত আর রাঁধ্‌তে জানি না, ও রাঁধ্‌বে বৈ কি! আমাদের রান্না যে শ্বশুর শাশুড়ীর ভাল লাগে না।' যদি তাঁদের অপেক্ষায় দেরী করি, তবে বলে,—'ছোট-বৌ রাঁধ্‌বে কেন, ওর কত কাজ—বই পড়া, চিঠি লেখা, ছবি আঁকা। বড় লোকের ঝি, বড় ডাক্তারের মাগ, ওর ভাবনা কি?' যদি তাঁদের ছেলে মেয়েকে কোলে নিই, তবে বলে,—'না থাক্, পরের ছেলে কোলে ক'রে কষ্ট পাবে কেন?' যদি কোলে না নিই, তবে বলে;—'ছেলেমেয়েগুলি কেঁদে মরে গেলেও কেউ একবার ধরে না, এমন শত্রুর পুরীতে বাস।" অতঃপর সুকুমারী আরও গম্ভীরস্বরে বিষন্নবদনে বলিল,—"দেখ, ননীগোপালকে আমি একটু ভালবাসি, আজ তাকে কোলে নিতে চাইলুম, ননী আমার হাত ছাড়িয়ে বেজার হয়ে ব'ল্লে, 'ছোট কাকী! আর তোমার কোলে যাব না।' আমি বল্লুম 'কেন রে ননীগোপাল?' সে উত্তর ক'ল্লে, 'মা বারণ ক'রেছে, তোমার কাছে গেলে মা মার্‌বে।"

এই কথা বলিতে বলিতে আর এক ফোঁটা অশ্রু টস্ করিয়া স্বর্ণকমলের

হাতে পড়িল। স্বর্ণকমল চকিতের ন্যায় প্রিয়তমা ভার্য্যার মুখপানে চাহিয়া বলিল, 'তুমি কাঁদ্‌ছ, সুকুমারি! ছিঃ!'

প্রিয়তমের প্রিয় সম্ভাষণে সুকুমারীর কোমল-হৃদয়ে তাড়িত সঞ্চালিত হইল, এবার সে সত্য সত্যই সরলা বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। হৃদয়ের আবেগ ধারণ করিতে অপারক হইয়া সুকুমারী দুই হস্তে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'তুমি ব'ল্‌ছ, ব্যবহারের দোষে মিত্র শত্রু হয়। তুমি আমার পরম গুরু—তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই বেদবাক্য—আমি সুব্যবহার, কুব্যবহার বুঝি না; কি ক'র্‌লে এঁরা আমার আপন ভগিনীর ন্যায় হবেন, আমাকে ব'লে দাও, আমি তাই ক'র্‌ব।'

স্বর্ণকমল সরলা সুকুমারীর সরল কথা শুনিয়া কিছু অপ্রতিভ হইল, মনে মনে তাহার সরলতার শত প্রশংসা করিল; কি উত্তর দিবে, সহসা স্থির করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। তারপর স্বর্ণকমল প্রেমভরে সুকুমারীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইল, তাহার আলুলায়িত কুন্তলরাশি গুছাইয়া দিল, স্বীয় বস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'সুকুমারি! আমি সত্য সত্যই এর কারণ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি যে তাদের প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার কর, এ আমার সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ ব্যতীতও কার্য্য হয় না, তবে কেন তারা এরূপ করে? এক কারণ হ'তে পারে,—হিংসা। মানুষের উন্নত অবস্থা দেখ্‌লে পরশ্রীকাতর নীচ-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের গাত্রদাহ হয়। কিন্তু আমাদের অবস্থায় আর তাদের অবস্থায় বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখ্‌ছি না, সুতরাং হিংসারও কারণ নাই! তবে কেন এমন হয়?"

সরলা সুকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল, 'বল, আমি কি উপায় ক'র্‌ব?'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুক্তকেশীর মন্ত্রদান

পরদিন রজনীতে মুক্তকেশী উপাধানে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। কৃষ্ণকমল শয্যাপার্শ্বে বাক্‌শূন্য হইয়া বসিয়া আছে। কোন কথাটী কহিতেছে না। কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণকমল অতি বিরক্তির সহিত বলিল, 'আজ আবার হ'ল কি? রোজ রোজ এত আমার ভাল লাগে না।'

মুক্তকেশী এবার আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এত অপমান আমার সহ্য হয় না, আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।'

অভিমান হইলে মুক্তকেশী প্রতিদিনই স্বামীর নিকট এই কথা বলিত। কৃষ্ণকমল আজ আর সহ্য করিতে পারিল না, একটু ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত বলিয়া ফেলিল, 'চ'লে গেলেই ত হয়, কে তোমায় বারণ ক'চ্ছে?'

মুক্তকেশীর কোমল প্রাণে বুঝি ব্যথা লাগিল। সে কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, 'আমায় যারা দেখ্‌তে পারে না, তারা আমার সঙ্গে যেন কথা বকে না—তাদের মা বাপের দিব্বি! আমি এ শত্রুপুরীতে থাক্‌তে চাইনে, কাল'ই বাপের বাড়ী চ'লে যাব।'

কৃষ্ণকমল বিরক্তিসহকারে বলিল, 'কা'ল কেন, এখনি যাও।'

'তবে এখনি যাচ্ছি' বলিয়া অশ্রুমুখী মুক্তকেশী অভিমানভরে অতি দ্রুতবেগে শয্যার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণকমল সজোরে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ক্রোধের সহিত বলিল, 'চুপ্ ক'রে শুয়ে থাক, একটী কথা কইবে, তবে আজ বিপদ্ ঘটাব—জেনো!'

ভয়ে, দুঃখে, অভিমানে অগত্যা মুক্তকেশী পুনরায় শয়ন করিয়া কাঁদিয়া

কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া ফেলিল। পতি বা অন্য কোন গুরুজন কর্ত্তৃক বিনাদোষে তিরস্কৃতা ও অপমানিতা হইলে সুশীলা রমণীরা যেরূপ মর্ম্মব্যথা পাইয়া কাঁদিতে থাকে, মুক্তকেশী আজ ঠিক তেমনি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অর্দ্ধদণ্ড এইরূপে কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকমল মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে, নিশ্চয়ই মুক্তকেশীর উপর আজ কোনরূপ অত্যাচার হইয়া থাকিবে, নতুবা সে এতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিত না। এই সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকমলের দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিল। স্ত্রীর প্রতি একটু কাঠিন্য প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া মনে মনে একটু অনুতাপও হইল। তারপর, যেন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, একটু নরম হইয়া, দুর্ব্বলহৃদয় কৃষ্ণকমল রোরুদ্যমানা স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া করুণাব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ হ'য়েছে কি?'

মুক্তকেশী সে কথার উত্তর প্রদান করিল না—স্বামীর হস্ত হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণকমলের হৃদয় গলিয়া গেল, মুক্তকেশীর প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহই রহিল না। স্ত্রীর আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া নরম হইয়া বলিল, 'কি হ'য়েছে, তা' না ব'ল্লে আমি কেমন ক'রে এর প্রতিকার করি?'

মুক্তকেশী এবার কাঁদিয়া বলিল, 'কিছু হয় নাই—কারো কিছু ক'রেও কাজ নাই।'

মুক্তকেশীর ক্রন্দনের স্রোত ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কৃষ্ণকমল বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'একটি কথা বল—কি হ'য়েছে?'

'আমার যদি কেহ থাকৃত, তবে আর আমার এমন দশা হ'বে কেন?' বলিয়া মুক্তকেশী বালিশে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

'এদিকে ফিরে বল না, কি হ'য়েছে।' বলিয়া কৃষ্ণকমল স্ত্রীর হাত

ধরিয়া টানিতে লাগিল। মুক্তকেশী উপাধান হইতে মস্তক নামাইয়া শুইল, কোন কথা কহিল না। কৃষ্ণকমল স্বীয় জানুদেশে স্ত্রীর মস্তক স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'য়েছে?'

মুক্তকেশী নিরুত্তরা। কৃষ্ণকমলের পুনরায় ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল। সে সক্রোধে ব'লল, 'তবে ব'ল্‌বে না?'

আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া মুক্তকেশী বলিল, 'এই শত্রু-পুরীতে আমার দুঃখ যে না বুঝ্‌বে, তার কাছে ব'লে কি হ'বে? আর আমাদের কথায় কি কারো বিশ্বাস হ'বে?'

অশ্রুপাত সমভাবে চলিতে লাগিল।

কৃষ্ণ। বিশ্বাস হয়—না হয়, সে আলাদা কথা। এখন বল, 'কি হয়েছে?'

মুক্তকেশী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু ও নাসিকা মুছিয়া বলিল, 'আমরা লেখাপড়া জানি না, একখানা কথাকে তিনখানা ক'রে ব'ল্‌তে পার্‌ব না, কেউ বিশ্বাসও কর্‌বে না, কারো কাছে কিছু ব'ল্‌তেও চাই না।'

কৃষ্ণকমল সত্য আবিষ্কারের জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিল, 'কি হ'য়েছে?'

'তোমার সোণার ভাই, সোণার ভাই-বৌ!'

'এরা কি ক'রেছে?'

'ক'র্‌বে আর কি, আমায় তাড়াতে পা'ল্লে বাঁচেন।'

'কেন তুমি এদের কোন্ পাকা-ধানে মই দিয়েছ?'

'তা, কেমন ক'রে জান্‌ব। কা'ল তুমি বাড়ী ছিলে না, একা শুয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে ওদের ঘরে কাঁদা-কাটা শুনে উঠ্‌লুম, উঠে দরজায় কাণ দিয়ে যে সব কথা শুন্‌লুম, তা' ব'ল্লে তোমার বিশ্বাস হবে না।'

'কি শুন্‌লে? কে কি ব'ল্লে?'

'ছোট-বৌ ঠাকুর-পোকে ব'ল্লে, তোমার ছুটি ফুরিয়ে এল, এখন আমার

দশা কি হবে? এবার আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হবে।' ঠাকুর-পো ব'ল্লে, 'তোমার ভয় কি?' তার.পর ছোট-বৌ ব'ল্লে, 'মেজ-বৌ বড়-বৌ আমার পেছু লেগেই আছে, কোন্ সময় কি সর্ব্বনাশ করে, তার ঠিক নাই। আমি বই পড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি ব'লে পাড়ায় পাড়ায় আমার নিন্দে ক'রে বেড়ায়, আমার বইগুলি ছিঁড়ে দেয়, রদ্দুরে কাপড় শুকুতে দিয়ে এলে, সে কাপড় টেনে ছিঁড়ে দেয়, যাচ্ছে-তাই গাল দেয়—'

কৃষ্ণকমল স্ত্রীর কথা শেষ না হইতেই ব্যগ্রতা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'তা স্বর্ণকমল কি ব'ল্লে?'

মুক্তকেশী। তিনি ব'ল্লেন, তা নিন্দে ক'র্‌বেই ত! লেখাপড়ার মর্ম্ম ওরা বুঝ্‌বে কি—ওদের ভাতারেরাই বুঝ্‌তে পারে না!

কৃষ্ণকমল এ কথায় প্রথম একটু সন্দেহ করিয়া বলিল, 'স্বর্ণকমল ত এমন ছেলে নয় যে, আমাদের গাল দেবে!'

মুক্ত। সাধে কি বলি—তোমার সোণার ভাই! মুখে একটু 'দাদা দাদা' বলে, আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাও; মনে কর, তোমাদের কত সম্মান করে। ওদের মুখে অমৃত, মনে বিষ, তা জেনো। ওদের মনের কথা বুঝ্‌তে পার না, তবে এত ছেলে পড়িয়ে মানুষ কর কি ক'রে?

কৃষ্ণকমল স্ত্রীর মুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিল, 'ওদের ঐ রকমই বটে! বিষকুম্ভ পয়োমুখ। ইংরেজী প'ড়্‌লে ঐ রকম হ'য়ে থাকে।'

মুক্তকেশী আশ্বস্ত হইয়া বক্তৃতা ধরিল, 'এখন মনে ক'চ্ছ, ছোট ভাই ইংরেজী প'ড়ে লায়েক হয়ে জজীয়তী পাবে, আর কত সুখে থাক্‌বে। সে গুড়ে বালি জেনো। ঐ মুখেই যত মিষ্টি কথা কাজের বেলা দেখ্‌বে ঠিক বিপরীত। ওরা তোমাদের মত পাড়াগেঁয়ে মূর্খ নয়, ওদের মাগই সর্ব্বস্ব। মাগ যা ব'ল্‌বে, তাই ওদের বেদের মোন্তর। বিপদের সময় যে একটি পয়সা

দিয়ে সাহায্য ক'র্‌বে, তা মনে কোরো না। বাপ্‌রে! কথাগুলো মনে হ'লে এখনও আমার গা কেঁপে ওঠে।

কৃষ্ণকমল। স্বর্ণকমল আর কি ব'ল্লে?

মুক্তকেশী। ব'ল্লে, তোমার কাপড় ছিঁড়ে দেয়, এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুমি ওদের কাপড় ছিঁড়ে দিতে পার না? তার পর ছোট বৌ হেসে হেসে বল্লে, তা আমি আর কি ছাড়ি! কাউকে দেখ্‌তে না পেলেই ওদের কাপড় ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিই।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া কৃষ্ণকমল মস্তক নাড়িতে লাগিল, মুক্তকেশী পুনরায় কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিতে লাগিল, 'তুমি ত মনে কর, আমার দোষেই আমার এত কাপড় লাগে, আমার কথা বিশ্বাস কর না। বল দেখি, এমনতর ক'ল্লে আমার কি দোষ?'

কৃষ্ণকমল পূর্ব্ববৎ মস্তক নাড়িয়া বলিতে লাগিল, 'তাই ত, আজ আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি! বছরে ছ জোড়া, সাত জোড়া কাপড় দেওয়া হয়, তবু নেকড়া বই পর না, তার উপর আবার আমার কাপড় দু চারিখানা না দিলে তোমার চলে না। মিছামিছি এমন শত্রুতা ক'ল্লে তোমার দোষ কি? বাবা ত এ বিষয়ে কত কথা বলেন। শীঘ্রই এর একটা কিছু কত্তে হবে!—তার পর?'

মুক্ত। তার পর ঠাকুর-পো ব'ল্লে 'শুধু কাপড় ছিঁড়ে দিলে ওদের আক্কেল হবে না। যেমন মুখ্যু ভাতার, হিংসুটে মাগ, ওদের তেমনি আচ্ছা ক'রে জুতিয়ে না দিলে হবে না।'

কৃষ্ণকমল এবার গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, 'এত বড় কথা! দু-পাতা ইংরেজী প'ড়ে যাকে তাকে মুখ্যু বলা, আর জুতা মারা! র'সো, মজা দেখাচ্ছি।'

মুক্তকেশী এবার পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিল, 'আমাদের ভাতার মুখ্যু থাকে আর পণ্ডিত থাকে, তাতে ওর মাথাব্যথা হ'লো কেন?

আমরা কি ওর খাই, না ওর পরি, না ওর কোন প্রত্যাশা রাখি? সোয়ামী খেতে দেয় খাব, না হয় উপোষ ক'রে থাকব। এমনতর ক'রে আমাদের সোয়ামী তুলে গালাগালি দেবার ওরা কে?'

কৃষ্ণকমল। ছু-পাতা ইংরেজী প'ড়ে এত অহঙ্কার। আমার কত ছাত্র বড় বড় চাকরী পেয়েছে। আমায় দেখ্‌লে তারা এখনও মাটীতে প'ড়ে প্রণাম করে, আর ও কি না মায়ের পেটের ভাই হ'য়ে এ সব কথা বলে! আচ্ছা, দেখা যাবে।

মুক্তকেশী নাসিকা ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'শুধু কি এই! আরও কত কি ব'ল্লে। আমি সরল-মানুষ, ও সব কথা মনে রাখ্‌তে পারি না। আর তা শুনেই বা কি হবে!'

কৃষ্ণ। কান্না-কাটার কথা ব'ল্‌ছিলে,—বৌ কাঁদ্‌লে কেন?

মুক্ত। তুমি না কি কবে ছোট-বৌকে জুতো মাত্তে চেয়েছিলে, তাই কাঁদ্‌লে।

কৃষ্ণকমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'ছি! ছি! আমার নামে এ সব মিথ্যা কথা! যত সব ছোট লোকের মেয়ে—'

মুক্ত। সোনার ছোট-বৌ, ছোট লোকের মেয়ে হ'তে যাবে কেন? তুমি ত আমার কথা শুন্‌বে না, মনে কর, আমি সব মিথ্যে বলি! যাই ভাব, তা নিশ্চয় জেনো, প্রাণ গেলেও তোমার কাছে মিথ্যা কথা ব'ল্‌বো না।

কৃষ্ণ। এত দিন আমি তোমার কথায় তত কাণ দিই নাই, ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তাও জান্‌তে পারি নাই। আজ তুমি আমার বড় উপকার ক'ল্লে। শীঘ্রই এর একটা কিছু ক'রে তবে ছাড়্‌ব!

মুক্ত। তুমি কি আর তা পার্‌বে? রাত পোহালেই তোমার বুদ্ধি বিগ্‌ড়ে যাবে। একবার 'দাদা' বল্লেই সব ভুলে যাবে।

কৃষ্ণ। আর না—আর মিষ্টি কথায় ভুলি না—আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি।

মুক্তকেশীর জয় হইল। সে মনে মনে নিজবুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। ভবিষ্যতে কোন্ কৌশলে সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠাইবে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে একবার বড়-দিদির সহিত বিশেষ পরামর্শ আঁটিতে হইবে, সিদ্ধান্ত করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

পিতা পুত্র

কালীকান্ত রায়-মহাশয় বড় সদাশয় ব্যক্তি। সদ্ব্যবহার, সাধু ব্যবহার, সজ্জনানুরাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য গঙ্গাতীর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে রায় মহাশয়ের বিশেষ খ্যাতি। তিনি বিপন্নগণের পরম সুহৃদ্। পিতৃ-মাতৃ-দায়-গ্রস্ত, দগ্ধগৃহ বা দুঃখ-দারিদ্র-পীড়িত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইয়া কখনও একেবারে বিমুখ হয় না। আপন শক্তি-সামর্থ্যানুসারে তিনি সকলকেই সাহায্য করিয়া উপকৃত করেন; পরোপকারব্রত পালনে তাঁহার অপার আনন্দ। কখন কোন প্রকারে পরের উপকার করিতে পারিলে, তাঁহার গম্ভীর মুখ প্রফুল্ল-মূর্ত্তি ধারণ করে। এই পুণ্যব্রতপালনে তাঁহার অনেক সময় শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, কিন্তু এই ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয় বলিয়া তিনি কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদে রায়-মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রায় আদালতের সিদ্ধান্তের ন্যায় প্রামাণ্য। কেহই তাঁহার আদেশ-লঙ্ঘনে সাহসী হয় না। স্বাভাবিক বুদ্ধি, সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও লোক-চরিত্র-পরিজ্ঞান-বলে তিনি সকল বিষয়েই সুপরামর্শ-দাতা। মোকদ্দমাকারিগণ, বিবাহ-প্রদানেচ্ছু স্থূলবুদ্ধি পিতা কিংবা বিধবা জননী, উইল-করণেচ্ছু সঙ্গতিপন্ন বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই

রায়-মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসে। ইহার উপর, রায়-মহাশয় সদ্বংশজাত ও ধনবলসম্পন্ন। সুতরাং ঐ অঞ্চলের মধ্যে তিনি একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

এই সর্ব্বত্রব্যাপী সম্মান, সঞ্চিত অর্থবল, সচ্চরিত্রা অনুরক্তা প্রিয়তমা ভার্য্যা এবং সন্তান-সন্ততিগণও তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে কালিমা পড়িয়াছে, তিনি সুখেও সুখবোধ করিতে পারিতেছেন না। আহারে তৃপ্তি নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই। পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। রায়-পরিবারের ঝগড়া-বিবাদ না দেখিয়া, একটি দিনও সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন না। বড়-বৌ মহামায়া ও মেজ-বৌ মুক্তকেশী কোন দিন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উদ্দেশে, কোন দিন সুকুমারী বা স্বর্ণকমলের উদ্দেশে, কোন কোন দিন পরস্পরে, আর কোন দিন বা নিরুদ্দেশ্যে ঝগড়া করিয়া থাকে। রামকমল জানিয়া শুনিয়াও ইহাতে বরং প্রশ্রয় দেয়! তাহার বিশ্বাস, ঝগড়া যত গাঢ় হইবে, তত শীঘ্র ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইবে, তত শীঘ্র পরস্পর পৃথগন্ন হইবার সুযোগ ঘটিবে। আর, একবার পৃথগন্ন হইতে পারিলেই সে তাহার লুক্কায়িত ধন লইয়া সুখী হইতে পারিবে। মধ্যম কৃষ্ণকমল, অপেক্ষাকৃত সরলপ্রকৃতি সহজ-বিশ্বাসী। স্ত্রী-প্রদত্ত মন্ত্র লঙ্ঘন করিতে তাহার সাহস হয় না, কারণ, তাহা হইলে মুক্তকেশী তাহাকে মূর্খ বলিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আর কৃষ্ণকমলের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, সত্য সত্যই ছোট-বো এবং তাহার পক্ষ হইয়া তাহার জননী মুক্তকেশীর উপর অত্যাচার করেন এবং এরূপ অত্যাচার হয় বলিয়াই মুক্তকেশী ঝগড়া করিতে বাধ্য হয়। এজন্য সেও স্ত্রীকে শাসন করে না। এ দিকে মহামায়া ও মুক্তকেশী এক-বুদ্ধি হইয়াছে। রামকমলের যে কিছু অর্থ আছে, কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশী তাহা পরম্পরায় শুনিতে পাইত। মহামায়া মুক্তকেশীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিত যে, পৃথগন্ন হইলে এবং তাহাদের বুদ্ধিতে চলিলে, মুক্তকেশী

সে ধন হইতে বঞ্চিতা হইবে না। মুক্তকেশী এ কথায় অবিশ্বাস করিত না, কৃষ্ণকমলও রামকমলের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইত। এজন্য রামকমল ও মহামায়ার ন্যায়, কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশীও পৃথগন্ন হইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। কলহ-স্রোত দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে রায় মহাশয় বাড়ী থাকিলে বড় ঝগড়া হইত না, তাঁহার তিরস্কার-ভয়ে একটু শান্তি থাকিত। এখন কেহ আর তাঁহাকে বড় গ্রাহ্য করে না। তাঁহার সম্মুখে গলার স্বর পঞ্চমে চড়াইয়া ঝগড়া করিতে, কিংবা সুকুমারী ও শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী, এমন কি, প্রয়োজনানুসারে স্বয়ং রায়-মহাশয়কে পর্য্যন্ত গালাগালি করিতে বা দুর্ব্বাক্য বলিতে মহামায়া ও মুক্তকেশী ভীতা হয় না। মহামায়া বা মুক্তকেশীর মধ্যে একজন ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইলেই অপর জন তাহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হয়। স্বীয় পরিবারে হৃত-সম্মান হইয়া রায়-মহাশয়ের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, সেই অমায়িকতা-ব্যঞ্জক গম্ভীর মুখশ্রীতে বিষণ্নতার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। পর-গৃহের বিবাদ-ভঞ্জনে যিনি সিদ্ধহস্ত, নিজ গৃহে তাঁহার সিদ্ধ-হস্ততা বিফল হইল, তাহার সুকৌশল শান্তি স্থাপন করিতে পারিল না। যিনি সুমন্ত্রণাবলে অতি বিচক্ষণ রাজমন্ত্রীর ন্যায় শত শত অশান্তি-পূর্ণ গৃহ-রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন, আজ স্বীয় গৃহে মন্ত্র-প্রয়োগ-সময়ে তিনি সেই শান্তিপ্রদ মহামন্ত্র ভুলিয়া বসিয়াছেন! এই ভুলই পৃথিবীর সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে!—সর্ব্বনাশই বা কেমন করিয়া বলিব? এই ভুলটুকু না থাকিলে যে পৃথিবীর পৃথিবীত্ব থাকে না, কলির কলিত্ব থাকে না, সংসারীর সংসারবোধ ও স্বার্থজ্ঞান থাকে না, পুনরায় সেই সত্যযুগ উপস্থিত হয়। তাই বুঝি, অতি বিচক্ষণ-বুদ্ধি প্রতিভাশালী ব্যক্তি-গণেরও সময় সময় এই ভুলটুকু দেখিতে পাই।

রায়-মহাশয় স্বীয় পরিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সেই স্বাভাবিক কান্তি নাই—দিন দিন শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সর্ব্বদাই মুখে চিন্তারেখা প্রতিভাত। প্রতি দণ্ডে

ভৃত্যকে তামাক সাজিয়া আনিতে বলেন, ভজহরি তামাক সাজিয়া রাখিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার হুঁকা ধরিতে মনে থাকে না, আগুন নিবিয়া যায়, আবার নূতন আগুন আসে, আবার নিবিয়া যায়। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতেছে, রায়-মহাশয় ভাবিয়া ভাবিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশীর কথোপকথনের দুই দিন পরে, তিনি বৈঠকখানায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে স্বর্ণ-কমলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বর্ণকমল আসিয়া পিতৃ-মুখ হইয়া বৈঠক-খানার একপ্রান্তে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রায়-মহাশয় একটী উষ্ণ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'স্বর্ণকমল! তোমার ছুটি ফুরিয়ে এল, তুমি আর দু-দিন বাদে চ'লে যাবে। তোমাকে রোজই একটা কথা ব'লব ভাবি, কিন্তু বলা হয় না। পাঠ্যাবস্থায় সংসারের চিন্তা প্রবেশ ক'ল্লে পাঠের ব্যাঘাত হয়; কিন্তু কি ক'রব, না ব'ল্লেও চলে না, তাই ব'ল্‌তে হচ্ছে। সংসারের অবস্থা ত দেখ্‌ছ, এর কি ক'রবে?'

স্বর্ণকমল মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনি যা' ক'রবেন, তাই হবে, আমরা কি ক'রব?'

পিতা। আমার ভগ্ন-শরীর, বয়সও হ'য়েছে, ক'দিন আর বাঁচ্‌ব? তোমার দাদাদের কাণ্ড দেখে আমি হতবুদ্ধি হ'য়েছি।

স্বর্ণকমল উৎকর্ণ হইয়া পিতৃ-বাক্য শুনিতে লাগিল, কোন উত্তর প্রদান করিল না। রায়-মহাশয় বলিতে লাগিলেন, 'পিতা ব'লে মান্য করা দূরে থাক্, বয়োবৃদ্ধ ব'লেও একটু সম্মান করে না। যা ব'ল্‌ব, তার বিপরীত ক'রবে, যেন আমি ওদের চিরশত্রু! হিতাহিত-জ্ঞান নাই, যা' ইচ্ছে তাই করে। এ পরিবারের সম্মান যে বজায় থাক্‌বে, এমন বোধ হয় না।'—বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরও গম্ভীর হইল।—'তুমি অধিকাংশ সময় ক'ল্‌কাতায় থাক্, সংসারের খবর রাখ না, কিন্তু যে অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা'তে সকল কথাই তোমার এখন কিছু কিছু জানা

উচিত।' তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, 'তোমার বড়দাদা রামকমল বড় কুটিল, স্বার্থপর আর অর্থপিশাচ। অর্থের জন্য সে না ক'র্ত্তে পারে, এমন কাজ নাই। এই লোভে ওর সর্ব্বনাশ হ'বে, আমি অনেক ব'লেছি, কিন্তু তা'তে ওর সুমতি হ'ল না—'

স্বর্ণকমল ধীরে ধীরে বলিল, 'হয় ত' কিছুদিন বাদে, ঐ দোষটুকু সেরে যাবে।'

পিতা। ঐ দোষটুকু ব'ল্‌ছো। না, না! ও ক্ষুদ্র দোষ নয়! হতভাগা লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু অর্থ সঞ্চয় ক'রেছে। আমি সে দিন ওকে ব'ল্লাম যে, এরূপ করা তোমার উচিত হ'চ্ছে না—যা' কিছু ক'রেছ সংসারে দাও, নতুবা এতে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হ'তে পারে! উত্তরে সে ব'ল্লে 'কৈ না! আমার কাছে টাকা কোথা থেকে আস্‌বে?' আমি শুনে অবাক্! এখন থেকেই সে তার পথ দেখ্‌ছে, ভাইদের ঠকাবার ফিকির ক'চ্ছে! এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে কি সে সংসারে লক্ষ্মী থাকে? অর্থলোভে যে আপনার ভাই-বোন্‌কে ঠকাতে পারে, সে সব ক'র্ত্তে পারে। এরূপ কুটিল, অর্থলোভী মানুষ কখনও সংসারে সুখী হ'তে পারে না। আর জেনো, যে পরকে ঠকাবার উপায় খুঁজে বেড়ায়, সে আজ হউক, কাল হউক, নিজেই প্রতারিত হয়।'

স্বর্ণকমল পিতার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিল, একটি ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

রায়-মহাশয় বলিতে লাগিলেন, 'আর মেজ কৃষ্ণকমল, সে ত গণ্ডমূর্খ; ভাল মন্দ বোধ নাই, বৌ-মা যা' ব'লে দেবে, তাই ওর বেদের মোন্তর। এরা দু'ভাই আমার সোণার সংসারে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়েছে। এদের যদি বুদ্ধি থাক্‌ত, তবে বৌমা'রা এরূপ ক'র্ত্তে পা'র্ত্ত না, আমার সংসারও এমন হ'তো না। জান্‌বে, যে বাড়ীতে মেয়েমানুষের শাসন নাই, সে বাড়ীতে লক্ষ্মীও নাই। মেয়েমানুষ শাসনে থাক্‌লে দেবীতুল্য হয়, আর

শাসন-বহির্ভূত হ'লে নরকের কীটের চেয়ে অধম হয়। এরা তাহা বুঝিল না—এর ফলও একদিন ভুগ্‌তে হ'বে। আর শাসন ক'র্‌বে কি, ভগবান্ এদের সে বুদ্ধি আর ক্ষমতা দেন নাই। ফলতঃ বৌমাদের চরিত্রে আমি মর্ম্মাহত হ'চ্ছি, আর এক মুহূর্ত্ত এ সংসারে বাস ক'ত্তে ইচ্ছা হয় না। আমি অনেক সহ্য ক'রেছি, আর পারি না। প্রতিদিন চ'খের সাম্‌নে সব দেখ্‌তে পা'চ্ছ—'আমি আর ব'ল্‌ব কি ?' বলিতে বলিতে তাঁহার মূর্ত্তি অধিকতর বিষণ্ণ হইল। 'যাক্ সে কথা—আজ যা' বল্লাম, মনে রেখো, মানুষ চিন্‌তে চেষ্টা কর, নতুবা পদে পদে বিপদে প'ড়্‌বে। আমার মান-সম্ভ্রম—যা' কিছু আছে, তা' বজায় রাখ্‌বার ভার তোমার উপর অর্পণ ক'র্‌লাম। তোমরা সব বুঝে সুঝে নাও, আমরা কাশীধামে চ'লে যাই।'

স্বর্ণকমল পিতৃবাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইল। রায়-মহাশয় যে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতেছেন, তাহা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। কৃষ্ণকমল পাঠশালা হইতে আসিল, দেখিতে দেখিতে রামকমলও আসিল। পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে তাহারা স্বর্ণকমলের পার্শ্বে বসিল। অতঃপর রায়-মহাশয় সংসার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন,—'তোমাদের তিন ভাইকে আর একবার ব'ল্‌ছি, পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদ যাহাতে আর না হয়, তা' কর। নিজ নিজ স্ত্রীকে শাসন কর, আর যেন আমাকে প্রতিদিন গলাবাজি না শুন্‌তে হয়। আমার বাড়ীর ঝগড়া মিটাতে পাড়ার লোক আস্‌বে, এ আমার অসহ্য। যদি তোমরা এ না পার, আমাকে স্পষ্ট ব'লে দাও, বাড়ী-ঘর পরিত্যাগ ক'রে যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাই।'

বলিতে বলিতে রায়-মহাশয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। স্বর্ণকমল মনে যাতনা পাইল। রামকমল, তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ভাবিয়া মনে মনে আনন্দিত হইল। কৃষ্ণকমলের মনে কোনরূপ ভাবই হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ

তিন ভাই—কৃষ্ণকমলের মন্ত্রপ্রয়োগ

সংসারের অবস্থা সম্বন্ধে স্বর্ণকমলের এখন অনেক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এখন আর তাহার পূর্ব্ববৎ উদাসীনতা নাই। কিরূপে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব ও প্রকৃত ভালবাসা জন্মিতে পারে, ভ্রাতৃ-বধূদ্বয়ের কুশিক্ষা ও হিংসামূলক কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয়, কলহস্রোত হ্রাস হয়, পারিবারিক সম্মান ও সুনাম পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার অন্তরে এই চিন্তা প্রবেশ করিল। বড়দাদা, মেজদাদার উপর তাহার অতুল ভক্তি। তাঁহারা যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য একে অন্যকে প্রতারণা করিতে পারে, কিংবা জানিয়া শুনিয়া আপন আপন স্ত্রীর জঘন্য ব্যবহারে প্রশ্রয় দিতে পারে, এ ধারণা তাহার পূর্ব্বে ছিল না। নানারূপ কার্য্য দেখিয়া এখন তাহার পূর্ব্ববিশ্বাস শিথিল হইয়া গেল। এতদিন তাহাদিগকে যে চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিল, এখন আর চেষ্টা করিয়াও সে চক্ষে দেখিতে পারে না। তাহাদের কথা মনে হইলে, বন্যার জলের ন্যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথা তাহার মনে আসিয়া পড়ে, আর সে স্থির থাকিতে পারে না। বড়দাদা, রামকমল তাহাদিগকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র গুপ্ত তহবিল বাঁধিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া স্বর্ণকমল মনঃকষ্ট পাইল। লুক্কায়িত ধন-লোভে তাহার কোন কষ্ট হইল না—রামকমলের ধন-লোভ ও হীনপ্রবৃত্তির কথা মনে করিয়া সে ব্যথিত হইল। কৃষ্ণকমল পারিবারিক কলহে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সময় সময় পিতামাতাকেও অতি কটু ও মর্ম্মপীড়াদায়ক বাক্য বলিয়া থাকে, এ কথাও স্বর্ণকমল জানিতে পারিয়াছে। ভ্রাতৃ-বধূদের চরিত্রও দিন দিন অতি নীচ ও ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছে। এই সকল কারণে স্বর্ণকমল মনে মনে ব্যথিত হইল এবং পারিবারিক-ব্যাধি-দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে স্থির করিল।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পিতাপুত্রে কথোপকথনের পাঁচ ছয় দিবস পরে স্বর্ণকমল একদিন সুযোগ বুঝিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, 'সে দিন বাবা যা ব'লেছেন, সে বিষয়ে আমাদের একটু মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা, দুশ্চিন্তায় ও আমাদের কুব্যবহারে মনঃকষ্ট পেয়ে, তিনি আরও জীণ-শীর্ণ হ'য়ে প'ড়ছেন। বাবার মনে যা'তে কোনরূপ কষ্ট না হয়, আমাদের প্রাণপণে সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।'

রামকমল স্বভাবতঃ কঠিন-প্রাণ ও নিম্মম! অনাবশ্যকরূপে রূঢ় কথা বলিয়া কাহাকেও মনঃকষ্ট প্রদান করিতে সে কখনও দ্বিধা বোধ করিত না। স্বর্ণকমলের কথায় সে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মুখবিকৃতি করিয়া কর্কশ-স্বরে বলিল, 'যেরূপ ইচ্ছা, ক'ল্লেই ত হয়; অত বলাবলির প্রয়োজন কি?—আমার এ সব বাজে কথা ভাল লাগে না!'

স্বর্ণকমল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'আমি কি ক'ত্তে পারি? এ কাজ ত শুধু আমা হ'তে, হ'তে পারে না। সকলে একমত হয়ে—'

স্বর্ণকমলের কথা শেষ না হইতেই রামকমল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'কার দোষে ঝগড়া বাধে, তা তলিয়ে দেখ, তার পর শাসন ক'ত্তে যেও, অত এক-মত দু-মত আমি বুঝি না।'

স্বর্ণকমল অবাক্ হইয়া কহিল, 'তা আমি একা দেখ্‌ব কেমন ক'রে? আর দোষ সম্ভবতঃ সকলেরই আছে। এক জনের দোষে প্রায় ঝগড়া হয় না।'

স্বর্ণকমল সুকুমারীর দোষও একরূপ স্বীকার করিল দেখিয়া রামকমল মনে মনে প্রীত হইল, এবার সে মহামায়াকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ করিবার জন্য, নির্লজ্জের ন্যায় মুখভঙ্গী সহকারে একটু তেজের সহিত বলিল, 'তা কেন হবে?—একজনার দোষে কি ঝগড়া হ'তে পারে না?—এ কি রকম কথা! তুমি দেখ্‌ছি সকলের ঘাড়েই দোষ চাপাতে চাও।'

স্বর্ণকমল বিরক্তির সহিত বলিল, 'দোষ চাপাচাপির কথা হ'চ্ছে না!—'

রামকমল পূর্ব্ববৎ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, 'দোষ চাপান বই আর কি! একজন আমার ক্ষেতি ক'র্‌বে, কিংবা আমার অবুঝ ছেলেটি তোমার সন্দেশটুকু মুখে দিলে ব'লে তুমি তাঁকে মেরে খুন ক'র্‌বে, সেই দুঃখে দুটা কথা ব'ল্লেই কি দোস হবে?

কৃষ্ণকমল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে মুক্তকেশী-প্রদত্ত শিক্ষার ফল প্রসব করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল। এইবার অবসর বুঝিয়া সে বলিল, 'আর এক জনের আস্ত কাপড় ছিঁড়ে দেবে, তার উপর যা'ইচ্ছে-তাই ব'ল্‌বে, এতে কোন কথা ব'ল্লেই ত ঝগড়া বেধে যায়।'

স্বর্ণকমলের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সে মনে মনে দুঃখিত হইয়া বলিল, 'কে এ সব করে, তার অনুসন্ধান ক'রে একটু শাসন ক'ত্তেই ত ব'ল্‌ছি।'

কৃষ্ণকমল রামকমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তার আর বলাবলি কি?—শাসন ক'ল্লেই ত হয়!'

রামকমল ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'তা বৈ কি!'

স্বর্ণকমল বুঝিল যে, তাহার দাদাদের বিচারে সুকুমারীই সকল দোষের আকর। মনে বড় দুঃখ হইল। অগত্যা কাতরকণ্ঠে বলিল, 'আন্দাজে কাকে শাসন ক'ত্তে পারা যায়?'

কৃষ্ণকমল একটু ক্রোধের সহিত বলিল, 'আন্দাজে কি ক'রে হ'লো, কে এ সব করে, তা কি তুমি জান না?'

স্বর্ণকমল। কে, তা ঠিক জানি না।

স্ত্রীবুদ্ধি-চালিত কৃষ্ণকমল বলিল, 'তা এখন জান্‌বে কেন! শিখিয়ে দেবার বেলা সবই জান। তোমাদের ঐ রকমই, বিষকুম্ভ পয়োমুখং। ইংরেজী প'ড়্‌লে ঐ রকমই হয়—মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে একটু আট্‌কায় না।'

কৃষ্ণকমলের বাক্যে স্বর্ণকমলের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, মর্ম্মযাতনায় তাহার প্রাণ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে ও দুঃখে চক্ষু হইতে সত্য

সত্যই অশ্রুধারা বহির্গত হইল। ভ্রাতৃদ্বয়ের অজ্ঞাতে স্বর্ণকমল বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের বেগ প্রশমিত হইল না। তাহাকে মিথ্যাবাদী, কপটাচারী ভাবিয়া কৃষ্ণকমল এরূপ ঘৃণিত ব্যবহার করিল দেখিয়া তাহার প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিল। সংসারে অনভিজ্ঞ, সরলপ্রকৃতি, মর্ম্মপীড়িত যুবক কাতর-কণ্ঠে পুনরায় বলিল, 'মেজদাদা! এরূপ কথা কেন বল্‌ছো? আমি ত কখনও কোন মিথ্যা কথা বলি নাই, আর এ জীবনে কখন কাকেও পরের কাপড় ছিঁড়ে দিতেও উপদেশ দিই নাই?'

স্বর্ণকমলের সরল কাতরোক্তিশ্রবণে কৃষ্ণকমলের অন্তঃকরণ একটু নরম হইল, মুক্তকেশীর কথার সত্যতা-সম্বন্ধেও তাহার একটু সন্দেহ হইল, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য মাত্র। মুক্তকেশী যে তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, "একবার 'দাদা' ব'ল্‌লেই তুমি সব ভুলে যাবে," সে কথাও তাহার মনে পড়িল। এখন একটু কঠিন হইতে না পারিলে, মুক্তকেশীর কথা সত্য হইবে, মুক্তকেশী তাহাকে দুর্ব্বলহৃদয় ও বোকা বলিয়া তিরস্কার করিবে, এই সমস্ত কথা প্রবল স্রোতের ন্যায় হু হু করিয়া তাহার মনে আঘাত করিতে লাগিল; কৃষ্ণকমল হৃদয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া সেই স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিল। মুক্তকেশী ও মহামায়ার আড়ালে থাকিয়া পরের কথা শুনিবার রোগ প্রবল ছিল। বহির্ব্বাটীতে বা যে কোন স্থানে যখন যে কথা হইত, তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহা জানিতে পারিত, কৃষ্ণকমল ও রামকমল এ কথা জানিত। প্রলয়ঙ্করী-স্ত্রীবুদ্ধিচালিত কৃষ্ণকমল মুক্তকেশীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বর্ণকমলের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্দ্দয় হইয়া ক্রোধের সহিত বলিল, "আর দাদা ব'লে কাজ নেই—আমি সব জানি। তোমাকে আর একটি কথা ব'লে দিচ্ছি, ঘরে ব'সে অমনতর ক'রে আর 'জুতো-জুতি' ক'রো না। ফের ও সব কথা ব'ল্‌বে ত রক্তবৃষ্টি হ'য়ে যাবে—আমার স্পষ্ট কথা!"

কৃষ্ণকমলের উক্তি শুনিয়া স্বর্ণকমল একবারে হতবুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ

হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল তাহার বাক্যস্ফুরণ হইল না। কিরূপে তাহার দাদা এইরূপ ভ্রমপূর্ণ ধারণার বশবর্ত্তী হইল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অতঃপর ম্লানমুখে, কাতরকণ্ঠে, অথচ একটু তেজের সহিত বলিল, 'মেজদাদা! তুমি হয় ত কোন কুলোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে আমাকে এ সব কথা ব'লছো! আমি কি এমনই নরাধম, পাষণ্ড! তোমার কথা শুনে আমার অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখ বোধ হ'চ্ছে। দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, বল, কে আমার নামে এ সব ভয়ানক মিথ্যা কথা ব'লেছে?'

স্বর্ণকমল ব্যাকুলতার সহিত সত্য সত্যই কৃষ্ণকমলের পাদস্পর্শ করিল, তাহার সুন্দর মুখশ্রী রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকমল প্রাপ্তমন্ত্র প্রয়োগের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। স্বর্ণকমলের কাতর-কণ্ঠনিঃসৃত সরলোক্তি শ্রবণে, তাহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়া মাত্রেই মুক্তকেশীর মূর্ত্তি তাহার মন-পটে অঙ্কিত হয়, আর তৎক্ষণাৎ সে চকিতের ন্যায় বলপূর্ব্বক হৃদয় হইতে দয়ার ভাব দূর করিয়া দিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। স্বর্ণকমলের হস্ত হইতে আপনার পা মুক্ত করিয়া সে সক্রোধে বলিল, 'থাক্, আর ভালবাসায় কাজ নাই। দু'পাতা ইংরেজী প'ড়ে অত অহঙ্কার ভাল দেখায় না। অমন বিদ্যে অনেকের থাকে, তা ব'লে তারা যাকে তাকে অত জুতো মারে না। অমনতর কথাও কয় না।' তার পর একটু থামিয়া কৃষ্ণকমল আবার বলিল, 'আর বলা হ'চ্ছে কিনা, আমরা মিথ্যাবাদীর কথা শুনে ব'লছি। তা' মিথ্যে বৈ কি, আমরা যা বলি, সব মিথ্যে, ওঁরা দুজনে যা বলেন, তাই ঠিক!'

স্বর্ণকমলের বুদ্ধি-লোপ হইল, আশা ফুরাইল, আর কথা সরিল না। ভ্রাতৃদ্বয়ের মূর্খতা ও বুদ্ধিহীনতার বিষয় ভাবিয়া সে মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হইল। পুনরায় তাহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। মনের অস্থিরতা একটু প্রশমিত করিয়া, অনিচ্ছার সহিত, অনন্যোপায় হইয়া, রামকমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'বড়দাদা! তুমি এর বিচার কর, যদি কোন-

রূপ দোষী হই, তুমি শাসন কর। এই মিথ্যা কলঙ্কে আমার প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বিচার কর।'

রামকমল তাহার স্বাভাবিক কঠিন কণ্ঠে বলিল, 'আমি এ সব বিচারে টিচারে নেই। তোমাদের যা ইচ্ছে, তাই কর।'

স্বর্ণকমল হতাশ হইয়া মনঃকষ্টে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, কোন কথা কহিল না। কৃষ্ণকমল রামকমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'দেখ্‌লে কেমন অহঙ্কার?'

রাম। তা আর দেখ্‌বে কি—আমার জানাই আছে। নিজের স্ত্রীকে শাসন ক'র্ত্তে পারেন না, ভারি ত বিদ্যে!

রামকমল, কৃষ্ণকমল দুই ভ্রাতার প্রত্যেক বিষয়ে মতের মিল হইল। ধূর্ত্ত রামকমল মনে মনে ভাবিল যে, স্বর্ণকমল ও কৃষ্ণকমলে একটা ঝগড়া বাধাইয়া দিতে পারিলে, লোকের নিকট সে নির্দোষ থাকিবে, শীঘ্র পৃথগন্ন হইবারও একটা সূত্র হইবে। কিন্তু সে মনে মনে জানিত যে, স্বর্ণকমল বুদ্ধিমান্ ও উদারপ্রকৃতি। তাহার নিকট তাহার কৌশল খাটিবে না। এ জন্য সে স্থূলবুদ্ধি কৃষ্ণকমলের ঘাড়ে চাপিল। কৃষ্ণকমল তাহার বাহ্য ভালবাসা ও সহানুভূতিতে মুগ্ধ হইল এবং তাহার উপদেশ ও পরামর্শানুসারে কলহস্রোত বাড়াইতে লাগিল।

সেই দিন হইতে স্বর্ণকমলও তাহার আপন ক্ষমতা বুঝিল, মেজদাদার বুদ্ধির দৌড় কত, তাহা বুঝিল, পাকা বাঁশ নোয়ান যে অসাধ্য, তাহাও বুঝিল; আর বুঝিল যে—বিনা কারণেও ঝগড়া-বিবাদ হইতে পারে। মূর্খের পক্ষে সবই সম্ভব। স্বর্ণকমল পিতা, মাতা ও সুকুমারীকে সকল কথা বলিল এবং রায়পরিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তামগ্ন হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার কলেজ খুলিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। সুকুমারীকে নানারূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া, পিতৃ-মাতৃ ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃবধূ-চরণে প্রণাম করিয়া সে কলিকাতা চলিয়া গেল। ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃবধূ-চরণে প্রণাম করিতে

এবার তাহার ভক্তি হয় নাই, সমাজের খাতিরে পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল মাত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দুই বন্ধু

স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র সমপাঠী। সাত বৎসর এক বিদ্যালয়ে এক শ্রেণীতে পাঠ করিয়া উভয়ে একই বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখনও এক সঙ্গেই পাঠকরিতেছে। ক্রমাগত সাত বৎসর একসঙ্গে বিদ্যালয়ে গমন, একসঙ্গে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন, একসঙ্গে ভ্রমণ, ছুটীর সময় একত্র বাড়ী গমন হেতু বন্ধুত্ব ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়াছে। তারপর, স্বর্ণকমলের ভার্য্যা সুকুমারী দীনেশচন্দ্রের প্রতিবেশিকন্যা, গ্রাম-সম্পর্কে ভগিনী। সুকুমারী দীনেশচন্দ্রকে 'দাদা' বলিয়া ডাকে। এ দিকে দীনেশচন্দ্রের প্রিয়তমা ভার্য্যা গিরিবালা স্বর্ণকমলের জ্ঞাতি-ভগিনী। উভয়ের অবস্থায়ও কতক সমতা আছে। দীনেশচন্দ্র সম্ভ্রান্তবংশজাত, জমিদারপুত্র। স্বর্ণকমল দীনেশচন্দ্রের ন্যায় ধনি-পরিবারে জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলেও দরিদ্রতা কাহাকে বলে, তাহা বড় জানিতে পারে নাই। উভয়ের বাড়ী উভয়ের যাতায়াত ছিল। এই সমস্ত কারণে পরস্পর পরস্পরের প্রিয় সুহৃদ্ হইয়াছে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উভয়ে পটোল-ডাঙ্গার এক বাসাবাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।

স্বর্ণকমলের কলিকাতা পৌছিবার পরদিন অপরাহ্ণে দুই বন্ধু একসঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেল। দীনেশচন্দ্র পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। স্বর্ণকমলের সদাপ্রফুল্ল-মুখ বিষণ্ণ হইল। দীনেশচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া সহানুভূতিসূচক স্বরে ধীরে ধীরে বলিল,—'এবার বাড়ীতে তত ভাল ছিলে না—তোমার চেহারা খুব খারাপ হয়েছে।'

স্বর্ণকমল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'আর ভাল মন্দ কি? মঙ্গলময় ঈশ্বরের সকল কার্য্যেই মঙ্গল। আমরা নাস্তিক, ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য, তাই তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনঃকষ্ট ভোগ করি।'

দীনেশচন্দ্র বুঝিল যে স্বর্ণকমলের মনে কোন দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। বলিল, 'সুকুমারীর কোন অসুখ হয় নাই ত ?'

স্বর্ণকমল বলিল, 'না।'

দীনেশচন্দ্র জানিত যে, স্বর্ণকমলের অন্তঃকরণ বড় কোমল, পিতা-মাতার প্রতি তাহার অসীম ভক্তি, রামকমল, কৃষ্ণকমলের পুত্রকন্যাগণের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ। তাই জিজ্ঞাসা করিল, 'ননীগোপাল, সুশীলা, সরলা ভাল আছে ?'

স্বর্ণ। হাঁ, কোন অসুখ দেখি নাই।

দী। তোমার বাবা, আর মা ?

স্বর্ণ। শারীরিক কোন অসুখ দেখি নাই।

দী। মানসিক ?

স্বর্ণ। মানসিক বড় যাতনা পাইতেছেন।

দী। কি যাতনা, ভাই ?

'বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও হয়। কিন্তু তোমাকে না বলিলেও মনে শান্তি পাই না।' বলিয়া স্বর্ণকমল থামিল।

দী। কি হ'য়েছে আমায় খুলে বল। আমাকে পর ভেবো না।

স্বর্ণকমল গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পারিবারিক অবস্থা বলিতে আরম্ভ করিল। রামকমল, কৃষ্ণকমল ও ভ্রাতৃ-বধূগণের কুব্যবহারে ও বিষবাক্যপ্রয়োগে কিরূপে বৃদ্ধ পিতামাতা অপমানিত, লাঞ্ছিত ও মনঃক্লিষ্ট হইতেছেন, কিরূপে শাসনবহির্ভূত ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া সরলা সুকুমারী অশ্রুজলে ভাসিতেছে, কিরূপে শান্তিস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া স্বর্ণকমল নিজে ভ্রাতৃদ্বয়কর্ত্তৃক ঘৃণা ও তাচ্ছল্যের সহিত ব্যবহৃত ও

মিথ্যাবাদী, কুপরামর্শদাতা ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত ও তিরস্কৃত হইয়াছে, ইত্যাদি একে একে সকল কথা বলিয়া, উপসংহারে বলিল, 'আর ভাই সুখ নাই,—আর বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু পিতামাতার বিষণ্ণ-মূর্ত্তি আর চোখের জল দেখ্‌লে আমার প্রাণ অস্থির হয়, তাঁদের কথা মনে হ'লে সেই অশান্তিপূর্ণ গৃহে যাবার জন্যই আবার মন কেঁদে ওঠে।'

দী। কি জন্য এরা এরূপ ক'চ্ছে ?

স্বর্ণ। তা' কি ক'রে জান্‌ব ?

দী। প্রতিদিনই কি ঝগড়া হয় ?

স্বর্ণ। প্রতিদিন কেন ?—প্রতি মুহূর্ত্তে !

আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীনেশচন্দ্র সকল অবস্থা বুঝিল, স্বর্ণ-কমলের অবস্থা চিন্তা করিয়া দুঃখিত হইল। বলিল, 'এরূপ হ'বারই কথা। ব'ল্‌লে ভাই দুঃখিত হবে, তোমার বড়দাদা, মেজদাদা নেহাত অশিক্ষিত। তার উপর আবার কখনও সভ্যসমাজে বেরোয় নি। চিরটা-কাল পাড়াগেঁয়ে চাষাভূসোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা, আলাপব্যবহার, মেশামিশি ক'রে ওদের চরিত্র-ব্যবহারও অনেকটা ঐরূপ হ'য়ে গেছে; এরূপ নীচ-সংসর্গে যারা সর্ব্বদা চলাফেরা করে, তাদের চরিত্রে মহত্ত্ব বা উদারতা থাক্‌বে কিরূপে ? স্ত্রীকে উপদেশাদি প্রদান ক'রে কিরূপে শাসনে রাখ্‌তে হয়, তা' ত তারা জানে না। আর স্ত্রীলোক উচ্ছৃঙ্খল, শাসনবহির্ভূত হ'লে যে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটে, পুত্র-পরিবারের ইহকাল পরকাল মাটী হয়, তা' বোঝ্‌বার শক্তিও ওদের নাই।'

স্বর্ণকমল দুঃখিত হইয়া বলিল, "ছেলেমেয়েগুলির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তা' শুন্‌লে তুমি অবাক্ হবে। ওদের পরের গাছের শশা, কুল, আম ইত্যাদি চুরি ক'রে আন্‌তে শিখিয়ে দেয়—না আন্‌লে প্রহার করে! একদিন আমি ননীগোপালকে এজন্য একটু শাসন ক'রেছিলুম, দুই একটি চড়ও মেরেছিলুম; এজন্য, ভাই, বড়-বৌ আমাকে দুই ঘণ্টা ক্রমাগত

গালাগালি দিতে লাগলো। ব'ল্লে, 'আদর ক'রে একটি জিনিস দেবার বেলা কেউ কর্ত্তা হয় না, পিয়ের ছেলেকে মেরে খুন করার বেলা অনেক কর্ত্তা পাওয়া যায়।' আমি শুনে অপ্রস্তুত হ'লুম, বড়দাদাকে এ সংবাদ ব'ললুম, তিনি গ্রাহ্য ক'ল্লেন না।"

দীনেশচন্দ্র স্থিরভাবে বলিল, "তা' ত হ'বারই কথা। ভবিষ্যতে যা' ব্যবসা ক'রে খেতে হবে, পিতামাতা সন্তানকে তা' শিখিয়ে না দিলে যে, তাদের কর্ত্তব্য কাজ করা হয় না। তুমি তাদের সৎকাজে বাধা দিচ্ছিলে, গাল খাবে বৈ কি! এর জন্য পরে যে কাঁদতে হবে, ততটুকু বোঝবার শক্তি ওদের নাই। তোমার বড় দাদার কথা মনে হ'লে, এখনও আমার হাসি পায়। গ্রীষ্মের ছুটীর সময় যখন আমি তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলুম, আমার সঙ্গে কয়েকখানি সংবাদপত্র ছিল। আমি অবকাশমত তাই পাঠ ক'রতাম। তা' দেখে তোমার বড়দাদা একদিন আমায় গম্ভীরভাবে ব'ল্লেন, 'এ সব প'ড়ে আপনাদের কি লাভ হয়?—কেন আপনারা এ সব পয়সা ব্যয় করেন?' আমি একটু হেসে ব'ললাম, 'দেশের খবর, অবস্থা ইত্যাদি জানতে পারা যায়, বহু জ্ঞান জন্মে।' তদুত্তরে তিনি ব'ললেন, 'আমরা যে এ সব পড়ি না, আমাদের কি ক্ষেতি হয়? আর দেশ-বিদেশের খবর জানা-জানিতে লাভ কি? আপনার ঘরের অবস্থা জেনে শুনে কাজ ক'ত্তে পা'ল্লেই হ'ল।' আমি মনে মনে হাসলাম, কোন উত্তর প্রদান ক'রলাম না। এরূপ যার বুদ্ধি, সে আর পুত্র-কন্যার কুকর্ম্মে শাসন ক'রবে কি? বিনা পয়সায় শশাটা, কলাটা পেলে সে বরং আরও পুত্র-কন্যার প্রতি সন্তুষ্টই হবে!"

স্বর্ণ। হ'চ্ছেও তাই। কাণ্ড দেখে আমার বুদ্ধি-লোপ হ'চ্ছে। ভবিষ্যৎ ভেবে আমি আকুল হই। আর বাড়ীতে যেতেও ইচ্ছে হয় না।

দী। তোমার চেষ্টায় কোন ফল হ'বে না। তুমি হিত ব'ললে, ওরা বিপরীত বুঝবে। তোমার দাদারা স্ত্রীবুদ্ধি-পরিচালিত হ'য়ে যখন এরূপ

জঘন্য ব্যবহার ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, তখন আর উপদেশে কোন ফল হ'বে না। সুতরাং তোমার নিরস্ত হওয়াই উচিত।' এই কুশিক্ষা-প্রাপ্ত সন্তানগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে যখন নিজ পিতামাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌বে, পিতামাতার বুকে পাষাণ চাপাতে চাইবে, চৌর্য্য, লাম্পট্য ইত্যাদি অভিযোগে যখন রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'বে—পিতামাতাকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা দিতে আরম্ভ ক'র্‌বে, তখন ওদের জ্ঞান জন্মাবে, আর তোমার কথা স্মরণ হ'বে ; এর পূর্ব্বে নয়।

স্বর্ণ। সে সব চিন্তা এখন পরিত্যাগ ক'রেছি। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি অত্যাচার হয়, তাহা নিবারণের কি উপায় করি ? আর সুকুমারী—

দী। এর আর কি ক'র্‌বে ? দেখা যাক্ কি হয়। সুকুমারীর পত্র এলেই সব জান্‌তে পা'র্‌বে। মানুষের কি নীচ প্রবৃত্তি, কি জঘন্য রুচি, আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না। ঐ ত সব গুণের স্ত্রী! ওদিকে সন্তুষ্ট ক'র্‌বার জন্য পিতা, মাতা, ভাই-ভগিনার প্রতি কিরূপ কুব্যবহার করে ! এদের কি একটু লজ্জাও হয় না ?

স্বর্ণকমল গম্ভীর-বদনে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'লজ্জা ?—লজ্জা অনেক-কাল লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেছে। জ্যেষ্ঠ ভাই—পরম গুরু, তাঁদের বিরুদ্ধে কথা ব'ল্‌তে হ'চ্ছে, কি দুর্ভাগ্য! আমি পূর্ব্বে কখনো তাঁদের সঙ্গে অধিক কথা বলি নাই, সুতরাং তাঁদের প্রকৃতিও জান্‌তে পারি নাই, এবার দুই তিন দিন তাঁদের মুখে যে সব কথা শুনেছি, তা' মনে হ'লে এখন আমার দুঃখ ও লজ্জা হয়। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নিকট এরূপ কথা শুন্‌তে হবে, তা' আমি কখনো মনে করি নাই।'

দী। সে যা' হউক, তুমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। এখন হ'তে তোমাকে একটু সাবধান হ'য়ে চ'ল্‌তে হ'বে, নতুবা বিপদ্‌গ্রস্ত হবে। জেনো, মূর্খশত্রু বড় ভয়ঙ্কর ; হিতাহিত-জ্ঞান না থাকায় ওরা সব ক'র্‌তে

পারে। কোন্ কার্য্যের কি ফল দাড়াবে এবং এতে তাদের কি অনিষ্ট হবে, কার্য্য আরম্ভ না ক'রে তারা তা' বুঝ্‌তে পারে না। সুতরাং এদের পক্ষে কোন কাজ করাও অসম্ভব নয়। আর একটি কথা, সকল সময় এদের প্রতি মহত্ত্ব প্রদর্শন ক'রো না ; কারণ, যে 'মহত্ত্ব' উপলব্ধি ক'র্‌তে না পারে, তার নিকট তা' ক'রে লাভ কি ? জ্ঞানী শত্রুর একটি অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'র্‌লে, সে নিজেই মনে মনে লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়। কিন্তু মূর্খ শত্রুর অত্যাচার বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য ক'র্‌লে সে মনে ক'র্‌বে যে, তোমার তার প্রতীকার ক'র্‌বার ক্ষমতা নাই, সুতরাং সে ক্রমে অধিক অত্যাচারী হ'বে। আমার এই কথাগুলি মনে রেখো। তুমি যেরূপ প্রকৃতির লোক, সমস্ত পৃথিবীকে সেরূপ মনে ক'র্‌লে পদে পদে বিড়ম্বিত হ'বে, এ নিশ্চয় কথা।

স্বর্ণকমল একাগ্রমনে বন্ধুর কথাগুলি শুনিল। সংসার-সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্ব-ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বর্ণকমলের পত্র

কলিকাতা আসিয়া কয়েক দিন পরে স্বর্ণকমল সুকুমারীর নিকট এই পত্রখানি লিখিল,—

"প্রিয়তমা সুকুমারি !—তোমাদের কথা মনে হইলে আমি ব্যাকুল হইয়া পড়ি, পত্রে যে কি লিখিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। এজন্য লিখি লিখি করিয়া এই কয় দিন পত্র লিখা ঘটিয়া উঠে নাই। হয় ত' বৃদ্ধ পিতামাতা কত যাতনা সহিতেছেন, কত মনঃকষ্টে দিন-যাপন করিতেছেন, আর তুমিও হয় ত' কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ। এইরূপ

অশান্তি-পূর্ণ ভাবনায় দিবারাত্রি, চব্বিশ ঘণ্টা আমার মন চঞ্চল থাকে। এখানে আসিয়া অবধি আমি একটি মুহূর্ত্তও তোমাদের কথা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এ পর্য্যন্ত একখানা পুস্তকের দু'পাতা পড়িয়াছি বলিয়াও মনে হইতেছে না। পারিবারিক চিন্তায় আমার পাঠের বড় অনিষ্ট হইতেছে, কিন্তু যাহা অনিবার্য্য, তাহার জন্য বৃথা ভাবিয়া লাভ নাই। আশা করি, ভগবানের অনুকম্পায় তোমরা নিরাপদে আছ—বিশেষ কোন পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে নাই। গত ছুটীর সময় বাড়ীর অবস্থা যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা মনে হইলে আমার বুদ্ধিলোপ হয় এবং এই অবস্থায় তোমাকে যে কি উপদেশ প্রদান করিব, কোন্ পথে চলিতে বলিব, তাহা আমি নিজেই স্থির করিতে পারি না। মানুষ যে এত অনুদার-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইতে পারে, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি-শূন্য হইয়া জনক-জননীর প্রতি এরূপ জঘন্য ব্যবহার করিতে পারে, ভ্রাতৃ-স্নেহ ভুলিয়া যাইতে পারে, ইহা আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। ভদ্র বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা যে নীচ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, আপন আপন স্বামীকে এরূপ কুমতি প্রদান করিতে পারে, আর শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি এত ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিতে পারে, এ ধারণাও আমার ছিল না। আর মানুষ যে সুব্যবহারকারীর প্রতি কুব্যবহার করিতে পারে, ভালবাসার প্রতিদানে নির্ম্মমতা প্রদান করিতে পারে, বিনয়নম্র বচনের প্রত্যুত্তরে রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে, ইহাও আমার ধারণা ছিল না। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও যে জঘন্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি নাই, আপন গৃহে—আপন ভ্রাতাতে, আপন ভ্রাতৃ-বধূতে তাহা দেখিতে হইবে, ইহা ত আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল।

যাক্—এ সব কথা লিখিয়া কাজ নাই, কিন্তু আজ তোমাকে দুটি-দুই কথা বলিতে হইতেছে। পূর্ব্বে তোমাকে যেরূপ ভাবে উপদেশ দিয়াছি, এ পত্রে ঠিক সেরূপ উপদেশ দিতে পারিতেছি না। ইহা কপালের দোষ বটে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, তোমার বড়-দিদি মেজ-

দিদির বিরুদ্ধে কখনও কোনরূপ কুভাব হৃদয়ে ধারণ করিও না, তাহাদের প্রতি পূর্ব্ববৎ ভক্তি রাখিও, তাহাদের পুত্র-কন্যাকে অন্তরে ভালবাসিও, কিন্তু এই ভক্তি ও ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ করিও না। কারণ, তুমি যাহা সুভাবে অর্পণ করিবে, তাহারা তাহা কুভাবে গ্রহণ করিবে—কাজেই বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে। তুমি ননীগোপালকে আদর করিয়া কোলে লইলে যদি এই অপরাধে অপোগণ্ড শিশুকে প্রহার-যাতনা সহ্য করিতে হয়, কিংবা মাতৃস্তন্য পান করিতে গিয়া বুক পাতিয়া পদাঘাত লইতে হয়, তবে সে অবস্থায় তোমার আদর না করাই সঙ্গত। এইরূপ সকল বিষয়ে সভা বুঝিয়া কীর্ত্তন গাইতে হয়। যে অমৃত পান করিবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক অমৃত পান করাইতে চাহিলে, সে উহা বিষবৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে, ইহা সুনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে তোমাকে আর অধিক কি উপদেশ দিব। কাহারও কথার উত্তর দিও না, কেহ তিরস্কার করিলে তাহা পুরস্কার জ্ঞানে অবনতমস্তকে গ্রহণ করিও, দুর্ব্বাক্য বলিলে আমার দিকে চাহিয়া তাহা নীরবে সহ্য করিও। এই পন্থা অবলম্বন করিলেই যে তুমি বিপদ সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারিবে, এখন সে বিশ্বাস আমার নাই; ইহাতে বিভ্রাট কম হইবে মাত্র। কারণ, আমার বিশ্বাস যে, তুমি যদি তাহাদের কথার উত্তর না দাও, তবুও তাহারা সম্ভবতঃ নিজ নিজ স্বামীকে বুঝাইয়া দিবে যে, তুমি তাহাদিগকে অনর্থক গালাগালি দেও; কিন্তু তুমি যদি তাহাদের একটি কথার উত্তর প্রদান কর, তবে তাহারা হয় ত বলিবে যে, তুমি তাহাদিগকে গালি দেও, প্রহার করিতে চাও, আর তাদের ছেলেমেয়ে-গুলিকে অভিসম্পাত কর, ইত্যাদি। তাই বলিতেছি যে, সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে—কাহারও কথার উত্তর প্রদান করিবে না।

বৃদ্ধ জনক-জননীর সেবা-শুশ্রূষার সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর, ইহা যেন মনে থাকে। সকল কাজ ত্যাগ করিয়াও, যাহাতে তাঁহাদের সুখ-শান্তি হয়, মানসিক যাতনা একটু ব হয়, তাহা করিবে। আমাদের কাহারও

জঘন্য ব্যবহারে যদি তাঁহারা মনঃক্লিষ্ট হইয়া একবিন্দু অশ্রুপাত করেন, তবে আমাদের সকলকেই ইহার প্রতিফল ভুগিতে হইবে।। ইতিমধ্যে কোনরূপ দুর্ঘটনা হইয়া থাকিলে, বিস্তারিতরূপে লিখিয়া জানাইবে। আমার পাঠের ক্ষতি হইবে কিংবা আমি মনঃকষ্ট ভোগ করিব, ভাবিয়া আমার নিকট কোন কথা গোপন করিও না—এরূপ করিলে বরং আমার অধিক ক্ষতি হইবে। কারণ, সন্দেহের পীড়নে আমার হৃদয় হইতে শান্তি পলায়ন করিবে, কল্পনাকে সত্য মনে করিয়া আমি দিবারাত্রি মনাগুনে জ্বলিয়া মরিব। ইহা মনে রাখিয়া যখন যাহা হয়, আমার নিকট তাহার যথাযথ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইবে—কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিবে না। এ পত্রে আর অধিক কি লিখিব। আমার একটি অনুরোধ—অশ্রুপাত করিয়া যাতনা ভোগ করিও না। তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারীর উত্তর

"প্রিয়তম!—তোমার আশীর্ব্বাদ-পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার পত্র পাইলে যেন আমি হারানিধি কুড়াইয়া পাই—আমার শুষ্ক প্রাণে রস আসে। তোমার পত্র আসিলে আমার দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কোন কষ্টই থাকে না, সকল কষ্ট ভুলিয়া যাই, বড়-দিদি মেজ-দিদির অযথা তিরস্কারেও তখন আমার বড় কষ্ট হয় না, তখন আমি সুখে আত্মহারা হই, মনে-মনে কেবল সুখের চিত্র অঙ্কিত করি। কিন্তু আমি নিতান্ত হতভাগিনী, তাই না ভাবি, তাহার বিপরীত ঘটে। ভগবান্ যখন দয়া করিয়া এই হতভাগিনীকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিলেন, তখন তোমার হাসিমাখা মুখ দেখিয়া এবং তোমার পিতা-মাতার সহাস্যবদনে স্নেহমাখা বচন শুনিয়া

আমার মনে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। তখন মনে করিয়াছিলাম, এমন সুখী পরিবার বুঝি বড় বিস্তর নাই! এখন যে তাঁহারা কেহ আমার প্রতি কর্কশ বাক্য বলেন, ইহা বলিতেছি না। এখন বরং তাঁহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের সহিত কথা কহেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখে সেই হাসি আর নাই, সেই প্রফুল্লতা পলায়ন করিয়াছে: তাঁহারা এখন সদা বিষণ্ণ, সর্ব্বদা দুঃখিত-চিত্ত। মায়ের চক্ষে কখন কখন অশ্রুজলও দেখিতে পাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, চক্ষু মুছিয়া 'কৈ মা? কাঁদ্‌ব কেন, মা?' বলিয়া আমাকেই পুনরায় সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করেন, কোন কারণ বলেন না। তিনি বলুন আর না বলুন, আমি সব বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু বুঝিতে পারিয়াই বা লাভ কি? আমি ত তাঁহার দুঃখ দূর করিতে পারি না। মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বড়-দিদি বা মেজ-দিদিকে অনুনয়-বিনয় করিয়া দুই-একটি কথা বলিলে, তাঁহারা আরও নির্দ্দয়রূপে সকলকে গালাগালি করিতে থাকেন। আমাকে গালি দিলে মা কাঁদেন, তাঁহার কান্না দেখিলে আমিও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারি না।

তোমাকে সকল কথা লিখিয়া জানাইতে লিখিয়াছ। কিন্তু লিখিব কি? দশটি অশুভ সংবাদের সঙ্গে যদি তোমাকে একটিও শুভ সংবাদ দিতে পারিতাম, তবে কোন কথা লিখিতে ভয় হইত না। কেবল বিবাদ, বিসংবাদ ও অশ্রুপাতের সংবাদ লিখিয়া তোমার মনঃকষ্ট বাড়াইতে আমার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তুমি আমার দেবতা, প্রাণ গেলেও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার ইচ্ছা হয় না; যেদিন সেরূপ কু-ইচ্ছা হইবে, ভগবান্ করুন, সে দিন যেন আমি মরিয়া যাই। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা, তোমার অনিচ্ছায় আমার অনিচ্ছা; সুতরাং তুমি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া জানাইতেছি।

তুমি জান যে, তোমার দেবুকাকার স্ত্রী গর্ভবতী। তাঁহার সাধ-ভক্ষণ উপলক্ষে গত পরশ্ব আমাদের সকলের ে বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল। আমার তথায় যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মায়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না ; মা, বড়-দিদি, মেজ-দিদির সঙ্গে আমাকেও যাইতে হইল। তথা হইতে আসিয়া আমার পরিহিত বারাণসী শাটীখানা ছাদের উপর রৌদ্রে শুকাইতে দিলাম। অপরাহ্নে শাড়ীখানা আনিতে গিয়া দেখি যে, কাপড়ের লম্বাদিকে প্রায় তিন হাত স্থান ছেঁড়া। সত্য কথা বলিতে কি, নূতন শাড়ীখানার এই অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল এবং মা দেখিলে কি বলিবেন ভাবিয়া, একটু ভীতা হইলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শাড়ীখানা ভাঁজ করিয়া নীচে নামিলাম এবং মায়ের অজ্ঞাতে তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিতেছিলাম, এমন সময় গিরিবালা পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া 'দেখি কাপড়খানা' বলিয়া আমার হস্ত হইতে হঠাৎ তাহা টানিয়া নিল এবং কাপড়ের ছেড়া স্থান দেখিয়া একটু চমকিয়া বলিল, 'এ কি ! এমন সুন্দর কাপড়খানার কে এমন দশা ঘটাইল ?' মা, গিরির কথা শুনিয়া নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি লা গিরি ?' গিরিবালা শাড়ীখানা দেখাইল। মা কতক্ষণ একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন, পরে ক্রোধে অধীর হইয়া, কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া কতক্ষণ নিরুদ্দেশে গালাগালি করিলেন। বড়-দিদি, মেজ-দিদি এজন্য মাকে যা-ইচ্ছা-তাই বলিতে লাগিলেন, মা নিজ-গৃহে যাইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তার পর ননীর বাবা ও সুশীলার বাবা বাড়ীতে আসিলে বড়-দিদি ও মেজ-দিদি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত কি বলিলেন। অতঃপর তাঁহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়া অশ্লীল ও অভদ্রোচিত ভাষায় কত গালাগালি দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মা উভয়কে লক্ষ্য করিয়া অতি দুঃখে কহিলেন, 'দেখ্ রামকমল, কৃষ্ণকমল ! তোরা ভাসুর হয়ে ছোট-বৌকে এ সব কথা বলিস্, আর এরূপ ব্যাভার

করিস্, তোদের কি লজ্জা হয় না? ছি! ছি! ছি! হয়ে মরে গেলে যে ছিল ভাল!' এই কথা শুনিয়া তাঁহারা চারি জনে গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং মাকে পূর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দয়রূপে বকিতে লাগিলেন এবং প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। মা পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন, গতিক ভাল নহে বুঝিয়া কর্ত্তাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাবা এতক্ষণ নিমন্ত্রণবাড়ীতে বসিয়া ভদ্রলোকেদের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া বাটী আসিলেন। সকল অবস্থা অবগত হইয়া তিনি যেন হতজ্ঞান হইলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু তোমার বড়-দাদা, মেজ-দাদা আর বড়-দিদি, মেজ-দিদি, তখনও পূর্ব্ববৎ গালাগালি করিতেছিলেন। কর্ত্তা মহাশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাগত স্বরে বলিলেন, 'তোমরা চুপ করিবে কি?'

তাঁহার কথা শুনিয়া তোমার বড়-দাদা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, 'এরূপ করিলে কে চুপ করিতে পারে? ছোট-বৌ যে, যার তার নামে মিথ্যা কথা রটায়, আর মা যে তার পক্ষ হ'য়ে, যাকে তাকে মিছামিছি গালাগালি দেয়, এর একটা উচিত বিচার ক'র্ত্তে হয়.করুন, নইলে কিন্তু পরে আমাদের কোন দোষ দিতে পারবেন না। আমার স্পষ্ট কথা!' কর্ত্তা রাগতস্বরে বলিলেন, 'আমি আজ সত্য-সত্যই ইহার বিচার করিব এবং যার দোষ দেখিব, তাকে উচিত শাস্তি দিব, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা।' ইহা বলিয়া তিনি বড়-দিদি ও মেজ-দিদিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কাপড় ছিঁড়িয়াছ? সত্য করিয়া বল!' তাঁহারা অস্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল ও সুশীলাকে ডাকিয়া চক্ষু লাল করিয়া একে একে বলিলেন, 'কেন কাপড় ছিঁড়েছিস্ বল্, নতুবা তোর হাড় গুঁড়ো ক'রে দিব।' তাঁহার কথা শুনিয়া নন্দগোপাল কাঁদিতে লাগিল, কথা কহিল না, নবলক্ষ্মী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'আমার দোষ কি? মা ব'লেছে, তাই ছিঁড়েছি; আমায় মেরো না ঠাকুরদাদা; যতটুকু ছিঁড়েছি, আমি তা শেলাই ক'রে দিব।' আর সুশীলা কাঁদিয়া বলিল,

'আমি ত কাপড় ছিঁড়ি নাই, বাক্স জলে ফেলে দিয়েছি, তা এখনি তুলে দিব।' কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ বাক্স?' সুশীলা কহিল, 'কাকীমার গহনার বাক্স।' এই কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম এবং নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে আসিয়া গহনা খুলিয়া যে ছোট টিনের বাক্সটিতে তাহা ভরিয়া তাকের উপর রাখিয়াছিলাম, তাহার তল্লাস করিলাম, কিন্তু তাহা পাইলাম না। সকলে তখনই সুশীলাকে সঙ্গে করিয়া পুকুরপাড়ে গেল, সুশীলা অঙ্গুলি দ্বারা যে স্থানে বাক্স ফেলিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দিল। কর্ত্তার আদেশে ভজহরি জলে নামিয়া ডুব দিয়া গহনার বাক্স তুলিল। কর্ত্তা এই সকল কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, নবলক্ষ্মী ও সুশীলাকে তিরস্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন এবং নন্দগোপাল ও সুশীলার বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন, 'এখন বুঝ্‌লে ত কার দোষ? আর চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ হ'য়ে থেকো না! যদি মঙ্গল চাও, তবে এই সব জঘন্য ব্যবহার দূর ক'র্‌তে চেষ্টা কর। তার পর নবলক্ষ্মীর বাবা বলিলেন, 'এ আর বিচার কি হ'লো? প্রাণের ভয়ে একটা কথা স্বীকার ক'রেছে ব'লেই কি অপরাধ হ'লো?' সুশীলার বাবাও এ কথায় মত দিলেন। কর্ত্তা ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া উভয়কে তিরস্কার করিলেন। তাহারাও কর্ত্তার প্রতি যা-ইচ্ছে-তাই বলিতে লাগিলেন। বড়-দিদি, মেজ-দিদি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। পরদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া উভয়ে স্বামী ও সন্তানগণ সমভিব্যাহারে নিজ নিজ পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তোমার পিতা কাতর-স্বরে কত বারণ করিলেন, সম্মানের দোহাই দিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাকে গালাগালি দিতে দিতে ও প্রাণ থাকিতে আর তাঁহার অন্নগ্রহণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সকলে এক সময়ে চলিয়া গেলেন। সিন্দুক, পেটেরা, বাক্স, কাপড় ইত্যাদি সমস্তই লইয়া গিয়াছেন। বাবা ও মা অতঃপর প্রায় বাক্‌শূন্য হইয়াছেন; নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে

কথা কহেন না, সর্ব্বদা অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যকার এই দুর্ঘটনার আমিই মূল কারণ। আমি যদি বারাণসী শাড়ীখানা ছিন্নাবস্থায় লুকাইয়া রাখিতাম, তবে এ বিভ্রাট ঘটিত না। আমাকে ক্ষমা করিও। এ সময়ে তুমি একবার বাড়ী আসিতে পারিলে বড় ভাল হয়। লিখিতে লিখিতে আমার হাত অবশ হইয়া পড়িয়াছে, আর অধিক লিখিতে পারিলাম না, কিন্তু তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করিও না। শীঘ্র তোমাদের মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিও। ইতি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিশেষ বিবরণ

স্বর্ণকমল বাড়ী হইতে কলিকাতা যাত্রার সময় মনে করিয়াছিল যে, কলিকাতা গিয়া সে অপেক্ষাকৃত শান্তিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, তাহা হয় কৈ? স্বর্ণকমল অশান্তিপূর্ণ পিতৃভবন ছাড়িয়া আসিল বটে, কিন্তু অশান্তি তাহাকে ছাড়িল না. স্মৃতির তীক্ষ্ণ অসির প্রহারে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। জনক-জননী কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতেছেন, সুকুমারী নীরবে অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতেছে ইত্যাদি নানা কথা স্মরণ করিয়া সে মর্ম্ম-যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সে আর এখন মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিতে পারে না, মনে রাখিলে আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে। তাহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী দীনেশচন্দ্রের নিকট মনের কথা কহিয়া ভার লঘু করে। সুকুমারীর নিকট পত্র লিখিয়া ক্ষণিক শান্তি উপভোগ করে। সুকুমারীর পত্র পাইয়া স্বর্ণকমল একেবারে বিকলচিত্ত হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা সহসা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অগত্যা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্থিরনেত্রে ছাদের কড়ি ও বরগা গণিতে লাগিল। এমন সময় দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলের

নিকটস্থ হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আজ একটি শুভ সংবাদ আছে।' স্বর্ণকমল দীনেশচন্দ্রের কথা লক্ষ্য না করিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল, 'ভাই দীনেশ! আমার আর কলিকাতায় থাকা ঘটিয়া উঠিল না, এই পর্য্যন্তই বিদ্যা শেষ হইল!' অতঃপর একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় কহিল, 'আমায় দুই একদিনের মধ্যেই বাড়ী যাইতে হইতেছে।' দীনেশ-চন্দ্র গিরিবালার পত্রে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বর্ণকমলের মনস্তাপের কারণজিজ্ঞাসু হইতে হইল না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কি বাড়ীর পত্র পেয়েছ?' স্বর্ণকমল সুকুমারীর পত্রখানা দীনেশচন্দ্রের হস্তে দিল, কোন কথা কহিল না। দীনেশচন্দ্র পত্রখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, 'স্বর্ণকমল! এই দুঃখ-সময়েও সুকুমারীর চরিত্রটি ভাবিয়া আমি সুখী হইতেছি—এমন সুরমণী যদি বঙ্গে অধিক থাকিত, তবে আর বুঝি বাঙ্গালীর কোন দুঃখ থাকিত না।' স্বর্ণকমল দীনেশচন্দ্রের মুখপানে চাহিল, দীনেশ বলিতে লাগিলেন, "দেখ, উহার সাধের কাপড়খানা ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য্য করিল, গহনার বাক্সটি জলে ফেলিয়া দিল, তবুও কিন্তু সে সেদিনকার ঘটনার জন্য আপনাকে দোষী ভাবিতেছে! এমন সহৃদয়া, কোমলপ্রাণা রমণী আমি আর দেখি নাই। আর একটি কথা আছে। আমি জানি, সে কথা বলিলে তোমার বক্ষে শেল বিদ্ধ হইবে, কিন্তু এ অবস্থায় আর তাহা গোপন করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করিতেছি না। সুকুমারী যাহা লিখিয়াছে, ঘটনা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে, কিন্তু তুমি দুঃখিত হইবে ভাবিয়া সে সব কথা লেখে নাই। তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি যথাযথ বলিতেছি।"

দীনেশচন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া স্বর্ণকমলের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চিন্তাশক্তি রহিত হইল, চক্ষু দৃষ্টিশূন্য হইল, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত, নির্দ্দোষ ব্যক্তির বিচারকের আজ্ঞা-প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা জন্মে, স্বর্ণকমলের মনেও তদ্রূপ একটা অসহ্য যাতনা উপস্থিত

হইল—এক মুহূর্ত্ত পরে হয় ত' কি নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে ভাবিয়া সে ক্ষিপ্তবৎ চঞ্চল হইল; বলিল, 'কি হ'য়েছে ভাই! শীঘ্র বলিয়া ফেল।' দীনেশচন্দ্র স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "অত ব্যস্ত হইও না, স্থির হইয়া শোন। কে কাপড় ছিঁড়িয়াছে, ইহা লইয়া প্রথমতঃ বাদানুবাদ হয়। তারপর তোমার পিতা বাড়ী আসিয়া যখন একটি মোকদ্দমার দোষী অনুসন্ধান করিতে গিয়া দুটি আসামী বাহির করিলেন, তখন তোমার মা, বড়-বৌ ও মেজ-বৌকে খুব বকিতে লাগিলেন। অবশ্যই বৌরাও শাশুড়ীকে ষোড়শোপচারে বেশ পূজা করিলেন। তোমার বড়দাদা, মেজদাদা চুপ্‌টি করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন, পিতার বিচারে দোষ দেওয়া ব্যতীত কথাটি কহিলেন না। এইরূপে বিবাদ ক্রমে চাড়তে লাগিল। রায়-মহাশয়ের তিরস্কারে তোমার মা থামিলেন—বৌরা থামিলেন না, বরং আরও গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং শ্বশুর-শাশুড়ীকে অতি অশ্লীল, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিলেন। তোমার মা মনোদুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ক্রন্দন-দর্শনে সুকুমারী অতি ম্লানচিত্ত হইয়া বড়-বৌর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'বড়দিদি! মা কাঁদিতেছেন। তোমার পায়ে পড়ি, আর তাঁহাকে অমন করিয়া গালাগালি দিও না—তাঁহার ত কোন দোষ নাই!' সুকুমারীর কথা শেষ না হইতেই বড়-বৌ পা ছাড়াইবার ভাণ করিয়া সুকুমারীর বুক্ষে সজোরে লাথি মারিয়া বলিল, 'যাও, অত ভালবাসায় আর কাজ নাই। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্‌তে হবে না।' মহামায়ার পদাঘাতে সুকুমারী দালানের সিঁড়ির মধ্যে পড়িয়া গেল, মাথায় আঘাত লাগিল, দর্‌দর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।" বলিতে বলিতে দীনেশচন্দ্রের চক্ষু বোলা হইল, মুখ বিবর্ণ হইল। স্বর্ণকমল এ পর্য্যন্ত শুনিয়া পুনরপি বালিশে মাথা রাখিয়া উর্দ্ধনেত্র হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না। দীনেশচন্দ্র একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"তখন গিরিবালা নিকটে ছিল, সুকুমারীর এ অবস্থা দেখিয়া সে তোমার মা ও বাবাকে ডাকিল। তাঁহারা আসিয়া সুকুমারীর মাথায় জল দিয়া ধোয়াইলেন এবং ক্ষতস্থানে ভিজা নেকড়া বাঁধিয়া দিলেন। সুকুমারীর এ অবস্থা দেখিয়াও তোমার বড়দাদা স্ত্রীকে একটি কথা কহিলেন না দেখিয়া, তোমার পিতা আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না—তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বড় পুত্রদ্বয়কে তীব্র ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলেন। পুত্রদ্বয় কড়া জবাব দিয়া সেই রাত্রেই গৃহত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন—কালবিলম্ব না করিয়া লণ্ঠন লইয়া নৌকার অন্বেষণে বাহির হইলেন। সে রাত্রে তাহাদের কাহারও আহার হইল না। বড়-বৌ, মেজ-বৌ সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিল। নবলক্ষ্মী, সুশীলা, ননীগোপাল প্রভৃতি আহার চাহিয়া প্রচুর প্রহার পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল। রাঁধা ভাত বেন্নুন পড়িয়া রহিল। তোমার পিতা, মাতা ও সুকুমারী অনাহারে রাত্রি কাটাইলেন। শিশুদিগকে অনাহারী রাখিয়া তাঁহারা কোন্ প্রাণে আহার করিবেন? পরদিন প্রাতঃকালে তোমার পিতা ও সুকুমারীকে গালাগালি করিতে করিতে তাহারা নৌকায় উঠিল। ছেলেমেয়েগুলি যাইতে চাহিল না, তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে টানিয়া লইয়া গেল। ননীগোপাল সুকুমারীর দিকে চাহিয়া, 'কাকী-মা, কাকী-মা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আমার আবার শুভ-সংবাদ ?

স্বর্ণকমল একটি অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কবে পত্র পাইয়াছ ?'

দীনেশ। এই ত আজ ভোরের ডাকে।

স্বর্ণ। গিরি কার কাছে শুনিয়া লিখিয়াছে ?

দীনেশ। শুনে নয়, তখন সে তোমাদের বাড়ীতে ছিল।

স্বর্ণকমল একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—

"হাঁ, ঠিক, সুকুমারীর পত্রে গিরির নামোল্লেখ আছে বটে ; সুকুমারী কি খুব গুরুতর আঘাত পেয়েছে ?"

দীনেশ। না, কোন চিন্তার কারণ নাই। ঘা প্রায় শুকিয়েছে, ফুলা আর বেদনাও অনেক ক'মেছে।

স্বর্ণ। কিসে বুঝ্‌লে ?

দীনেশ। পত্রে তাহাও লিখেছে। আর সুকুমারী ভাল না হ'লে তোমার নিকট স্বহস্তে পত্র লিখ্‌তে পার্‌তো না। তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।

শেষ-কথায় স্বর্ণকমল আশ্বস্ত হইল। দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলকে একটু দুঃখের ভাবনা ভাবিবার অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সেদিন স্বর্ণকমল কলেজে গেল না। দীনেশচন্দ্র কলেজ হইতে বাসায় আসিয়াই স্বর্ণকমলের নিকট গেলেন, উভয়ে একসঙ্গে একটু জলযোগ করিলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর উভয়ে একসঙ্গে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে চলিলেন। প্রথমতঃ স্বর্ণকমল একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু দীনেশচন্দ্রের অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। চলিতে চলিতে যুবকদ্বয় গোলদীঘির উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন তথায় বালক ও

যুবকগণ দলে দলে বেড়াইতেছে, হো হো করিয়া হাসিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ বসিয়া গল্প করিতেছে, একদল বালক কপাটী খেলিতেছে। যুবকদ্বয়ের তখন সেই হাসাহাসি, ছুটাছুটি, কোলাহল ভাল লাগিল না। তখন তাঁহারা উদ্যানের উত্তরাংশ পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত জনশূন্য দক্ষিণাংশের একখানা প্রস্তরাসনের উপর গিয়া বসিলেন। অন্য দুই এক কথার পর, দীনেশচন্দ্র ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে কি বাড়ী যাওয়াই স্থির ক'রলে?'

স্বর্ণ। হাঁ—বাড়ী যাওয়া, আর পাঠত্যাগ। এ সময়ে আমি পিতা-মাতার সম্মুখে না থাক্‌লে তাঁহাদের দুঃখের অবধি থাকবে না। পিতা-মাতার দুঃখ যদি দূর ক'রতে না পারলুম, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটা পরীক্ষা পাস্ ক'রলেই বা কি মহত্ত্ব বাড়বে বল!

দীনেশচন্দ্র জানিতেন, স্বর্ণকমল চিন্তা না করিয়া কোন কথা কহে না, তাহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করাও সহজসাধ্য নহে। সুতরাং পাঠত্যাগ সম্বন্ধে আপাততঃ কোন কথা না বলিয়া বলিলেন, 'সে কথা পরে হবে, বাড়ী কি কা'লই যাবে?'

স্বর্ণ। কা'লই যাব, আর বিলম্ব ক'রতে পারি না। আজ দুপুর-বেলা বাবার এক পত্র পেয়েছি। তিনি অতি শীঘ্র বাড়ী যেতে ব'লেছেন। তাঁহারা হয় ত' এখন কত কষ্ট পা'চ্ছেন!

দীনেশ। কষ্ট ত' হ'বারই কথা। তোমারও সকল আশা আজ ফুরাল। এতদিন মনে ক'রেছিলে যে, তিন ভ্রাতা একসঙ্গে থেকে কত সুখী হ'তে পা'রবে, একান্নভুক্ত হিন্দু-পরিবার যে কিরূপে সুখের নিকেতন হ'তে পারে, তার আদর্শ প্রদর্শন ক'রবে। এতদিন কেবল শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রেছিলে।

স্বর্ণ। দাদারা যে এরূপ হ'বেন, তা' আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

দীনেশ। সমস্ত পৃথিবীর লোককে তোমার মত সরল-প্রকৃতি উদার-

চেতা ভেবো না, ভাবলে প্রতারিত, বিপদ্‌গ্রস্ত হ'বে। আর, একান্নভুক্ত-পরিবারে বাসের আশা ত্যাগ কর, নতুবা প্রতিদিন এইরূপ ঘটনাই ঘট্‌বে। তোমার দাদাদের পৃথগন্ন হ'বার একান্ত অভিলাষ; সে সাধ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, তা'রা এইরূপই ক'র্‌বে।

স্বর্ণ। পিতামাতা বর্ত্তমানে তা' অসম্ভব। এরূপ কথা শুন্‌লে তাঁ'রা দুঃখে অভিভূত হ'বেন।

দীনেশ। কিন্তু কি ক'রবে, আর যে উপায় নাই, প্রতিদিন এইরূপ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে, পৃথগন্ন হ'য়ে শান্তি পেলে, আমি তাই শ্রেয়ঃ মনে করি। কারণ, এ রোগের যে আর অন্য ঔষধি নাই! তুমি বাড়ী গিয়ে পিতামাতাকে বুঝিয়ে বল, দাদাদের খবর পাঠাও, পৃথগন্ন হ'য়ে পিতা, মাতা ও সুকুমারীকে ল'য়ে কলিকাতায় এসে বাস কর।

স্বর্ণকমল ধীরে ধীরে বলিল, 'বাবা, মা ভদ্রাসন পরিত্যাগ ক'রে আস্‌তে চাইবেন না।'

দী। পরিত্যাগ নহে—অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাক্‌বেন মাত্র; পূজার সময় দু-এক মাস বাড়ী গিয়া থেকে আস্‌বেন। কালী ও গঙ্গার নিকট থাক্‌তে তাঁরা সম্ভবতঃ আপত্তি ক'র্‌বেন না।

স্বর্ণ। দাদারা হয় ত আর এ বাড়ীতে আস্‌বেন না—যাবার সময় প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছেন।

দীনেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'এ প্রতিজ্ঞার জন্য চিন্তা ক'রো না। এমন শুভ সংবাদ পেলে তাঁরা ছুটে আস্‌বেন।'

স্বর্ণকমল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। দীনেশচন্দ্রের উপদেশ এখন তাহার অন্যায় বোধ হইল না। ভাবিল—এই পন্থা অবলম্বন করিলে যদি শান্তি স্থাপিত হয়, তবে মন্দ কি? ভবিষ্যৎ শান্তির আশায় স্বর্ণকমলের হৃদয় অনেক আশ্বস্ত হইল।

দীনেশচন্দ্র কহিলেন, 'আর দুশ্চিন্তা ক'রে মনঃকষ্ট ভোগ ক'রো না—

আমি যা ব'ল্লাম, তাই উৎকৃষ্ট উপায়। বাড়ী গিয়ে সেরূপ কাজ কর।'

স্বর্ণকমল কোন কথা কহিল না। দীনেশচন্দ্র অবসর বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন,—'আর একটি সু-সংবাদ আছে, সে সংবাদ সুকুমারী তোমাকে দেখে নাই?'

স্বর্ণকমল কহিল, 'আমার আবার শুভ-সংবাদ!'

দীনেশচন্দ্র কহিলেন, 'হাঁ, সু-সংবাদ বটে—সুকুমারী গর্ভবতী। তোমার পিতা-মাতার এতে আনন্দের সীমা থাক্‌বে না। এই দুঃখের সময়ও এতে তাঁদের মন অনেক শান্তিপূর্ণ থাক্‌বে।'

পিতা-মাতার আনন্দ হইবে ভাবিয়া স্বর্ণকমলও মনে মনে প্রফুল্ল হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

লজ্জাবনতমুখী সুন্দরী

পরদিন স্বর্ণকমল বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া জানিল, পিতাঠাকুর চারি পাঁচ দিন ধরিয়া জ্বররোগাক্রান্ত হইয়াছেন। জ্বরের বিরাম নাই। এ বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বর্ণকমল ব্যস্ত হইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত জলবিন্দুও গ্রহণ করে নাই। স্বর্ণকমলের মলিন, শুষ্ক মুখ দেখিয়া জননী তাহা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আজ খাওয়া হয় নাই বুঝি?'

জননীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সে বলিল,—'আমার তত ক্ষুধা পায় নাই।'

জননীর প্রাণে এ কথায় প্রবোধ হইল না—তিনি পুত্রের আহারের দ্রুত-বন্দোবস্তের জন্য ব্যস্ত হইলেন। স্বর্ণকমল আর কালবিলম্ব না করিয়া

পিতৃকক্ষের দিকে গেলেন, শয্যাপার্শ্বে কবিরাজ রামধন গুপ্ত বসিয়া আছেন। স্বর্ণকমল গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, কবিরাজ হস্তসঙ্কেত দ্বারা তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বাহিরে গিয়া স্বর্ণকমলের পদধূলি গ্রহণ করত ফুস্-ফুস্ করিয়া বলিলেন, 'আজ তিন দিনের মধ্যে একটুও নিদ্রা হয় নাই —কত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, কোন ফল হয় নাই ; এখন বেশ সুনিদ্রা হ'য়েছে, আপনি না জাগ্‌লে জাগান উচিত নয়। আপনি কাল প্রভাতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন।'

স্বর্ণ। এখন কিরূপ অবস্থা ?

কবিরাজ। জ্বরের বিরাম নাই। কিন্তু যখন সুনিদ্রা হ'য়েছে, তখন আর চিন্তার কথা নাই।

কবিরাজ সে রাত্রে রোগীর গৃহে অধিক লোক থাকিতে বারণ করিলেন। সুতরাং স্বর্ণকমল-জননী ও মঙ্গলা দাসী ব্যতীত তথায় আর কেহ রহিল না। স্বর্ণকমল আহার করিয়া শয়নকক্ষে গেল। অবিলম্বে সুকুমারীও আসিল। দুই চারিটি কথার পরেই স্বর্ণকমল সুকুমারীর মস্তকের আহত স্থানটা দেখিতে চাহিল। সুকুমারী সহসা এরূপ কথায় একটু অপ্রতিভ হইল ; কারণ, তাহার স্বামী কিরূপে এ কথা জানিতে পারিলেন, ইহা তাহার ভাবনার বিষয় হইল। অগত্যা সুকুমারীকে স্বামীর সঙ্গে ক্ষীণ দীপালোকের নিকট যাইতে হইল। স্বর্ণকমল আলোটা একটু বাড়াইয়া দিয়া সুকুমারীর অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃত কুঞ্চিত-কেশরাশি-শোভিত মস্তক অনাবৃত করিল ; সুকুমারী নিজ হস্ত দিয়া ক্ষত-স্থান দেখাইল। স্বর্ণকমল উহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। ক্ষতটি নিতান্ত সামান্য না হইলেও তখন প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে। স্বর্ণকমল জিজ্ঞাসা করিল, 'পত্রে তুমি এ কথা লিখ নাই কেন ?'

সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিল, 'তখন ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল, বেদনাও কমেছিল, তাই আর লিখ্‌লাম না।'

স্বর্ণকমল একটু বিরক্তির স'হিত বলিল,—'তা লিখ্লে আর কি দোষ হ'ত ?'

সুকুমারী দুঃখিতচিত্তে বলিল,—'আর আমি মনে ক'র্লাম, পত্রে এ কথা লিখ্লে তুমি হয় ত একে গুরুতর আঘাত মনে করে ব্যস্ত হ'বে।'

স্বর্ণ। তুমি একে কি ক্ষুদ্র ঘা মনে ক'রেছ ?

সুকুমারী নিরুত্তরা হইল।

স্বর্ণ। যাক্ সে কথা—ঔষধ দেয় কে ?

সুকু। ক'ব্‌রেজ মহাশয় একটা মলম দিয়েছিলেন, তাতেই ঘা প্রায় শুকিয়েছে—জ্বরও আর হয় না।

সুকুমারী অন্য কথা উত্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে ?'

স্বর্ণ। না—ক'ব্‌রেজ মশায় বারণ ক'র্‌লেন।

সুকু। তুমি বাড়ী এসে বড় ভাল ক'রেছ। এই তিন দিনের মধ্যে তাঁর এক মুহূর্ত্তও ঘুম হয় না। একটু তন্দ্রা হ'লেই তোমার নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে জেগে উঠেছেন।

স্বর্ণ। অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া আমার বড় ভয় হ'চ্ছে।

বলিতে বলিতে স্বর্ণকমলের মুখশ্রী গম্ভীর হইল। সুকুমারী এতদিন ইহা সামান্য জ্বর মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। স্বামীর কথা শুনিয়া একটু ভীতা হইয়া বলিল,—'এ কি কথা বল! ব্যারাম কি কঠিন ?'

স্বর্ণকমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—'ক'ব্‌রেজ মশায় ব'ল্‌লেন, শীঘ্র সেরে যাবে।'

সুকুমারী ইহাতে সম্পূর্ণরূপ আশ্বস্ত না হইয়া বলিল,—'ভগবান্ করুন, তাই যেন হয়—তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল!'

স্বর্ণকমল অধিক কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'দাদাদের কোন সংবাদ পেয়েছ কি ?'

সুকু। হাঁ; তাঁরা সম্প্রতি নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীতে আছেন, বাড়ী-ঘর সব শূন্য প'ড়ে র'য়েছে; কা'ল দিনের বেলায় দেখ্‌তে পাবে। ছেলে-পুলে না থাকায় বাড়ীটা যেন একেবারে শূন্য শূন্য বোধ হ'চ্ছে। কিছুই ভাল লাগে না।

স্বর্ণ। তুমি একটি বড় অন্যায় কাজ ক'রেছ।

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল; স্বর্ণকমল ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'আমাকে একটি শুভ-সংবাদ দাও নাই কেন? এ তোমার ভারি অন্যায়!'

সুকুমারী বুঝিল যে, গিরিবালার পত্রে দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমল তাহার গর্ভসঞ্চার-সংবাদ অবগত হইয়াছে। লজ্জায় সুকুমারী কথা কহিতে বা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না—স্থিরনয়নে আপনার পদাঙ্গুলি গুলি দেখিতে লাগিল; শরীর হইতে ঘর্ম বাহির হইতে লাগিল। স্বর্ণ-কমল লজ্জাবনতমুখী স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, সুকুমারী সত্যই বড় সুন্দরী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-শয্যায়

সে রাত্রে স্বর্ণকমলের সুনিদ্রা হইল না। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, হস্তমুখ প্রক্ষালন ও প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া সে রুগ্নশয্যায় শায়িত পিতার নিকট গেল। রুগ্ন-পিতা, পিতৃবৎসল পুত্রকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন—তাঁহার প্রফুল্লতা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইল। 'তুমি এসেছ, বেশ ক'রেছ; নৈলে আমার বড় কষ্ট হ'ত' বলিয়াই তিনি থামিলেন। স্বর্ণকমল ভক্তিপূর্ণনেত্রে পিতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল; দেখিল,

বৃদ্ধের শরীরের রং বিবর্ণ হইয়াছে, চক্ষু কোটরাগত হইয়াছে, শরীর রুক্ষ ও শীর্ণ হইয়াছে। পুত্র পিতাকে বলিল,—'কাল সারারাত্রি বোধ হয় আপনার সুনিদ্রা হয় নাই—আপনার চোখ লাল হ'য়েছে—চেহারাও অত্যন্ত খারাপ দেখাচ্ছে।'

পিতা। এ জন্মে আর সুনিদ্রা হবে না।

অবস্থা দেখিয়া ও পিতৃবাক্য শুনিয়া স্বর্ণকমলের বড় ভয় হইল। তাহার উপস্থিত বুদ্ধি লোপ হইয়া আসিল। রামধন গুপ্ত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ঔষধ-প্রয়োগফলে জ্বর একটু কমিল বটে, কিন্তু অনিদ্রা দূর হইল না। কবিরাজ স্বর্ণকমলকে গোপনে বলিলেন,—'রোগীর মন সর্ব্বদা দুশ্চিন্তায় পূর্ণ—সুনিদ্রা হ'বে কিরূপে? আর চিন্তা-রোগেরই বা কি ঔষধ দিব? সুনিদ্রা হ'লেও জ্বরের বিরাম হ'বে না। এক কাজ করুন, হরি-সাধন কবিরেজকে ডেকে পাঠান; দু'জনে পরামর্শ ক'রে চিকিৎসা ক'রব।'

গ্রামান্তরে হরিসাধন কবিরাজের বাস। তাঁহাকে ডাকা হইল। চিকিৎসাও চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। রামকমল ও কৃষ্ণকমল পিতার ব্যারামের সংবাদ অবগত হইয়াও একবার পিতাকে দেখিতে আসিল না। অতঃপর তাহাদিগকে আনিবার জন্য ভৃত্য ভজহরি স্বর্ণকমলের হস্তলিখিত পত্র লইয়া গেল। রামকমল পত্র পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিল, কৃষ্ণকমল তাহার নামীয় পত্রখানা হাতেও লইল না। বলিল, 'এ পত্র লইয়া কি স্বর্গে যাব?—আর মিষ্ট কথায় কাজ নেই।'

ভৃত্য ভজহরি স্বর্ণকমল-প্রদত্ত উপদেশানুসারে বিহিত অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিল,—'কর্ত্তা অত্যন্ত পীড়িত, জ্বরের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই—তাঁহার জীবন-সংশয়। পুনঃপুনঃ আপনাদিগকে দেখতে চাইছেন, একবার গেলে বড় ভাল হ'ত।'

তাহার কাতরোক্তিতেও ভ্রাতৃদ্বয়ের কঠিন প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল না। বরং তাহারা এজন্য ভজহরিকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল। কৃষ্ণকমল

অতি কর্কশ-ভাষায় কহিল,—'যাকে দেখ্‌লে চোখ জুড়ায়, সে ত' এসেছে, আমরা গিয়ে কি ক'র্‌ব ?'

রায়-মহাশয়ের কঠিন পীড়া শুনিয়া রামকমলের গঙ্গাতীরে যাইতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল—কারণ, সে ভাবিল যে, এ রোগে সত্য সত্যই পিতার মৃত্যু ঘটিলে সে সময়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত না থাকিলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখন গঙ্গাতীরে গেলে নিজের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে মহামায়া কাপুরুষ ভাবিবে, এজন্য তাহার যাওয়া হইল না।

স্বর্ণকমল দীনেশচন্দ্রকে পত্র লিখিল। পত্র পাইয়া পরদুঃখকাতর দীনেশবাবু কালবিলম্ব না করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

একদিন অপরাহ্ণে জ্বর বড় বৃদ্ধি হইল। রায়-মহাশয় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। শয্যার এক পার্শ্বে স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র, অপর পার্শ্বে চিকিৎসকদ্বয়; গিন্নী কৃপাময়ী ও পরিচারিকা মঙ্গলা, একটু দূরে স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্টা। সকলেই ব্যাকুলচিত্ত; রোগীর রোগযন্ত্রণা-জনিত বিকৃত মুখ দেখিয়া সকলের মুখ ক্রমে মলিন ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। স্বর্ণকমল বাষ্পপূর্ণ-লোচনে একখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রায়-মহাশয় বলিলেন,—'পাখার বাতাসে এ আগুন নিব্‌বে না—প্রাণের ভিতর যে দাবানল জ্ব'ল্‌ছে!'

স্বর্ণকমল কোন কথা বলিতে পারিল না, সকলের অলক্ষিতে সে বাম-হস্ত দ্বারা অশ্রু মুছিল, দীনেশচন্দ্র ম্লানমুখে অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, 'কি ক'র্‌লে আপনার কষ্ট দূর হ'তে পারে?'

রায়-মহাশয় শুষ্কমুখে বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'এ কষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গেই দূর হ'বে।'

রায়-মহাশয়ের মুখ বিকৃত হইল; তিনি একমনে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপর স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভগ্ন-স্বরে,

ধীরে ধীরে বলিলেন,—'আমার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'চ্ছে, তা' আমি বেশ অনুভব ক'র্‌ছি। আমার জীবনের আশা নাই—এখন আর বাঁচ্‌তেও সাধ নাই। রামকমল, কৃষ্ণকমলের পুত্রকন্যাগুলিকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে। ভজহরির কথায় তা'রা এল না। অতএব স্বর্ণকমল! তুমি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ।'

রায়-মহাশয়ের কথা শুনিয়া সকলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল! স্বর্ণকমল মনের বেগ সংবরণ করিয়া, পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য, ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্বশুরালয়াভিমুখে চলিল। এদিকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় রামকমল গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। মানের খাতিরে ভজহরিকে ফিরাইয়া দিবার পর হইতে সেই ব্যস্ততা আরও বাড়িয়াছিল, সুতরাং এবার রামকমল কোন আপত্তি না করিয়া সপরিবারে স্বর্ণকমলের সঙ্গে চলিল। দাদা যাইতেছেন শুনিয়া, পরবুদ্ধিচালিত কৃষ্ণকমলও আপত্তি করিল না। যথাসময়ে ভ্রাতৃদ্বয় সপরিবারে পিতৃ গৃহে পৌঁছিল। ইহাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রায়-মহাশয়ের মলিন-মুখ আর একবার প্রীতি-প্রফুল্ল হইল। পুত্রদ্বয় রুগ্নশয্যায় শায়িত পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিল। বৃদ্ধের শারীরিক অবস্থার ভীষণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহারা মনে মনে পিতার মৃত্যু স্থির করিল। কিন্তু তজ্জন্য বিমর্ষ হইল না, বরং পৃথগন্ন হইবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে ভবিষ্যৎ সুখের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। বড়-বৌ ও মেজ-বৌ অন্তরাল হইতে মুমূর্ষু শ্বশুরের প্রতি একবার একটু দৃষ্টিপাত করিয়া, আপন আপন দ্রব্য-সামগ্রী, তৈজস-পত্র ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন ও শয্যাবিন্যাস-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল, ননীগোপাল, সুশীলা ও সরলা ঠাকুর-দাদার শয্যা বেষ্টন করিয়া বসিল। রায়-মহাশয় অনিমেষ-লোচনে উহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। অন্যের অলক্ষিতে চক্ষু মুছিয়া বামহস্ত বিস্তার করিয়া চক্ষু দুটি ঢাকিয়া

রাখিলেন। স্নেহরসে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল। আবার তাঁহার কিছু-কাল বাঁচিয়া থাকিতে সাধ হইল।

এইরূপে কিছুকাল গেল, রায়-মহাশয় পুনরায় বালক-বালিকাদিগের প্রতি একবার চাহিলেন। উহাদের সরলতা-মাখা মুখগুলি দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব-কথা সব ভুলিয়া গেলেন। আপনার বামহস্ত দ্বারা নন্দগোপালের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া স্নেহমাখা-বচনে কহিলেন,—'নন্দা! তোরা আমায় একলা ফেলে কোথায় চ'লে গিয়েছিলি রে?'

কুশিক্ষাপ্রাপ্ত নন্দগোপাল প্রত্যুত্তরে কহিল, 'আমরা কি আর সাধ ক'রে গিয়েছিলুম? ছোট-কাকীমার মিথ্যাকথা শুনে তুমি আমাদের তাড়িয়ে দিলে!'

রায়-মহাশয় মুখ বিকৃত করিলেন। সেই মুখ বিকৃতিতে বুঝা গেল যে, নন্দগোপালের কথা তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইয়াছে। আবার তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল, আবার তিনি বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রাখিলেন। স্বীয় পরিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আবার তিনি ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে অর্দ্ধদণ্ড কাটিয়া গেল। পরে মুখের আবরণ ফেলিয়া দিয়া ঘন ঘন দুই তিনটি অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়াবেগ কিয়ৎপরিমাণে সংবৃত হইল। 'ভগবানের ইচ্ছা' ভাবিয়া পুনরায় স্থৈর্য্যলাভ করিলেন। নবলক্ষ্মীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, 'নবলক্ষ্মি! তোরা কেউ আমায় ভালবাসিস্ না?'

নবলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কহিল, 'আপনিও আমাদের ভালবাসেন না, ঠাকুর-মাও ভালবাসে না।'

রায় মহাশয় বালিকার নিকট এরূপ উত্তর আশা করেন নাই। ভাই-ভগিনীর কথা শুনিয়া তিনি বিরক্তি-সহকারে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। উহাদের কথাগুলি তাহার কাণে বাজিতে লাগিল। বুঝিলেন, পিতৃ-মাতৃদত্ত কুশিক্ষার বীজ উহাদের হৃদয়ে বিলক্ষণ অঙ্কুরিত হইয়াছে। বুঝিলেন,

ইহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আর অধিক কথা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কিছুকাল পরে বালক-বালিকাগণ বাহিরে যাইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ননীগোপাল ছোট-কাকীমাকে পাইয়া হাসিয়া গিয়া তাহার কোল জুড়িয়া বসিল। ইহা দেখিয়া বড়-বৌ মহামায়ার চক্ষু টাটাইতে লাগিল, শিশু ননীগোপালের উপর তাহার বড় রাগ হইল এবং প্রথম অবসরেই উহাকে প্রচুর প্রহার করিয়া প্রতিশোধ লইবে, স্থির করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রায়-মহাশয়ের শেষ-কথা

সেই রজনীতে রায়-মহাশয়ের একটু সুনিদ্রা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার বদন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল দেখা গেল। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্রের আনন্দ হইল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আবার জ্বর হইল, চিকিৎসকদ্বয় ব্যস্ত হইলেন। যথারীতি ঔষধ-প্রয়োগ চলিতে লাগিল। সূর্য্য অস্ত যায়। রায়-মহাশয়কে দেখিবার জন্য গ্রাম্য-ভদ্রলোকগণ প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। সকলেই মুখে মুখে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাঁহার আরোগ্য-কামনা করিতেছেন। রায়-মহাশয় সকলের প্রতি যথোচিত সম্মানের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহাদের নিকট ইহকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। সকলকেই কাতর-কণ্ঠে বলিতেছেন, 'তোমাদের কাহারও নিকট কখন কোনরূপ অপরাধ ক'রে থাকলে, আমার এ সময়ে তোমরা সকলে আমাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা কর। হয় ত' আমার আর তোমাদের সহিত আলাপ ক'রবার অবসর ঘ'টবে না।'

এইরূপে অপরাহ্ন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে চলিল। রায়-মহাশয়ের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, ইহা প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিল। যাহারা নিজে কিছু বুঝিতে পারে না, তাহারাও পরের দেখাদেখি কাণাকাণি করিতে লাগিল, 'এবার আর অব্যাহতি নাই।' গ্রামের ধীমান্ ব্যক্তিগণ রায়-মহাশয়ের আশু মৃত্যু উপস্থিত বুঝিয়া মনে মনে বড় ব্যথিত হইলেন। কারণ, তাঁহার ন্যায় সদাশয় ও অমায়িক প্রকৃতির লোক গ্রামে আর ছিল না। যাহারা রায়-মহাশয়ের নিকট কোন দিন উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ তাহাদের কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জলও বাহির হইল। হিংসুকের দল, পরশ্রীকাতরের দল, অদূরদর্শীর দল মনে মনে হাসিতে লাগিল, আর পেটুকের দল 'সম্পন্ন ব্যক্তির শ্রাদ্ধে অবশ্যই লুচি-সন্দেশ হইবে' ভাবিয়া একটু উৎফুল্ল হইল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। রুগ্নশয্যার অনতিদূরে একটি মৃণ্ময় প্রদীপ মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। কবিরাজদ্বয় একের পর অন্যে নাড়ী টিপিয়া মুখবিকৃতি করিলেন। রায়-মহাশয় শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, 'আর নাড়ী দে'খে কি হবে?'

হরিসাধন কবিরাজ রায়-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—'চিন্তা ক'র্বেন না, এখনও চিন্তার বিষয় কিছু হয় নাই, ভগবানের নাম স্মরণ করুন।'

রায়-মহাশয় আপনার শরীরের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—'বেশ কথা, আমাকে ভগবানের নাম স্মরণ করাও, আর বৃথা ঔষধ প্রয়োগ ক'রো না।'

এই বলিয়া ঔষধ-সেবন ত্যাগ করিলেন। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র ব্যস্ত হইলেন এবং ঔষধ সেবন করাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত্তরে রায়-মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,

'আমার প্রতি তোমাদের অটল ভক্তি ও ভালবাসা আছে বলিয়া, তোমরা আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও বুঝতে পারছ না! অার ঔষধ সেবন করিয়া কি হইবে? তোমরা দীর্ঘায়ু হও, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।'

তাঁহার কথা শুনিয়া গিন্নী কৃপাময়ী অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। সুকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে শান্ত করিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর চিকিৎসকদ্বয় স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্রকে অন্তরালে ডাকিয়া নিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আজ নাড়ীর অবস্থা বড় ভাল নহে—একটু সাবধান থাক্‌তে হবে। বৃথা ভেবে কি ক'র্‌বেন? সকলই ভগবানের হাত।'

পিতৃভক্তিপরায়ণ স্বর্ণকমলের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, দৃষ্টিশক্তি লোপ হইয়া আসিল, নয়নকোণে অলক্ষিতে অশ্রু বাহির হইল। স্বর্ণকমলের ব্যাকুলতা দেখিয়া দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'ছি! তুমি পাগল হ'য়েছ? তুমি এরূপ অস্থির হ'লে তোমার পিতা কেঁদে আকুল হবেন। স্থির হও—চল বিছানায় বসি গিয়ে।'

স্বর্ণকমল দীনেশ বাবুর কথানুরূপ কার্য্য করিল। রায়-মহাশয় স্বর্ণকমলের মলিন মুখ দেখিয়া গম্ভীর ও ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'মন স্থির কর, ব্যাকুলতা ত্যাগ কর। দীনেশ বাবু তোমার প্রকৃত সুহৃদ্। তাঁহাকে দেখে আমার আনন্দ হ'চ্ছে। ইঁহার অনভিমতে এ জীবনে কোন কার্য্য ক'রো না—আর অধিক কি ব'ল্‌ব। এস—তোমরা আমার কাছে এস।'

স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্রের চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণলোচনে রায়-মহাশয়ের দুই পার্শ্বে দুই জন যাইয়া বসিলেন। অদূরে কাষ্ঠাসনে গিন্নী কৃপাময়ী ও সুকুমারী বসিয়া হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। রায়-মহাশয় দীনেশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দীনেশচন্দ্র! তুমি কত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এখানে

আসিয়াছ। তোমাকে এ সময়ে আমি আশীর্ব্বাদ ব্যতীত কিছু ক'রতে পারছি না। তুমি দীর্ঘায়ু হও, ভগবান্ তোমার সকল প্রকার মঙ্গল করুন।'

রায়-মহাশয় অতি কষ্টে দীনেশচন্দ্রের গায় আপনার হাত বুলাইয়া দিলেন। এবার দীনেশচন্দ্র সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের মঙ্গল হইবে। আপনি আমার পিতৃ-স্থানীয়, স্বর্ণকমল আমার সহোদর ভ্রাতা।'

আর কথা সরিল না। স্বর্ণকমল, কৃপাময়ী, সুকুমারী, পরিচারিকা মঙ্গলা, সকলেই বস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা নিজ নিজ চক্ষু মুছিতে লাগিল। রায়-মহাশয় ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন, 'ছি। তোমরা কাঁদ্‌ছ?—তোমরা এরূপ ক'রলে আমি অস্থির হব। সকলে স্থির হও। দীনেশ! বাছাধন! তোমার কথায় আজ আমার প্রাণ শীতল হ'ল; এমন মধুর কথা অনেক দিন শুনি নাই। আমার অনেক কষ্ট আজ দূর হ'ল।'

তার পর স্বর্ণকমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'স্বর্ণকমল! দীনেশচন্দ্রকে চিরকাল সহোদর জ্ঞানে কার্য্য ক'রবে। আমার ভাবনা ছিল, ভ্রাতৃ-সুখ তোমার অদৃষ্টে ঘট্‌বে না—আজ সে চিন্তা দূর হ'ল;—বড় সুখী হ'লাম। আমার এ সংসারের ভার তোমার উপর, তা যেন মনে থাকে—ঠাকুরসেবা, মাতৃ-সেবা, পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ—'

বলিতে বলিতে ক্লান্তি-বোধ হইল। একটু থামিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ছোট বো-মা কোথা?—ঐখানে বুঝি?—এস মা লক্ষ্মী! লজ্জা কি মা? আমার কাছে আস্‌তে লজ্জা কি?'

গিন্নী কৃপাময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে বলিলেন। অগত্যা সুকুমারী শয্যাপার্শ্বে গেল। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র শয্যাত্যাগ করিয়া একটু দূরে গিয়া বসিলেন। সুকুমারী শয্যাপার্শ্বে বসিল। মুমূর্ষু বৃদ্ধ বলিলেন, "মা! তুমি আমার লক্ষ্মী। তুমি যত দিন আছ, এ সংসারে লক্ষ্মী আছেন। সোণার সংসার হউক, সুপুত্রবতী হও, চিরসুখী হও, কিন্তু মা! একটি কথা।

তীর্থস্থান ভিন্ন আমার এ বাড়ী ত্যাগ ক'রে তুমি কোথাও যেও না। সুখে হউক, দুঃখে হউক, এখানেই থাক্‌বে। পিত্রালয়ে গিয়াও কোন বারেই একসঙ্গে অধিক দিন থাক্‌বে না! বল—প্রতিজ্ঞা কর—'যাব না'।"

সুকুমারী শ্বশুরের পাদস্পর্শ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে বলিল, 'যাব না।'

'ঘাড় নাড়িয়া কেন মা? বল, মুখ ফুটিয়া বল—যাবে না! আমার সঙ্গে কথা বলিতে লজ্জা কি?'

লজ্জাশীলা সুকুমারী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'যাব না।'

রায়-মহাশয় অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-ভগ্নস্বরে বলিলেন, 'বেঁচে থাক মা! চিরকাল এয়ো হ'য়ে থাক।'

রায়-মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইল।

সুকুমারী পূর্ব্বস্থানে চলিয়া গেল।

এ পর্য্যন্ত রামকমল, কৃষ্ণকমল কিংবা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ রায়-মহাশয়কে দেখিতে আসে নাই! পাড়ার কত লোক আসিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু উহারা বাড়ীর ভিতর থাকিয়া একটিবার উঁকি মারিয়া দেখিল না। বালক-বালিকাগুলি দুই একবার ঠাকুরদাদার নিকট আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বড়বৌ তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া বলিল, 'সেধে যেয়ে কাজ নাই। চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাক্‌, ডাকে ত যাস্‌।'

রায়-মহাশয় জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয় ও তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে দেখিবার জন্য ক্রমেই ব্যগ্র হইতেছিলেন, কিন্তু তাহারা এ পর্য্যন্ত আসিল না দেখিয়া মনের দুঃখে বলিলেন, 'তারা কি এখনও একবার আমায় দেখ্‌তে আস্‌বে না?

বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে জল-প্রবাহ বহিল। এ সংবাদ শুনিয়া রামকমল, কৃষ্ণকমল, নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল, ননীগোপাল, সুশীলা এবং মহামায়া ও মুক্তকেশী গিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিল। রায়-মহাশয় চক্ষু মুছিয়া পুত্রদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

আমার শেষ-সময় উপস্থিত—বোধ হয় আর অধিক সময় বাঁচ্‌ব না। এ সময়ে তোমাদিগকে কয়েকটি কথা ব'লে যাই, স্থির হ'য়ে শোন—সকলে সদ্ভাবে থেকো। নীচ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য ক'রে বৃথা আত্মকলহে মগ্ন হ'য়ো না; কেহ কাহাকেও প্রতারণা ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রো না—তা করলে সর্ব্বদর্শী ভগবান্ অসন্তুষ্ট হবেন। এই পৃথিবীতে কেউ চিরকাল থাক্‌বে না। জন্ম-মৃত্যু একসূত্রে গাঁথা—জন্মের সহিত মৃত্যুর নিত্য সম্বন্ধ। সংসার মানুষের পরীক্ষার স্থান। এই পরীক্ষার ফল দেখ্‌বার জন্যই ভগবান্ আমাদিগকে সংসারে পাঠিয়েছেন। আমার পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে, আমি আজ চ'ল্‌লাম।'

বলিতে বলিতে তাঁহার বিশাল চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। রুগ্ন বৃদ্ধ হৃদয়াবেগ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আমি আজ চ'ল্‌লাম,—এইরূপ সকলকেই একদিন ভগবানের নিকট যেতে হবে। মানুষ এ কথাটা বড় সহজে ভুলে যায়। নতুবা কেউ কারু অনিষ্ট-চিন্তা ক'র্‌ত না, নতুবা পাপ-কার্য্যে কারও মতি হ'ত না। ক'দিনের জন্যই বা সংসার!—আমার শরীর বড় দুর্ব্বল, অধিক কথা ব'ল্‌তে কষ্ট হয়। স্বর্ণকমল তোমাদের কনিষ্ঠ, তার প্রতি স্নেহের সহিত ব্যবহার ক'রো। কখনও পরের অনিষ্ট-চিন্তা ক'রো না—তাতে নিজের ক্ষতি হয়। পরের উপকার ক'র্‌তে পার ভাল, কাহারও অপকার ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র না। বৌ-মারাও আমার এ কথাগুলি মন দিয়া শুনো। আর একটি কথা—পুত্র-কন্যাগুলিকে কুশিক্ষা দিও না, এরূপ করলে উহাদের পরকাল মাটী হবে। পিতামাতার দোষে বালক-বালিকারা মিথ্যাবাদী হয়, চোর হয়, আদুরে হয়, অহঙ্কারী হয়, হিংসুক হয়। বাল্যকালে পিতা-মাতার যেরূপ স্বভাব ও আচার-ব্যবহার দেখে, শিশুগুলি তাই শিক্ষা করে, পিতা-মাতা যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখায়, শিশু-গণ তাই অনুকরণ করে। দালানটা অসম্পূর্ণ রইল—সিন্দুকে টাকা আছে, আগে সে কাজ ক'রো। মায়ের প্রতি কেহ অসদ্ব্যবহার বা অত্যাচার

ক'রো না। তা ক'র্‌লে ভগবান্ কখনই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক্‌বেন না। আমি আর অধিক কি ব'ল্‌ব। তোমরা সকলে বেঁচে থাক—আমার দৃষ্টি কমে আস্‌ছে!—নবলক্ষ্মি, নন্দগোপাল, সুশীলা, তোরা কৈ সব? আয় আমার কাছে আয়।

উহারা সকলে নিকটে গেল, মুমূর্ষু বৃদ্ধ তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, 'ঝগড়া করিস্ না', হিংসা করিস্ না, মিছে কথা বলিস্ না, আর চুরি করিস্ না। ভগবান্ তোদের মঙ্গল ক'র্‌বেন—বেঁচে থাক্।'

বলিতে বলিতে রুগ্নের স্বরভঙ্গ হইল, চক্ষু উর্দ্ধে উঠিল। বৃদ্ধ বহুকষ্টে কোমর হইতে চাবি খুলিয়া রাখিলেন; রামকমল তাহা তুলিয়া লইল।

রজনী দ্বিপ্রহর, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। রায়-মহাশয় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন; প্রতি-মুহূর্ত্তে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণা বাড়িয়া উঠিল, চৈতন্য প্রায় লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। স্বর্ণকমল, দীনেশচন্দ্র, কৃপাময়ী, সুকুমারী, মঙ্গলা, ভজহরি অবস্থা বুঝিয়া কাঁদিতে লাগিল, রামকমল ও কৃষ্ণকমল চক্ষে কাপড় দিয়া রহিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অবস্থার ভীষণ পরিবর্ত্তন হইল। চিকিৎসকদ্বয় ইঙ্গিত করিলেন—মুমূর্ষু বৃদ্ধকে বাহিরে আনা হইল। বাহিরে আনা : : রায়-মহাশয়ের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। বড়-বৌ ও মেজ-বৌ চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিজগৃহে গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

চোর

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইল। ভৃত্য ভজহরি বাড়ীতে প্রহরী রহিল, আর সকলেই শ্মশানঘাটে গেল। কিন্তু

দাহকার্য্য আরম্ভ হইলে রামকমল কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহাভিমুখে গেল। তখন সকলে শোকে বিহ্বল, সুতরাং তাহার গমন কেহ লক্ষ্য করিল না। ভজহরি প্রভুশোকে প্রায় হতজ্ঞান হইয়া আঙ্গিনায় ভূমিশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া রামকমল ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া পিতার গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে মৃণ্ময় প্রদীপ মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। রামকমল আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, পিতার চাবির দ্বারা একটা লোহার সিন্দুক খুলিল। সিন্দুকে তিনটা তোড়ায় তিন হাজার টাকা এবং একটি ক্ষুদ্র তোড়ায় তিন শত তের টাকা নগদ ছিল। রামকমল ঐ তোড়া তিনটি তিন বারে অন্যত্র লুকাইয়া রাখিয়া আসিল। তিন শত তের টাকার তোড়াটি বাক্সেই রহিল, রামকমল তাহা গ্রহণ করিল না। একটি ক্ষুদ্র টানের বাক্সে প্রাপ্য টাকার কতকগুলি খত ছিল; রামকমল সেগুলিও হস্তগত করিল। পরে ধীরে ধীরে সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া একবার উঁকি মারিয়া ভজহরির প্রতি চাহিল, দেখিল, সে তখনও তদবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। রামকমলের সাহস বৃদ্ধি হইল; সে পুনরায় গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া ছোট লোহার সিন্দুকটি খুলিল। ইহাতে রায়-পরিবারের পৈতৃক ভূসম্পত্তির কবালা ও অন্যান্য দলিল, রায়-মহাশয়ের নামের পিতলের মোহরটি এবং প্রতিবেশিগণের বন্ধক দেওয়া কতকগুলি সোণার ও রূপার গহনা ছিল। রামকমল সেগুলি আত্মসাৎ করিল। তার পর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে পুনরায় শ্মশানঘাটে যাইয়া ভূমিতে বসিল এবং হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া মায়া-ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। রামকমলের অনুপস্থিতি কেহ বড় লক্ষ্য করে নাই, সুতরাং তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, রামকমলের চিন্তা দূর হইল—সে মনে মনে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

দাহ-কার্য্য সমাপন হইল। রায়-পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ, পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশিগণ স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া গৃহে গেল। তখন পূর্ব্বদিক্ রক্তিমাভ

হইয়া উঠিতেছে। মুক্তকেশী ও কৃষ্ণকমল সন্তানগণসহ ঘোর নিদ্রিত হইল। দুর্বুদ্ধি-পরিচালিত রামকমলের নিদ্রা হইল না। স্বর্ণকমল, তাহার জননী কৃপাময়ী, সুকুমারী ও পর-দুঃখকাতর দীনেশচন্দ্র মর্ম্মযাতনায় কাতর হইয়া শয্যায় গেলেন বটে, কিন্তু নিদ্রাদেবী তাঁহাদিগকে অঙ্কে স্থান দিলেন না। *

ভোর হইল। গভীর নিশার গভীর হরিবোলধ্বনি শ্রবণে গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলে রায় মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিয়াছিল। এখন বিদ্যুদ্বেগে এই শোকসংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। দুই চারিজন নীচপ্রকৃতির ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই রায় পরিবারের এই বিপদে আন্তরিক দুঃখিত হইল। নিকটবর্ত্তী পদস্থ ব্যক্তিগণ দলে দলে রায়বাড়ী আসিয়া স্বর্ণকমল প্রভৃতিকে সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা যথাসম্ভব আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। আজ অনেকের হৃদয়েই পরকালের কথা একবার উদয় হইল। 'এই মুহূর্ত্তে যে মানুষ কথা কহিতেছিল, সংসারচিন্তায় লিপ্ত ছিল, পর-মুহূর্ত্তেই সে নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইল! মানুষ মরিয়া কি হয়, কোথায় যায়? কেন এরূপ হয়?' ইত্যাকার চিন্তায় আজ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের হৃদয় জুড়িয়া গেল।

বেলা এক প্রহর না হইতেই রায়-পরিবারের কুলপুরোহিত রামনিধি বিদ্যালঙ্কার আসিলেন। তখন স্বর্ণকমল, রামকমল, দীনেশচন্দ্র ও গ্রামের আরও অন্যান্য লোক বৈঠকখানা-গৃহে উপবিষ্ট। স্বর্ণকমলের মূর্ত্তি প্রশান্ত ও শোককাতর, চক্ষু বিস্ফারিত ও রক্তিমাভ। সারা রাত্রি কাঁদিয়া তাঁহার চক্ষের পত্র ফুলিয়া গিয়াছে। আর রামকমলের মূর্ত্তি দুশ্চিন্তাপূর্ণ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কিয়ৎকাল কোন কথা বলিতে পারিলেন না। স্বর্ণকমলের কাতরতাপূর্ণ ও শোকব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুও বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মনের বেগ সংবরণ করিয়া স্বর্ণকমলকে

লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বৃথা চিন্তা ক'রে কি ক'র্‌বে—সকলই ভগবানের হাত। আমি আর কি বুঝাব?'

স্বর্ণকমলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল—সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্দেহ

এদিকে রামকমল ক্রমেই অধৈর্য্য হইতেছিল। এখনও কেহ শ্রাদ্ধের কথা উত্থাপন করিতেছে না, লৌহসিন্দুক খুলিয়া নগদ তহবিল ইত্যাদি গণিয়া দেখিতে বলিতেছে না, ইহাতে তাহার যাতনা উপস্থিত হইল। কোন প্রকারে এখন চাবিগুলি অন্যের হস্তে প্রদান করিয়া তাহার ঘাড়ে দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া সে নিজে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে সে সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। দীনেশচন্দ্রের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় স্বর্ণকমল একটু প্রকৃতিস্থ হইল। সুযোগ বুঝিয়া অপরাহ্নে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রাদ্ধের কথা পাড়িয়া বলিলেন, 'অদৃষ্টদোষে পিতৃহীন হইলে, কি করিবে, এর ত' আর উপায় নাই। তোমার পিতা একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। এ অঞ্চলে তাঁহাকে কে না চিনে? আর তিনি বেশ দু-পয়সা রেখে গেছেন, ইহাও সাধারণের ধারণা। এ অবস্থায় তাঁর শ্রাদ্ধের কি ক'র্‌বে না ক'র্‌বে বিবেচনা ক'রে দেখ। আর সময়ই বা কৈ? আজ দু'দিন যায়, মাঝে আর আট দিন বৈ ত নয়।'

স্বর্ণকমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। রামকমল হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, 'বিদ্যালঙ্কার জেঠা যা' ব'ল্‌লেন, তা' ঠিক; যা' হয় শীঘ্র করা কর্ত্তব্য। আর লোহার সিন্দুকে কি আছে না আছে, সকলের সাক্ষাতে খুলে দেখা উচিত। এই যে চাবি রয়েছে।'

এই কথা বলিয়া রামকমল চাবিগুলি স্বর্ণকমলের সম্মুখেই রাখিল।

দীনেশ। এখন আপনার কাছেই চাবিগুলি রাখুন না কেন? আপনাকে ত' কেহ অবিশ্বাস ক'র্‌ছে না।

রাম। না, তার প্রয়োজন নাই। টাকা-পয়সার বিষয়, একটু সাবধান হওয়া ভাল। সকলের সাক্ষাতে তহবিল বুঝা হইলে বরং আমি চাবি রাখ্‌তে পারি।

এইরূপ কথোপকথনের পর, তখনই লৌহ-সিন্দুক দুটি তল্লাস করিয়া নগদ তহবিল গণিয়া দেখা স্থির হইল। কৃষ্ণকমলকে ডাকা হইল। সে তখনও ঘুমাইতেছিল। কৃষ্ণকমল চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বহির্ব্বাটীতে আসিল। তারপর ভ্রাতৃত্রয়, দীনেশচন্দ্র ও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় রায়-মহাশয়ের শয়ন-গৃহে গেলেন। কৃষ্ণকমল সকলের সাক্ষাতে প্রথমতঃ বড় সিন্দুকটী খুলিতে লাগিল। রামকমলের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল একটি ক্ষুদ্র টাকার তোড়া ঘরের মেজেতে ফেলিয়া গণিতে লাগিল। দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'আগে হাজার টাকার তোড়া-কটির খোঁজ করুন—'

কৃষ্ণ। কৈ, এ বাক্সে আর ত টাকার তোড়া নাই!

দী। সে কি কথা? অবশ্যই আছে, দেখুন।

কৃষ্ণ। কৈ, দেখুন না কেন, কতকগুলি কাগজ ছাড়া এ বাক্সে আর কিছুই নাই।

দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সিন্দুকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, প্রকৃতই উহাতে আর একটি কপর্দ্দকও নাই। দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমল পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন।

দী। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমার দাদারা আস্‌বার পূর্ব্বের দিন আমার সাক্ষাতে যে তিনটি তোড়ায় তিন হাজার টাকা রাখা হ'য়েছিল! সে টাকা কি খরচ হ'য়েছে?

স্বর্ণকমল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'কৈ—না, এত কিসে খরচ হ'বে?'

দী। তবে?

স্বর্ণ। কি আর ব'লব, নিশ্চয়ই চুরি হ'য়েছে।

লৌহ-সিন্দুকে রক্ষিত টাকা-সম্বন্ধে স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র যে অবগত আছেন, রামকমল ইহা জানিত না। জানিলে হয় ত' সে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হইত না। এখন সে মনে মনে একটু ভীত হইল। কিন্তু এ অবস্থায় সাহস প্রদর্শনই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া সে বলিল, 'দেখুন দেখি, সময়ে চাবিগুলি না দিলে, এ সন্দেহ যে আমার উপরই পড়িত।'

দীনেশবাবু এ কথায় লক্ষ্য না করিয়া স্বর্ণকমলের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, 'বোধ হয়, তোমার ভুল হ'য়েছে—টাকাকড়ি বোধ হয় ঐ ছোট সিন্দুকে রেখেছ।'

স্বর্ণ। না, এই সিন্দুকেই রেখেছিলাম, আমার বেশ স্মরণ আছে। তিন দিনের কথা বৈ ত' নয়!

দী। একবার ছোট সিন্দুকটি অনুসন্ধান ক'রেই দেখ না কেন—ভুল-ভ্রান্তি সকলেরই আছে।

স্বর্ণকমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, 'ছোট সিন্দুকে কতকগুলি বন্ধকী সোণার গহনা, কতকগুলি খত, আর কয়েকখানা প্রয়োজনীয় দলীল মাত্র আছে। সন্দেহভঞ্জন ক'রতে হয়, একবার খুলে দেখ।'

অতঃপর ছোট সিন্দুকটি খোলা হইল। সকলে সতৃষ্ণ নয়নে উহার অভ্যন্তরের দিকে চাহিল, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! ইহাতে টাকা ত নাই-ই—গহনাপত্র, দলীল ইত্যাদি কিছুই নাই! স্বর্ণকমল মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, 'টাকা-কড়ি, গহনাপত্র সর্ব্বস্ব গিয়াছে—খতগুলি গিয়াছে, দলীলগুলি গিয়াছে। পথের ভিখারী হইলাম, তাহাতেও ভাবি না, কিন্তু পরের বন্ধকী গহনাগুলি যে গেল, তাহার কি হবে?—আমি কি উপায় ক'রব?'

সকলে নির্ব্বাক্ হইলেন। গত রজনীতে যখন বাড়ীর সকল লোক শ্মশানঘাটে ছিল, তখন চুরী হইয়াছে, ইহা সকলেই সিদ্ধান্ত করিল। গ্রামে

রাষ্ট্র হইল, রায়-বাড়ীতে গত-রাত্রে ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। সকলে চুপি চুপি বলাবলি করিতে লাগিল, 'এ কি রকম চুরি গা? সিন্দুকে চাবি বন্ধ আছে, অথচ ভিতরের মাল সাবাড়!—এ যে আশ্চর্য্য রকমের চুরি!! চোরের ফের চাবি বন্ধ করিয়া যাবার কি প্রয়োজন ছিল? আর চোরে কাগজপত্র চুরি ক'র্‌বে কেন?' কেহ বলিল, 'ঘরের ইঁদুর বাঁধ না কাটিলে কি এমন হয়? ইহা নিশ্চয়ই ভজহরির কাজ।' কেহ তাহার উত্তরে বলিল, 'ভজহরি বহুকালের পুরাতন বিশ্বাসী লোক—সে কখনও এ কাজ করে নাই। আর সে চাবি পাবে কোথা? সে চোর হ'লে চিরকাল এ বাড়ীতে কাটিয়ে যেতে পার্‌ত না।'

রামকমলের বুক দুর্‌-দুর্‌ করিতে লাগিল, সে মনে মনে ভাবিল, 'অনেক লোভ করিয়া ভাল কাজ করে নাই, খতগুলি না নিলেই ছিল ভাল; আর ফের চাবি বন্ধ করে রাখা নেহাৎ আহাম্মুকী হ'য়েছে।'

দীনেশচন্দ্র অনেকক্ষণ মনে মনে কি ভাবিলেন, তার পর স্বর্ণকমলের কাণে কাণে বলিলেন, 'আমার বোধ হয়, এ তোমার বড়-দাদার কাজ—এখন তুমি যাহাই বুঝ।'

স্বর্ণকমল বলিল, 'ভগবান্ জানেন।'

কিন্তু ক্রমে ক্রমে রামকমলের উপরই সকলের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সাহেব-বন্ধু

রায়-মহাশয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই চুরির সংবাদও অতিরঞ্জিত হইয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কেহ বলিল, 'সিঁদ্‌-চুরি হইয়াছে'; কেহ বলিল, 'ডাকাত পড়িয়াছিল—দস্যুরা পাঁচ ছয়টা মশাল জ্বালিয়া, হাতে

অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া দালানের কপাট ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া, লৌহ-সিন্দুক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সর্ব্বস্ব লুঠপাট করিয়া লইয়া গিয়াছে। নগদ প্রায় দশ হাজার টাকা গিয়াছে—তা ছাড়া সোণা-রূপার গহনা যে কত গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।' আর কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'রায়-মহাশয়েরা চোর ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।'

এ ঘটনায় কি করা কর্ত্তব্য, স্বর্ণকমল তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। থানায় খবর দিলে যদি প্রকৃত চোর ধরা পড়ে, তবে হয় ত বংশে কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে—জ্যেষ্ঠ সহোদরের কারাবাস-দণ্ড হইবে। স্বর্ণ-কমলের হৃদয়ে এ চিন্তাও উদয় হইতে লাগিল। 'চোর ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে' এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে, সুতরাং এ কথা থানায় পৌছিলে কিংবা কেহ দরখাস্ত করিলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। এইরূপ বিপরীত চিন্তায় তাহার মন বিলোড়িত হইতে লাগিল। অগত্যা সকলে পরামর্শ করিয়া থানায় একটা সংবাদ দিয়া রাখাই স্থির করিলেন, কিন্তু রামকমল এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারিল না। সে বলিল, 'থানায় খবর দিয়ে কি লাভ হবে? নিজেদের অনুসন্ধান ক'রে দেখা উচিত। থানায় খবর দিলে পুলিশ-কর্ম্মচারীতে বাড়ী ভ'রে যাবে, মেয়েদের প্রতি অত্যাচার হবে, অথচ লাভ কিছুই হবে না।'

বলিতে বলিতে রামকমলের মুখ শুকাইয়া গেল। স্বর্ণকমল ও দীনেশ-চন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং রামকমলের প্রতি তাঁহাদের সন্দেহ আরও বাড়িল। রামকমলের চরিত্র ভাবিয়া তাহার প্রতি তাঁহাদের উভয়েরই এক প্রকার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। এরূপ নীচপ্রকৃতি ব্যক্তির আদালতে দণ্ড হওয়াই উচিত, দুই একবার এ কথাও তাঁহাদের মনে জাগিতেছিল।

থানায় চুরির সংবাদ প্রেরিত হইল, কিন্তু কাহারও প্রতি সন্দেহ করা হইল না। ইহার পূর্ব্বেই গ্রাম্য-চৌকিদার থানায় সংবাদ দিয়াছিল, গত রাত্রে ৺কালীকান্ত রায়ের বাড়ীতে প্রায় দশ হাজার টাকা চুরি হইয়া

গিয়াছে। রায়-পরিবার ধনশালী বলিয়া জনশ্রুতি ছিল। সুতরাং পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ কথাটা নিতান্ত উড়াইয়া না দিয়া একবার তদন্ত করিয়া দেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। বিশেষতঃ সে দিন জেলার বড় পুলিশ ইউল সাহেব থানায় উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গাতীর হইতে মোহনগঞ্জ থানা এক ক্রোশের পথ মাত্র। ইউল সাহেব বঙ্গের পল্লীগ্রাম দেখিতে বড় ভালবাসিতেন, সুতরাং তিনি এ সুযোগ ছাড়িলেন না; স্বয়ং দলবল সহ এই চুরির অনুসন্ধানে চলিলেন। থানার ইন্‌স্পেক্‌টার মহেন্দ্র বাবুর ঘোটকটি সাহেবের বাহন হইল। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকের নিকটই সাহেব একটা অভিনব পদার্থ, সাহেবেরা কিরূপ জীব—ইহাদের কয় হাত, কয় পা এবং ইহারা সাধারণ মানুষের ন্যায় কি না, অনেকে এ কথা জানে না, সুতরাং সাহেবের আগমনে সমস্ত গ্রামে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নীচ-শ্রেণীর গৃহস্থগণ হংস, ছাগল ও কুক্কুট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু-পক্ষিগুলি সাবধানে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। যাহাদের একাধিক পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কার্য্যের ব্যপদেশে পুত্রদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিল—ভয়, পাছে সাহেব তাহাদিগকে ধরিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দেন।

পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় সাহেব রায়বাড়ী পৌঁছিলেন। সংবাদ পাইয়া স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র ভীত হইয়া অন্দরবাটী হইতে বহির্ব্বাটীতে গেলেন। রামকমলের প্রাণ উড়িয়া গেল, এবং অধিক পীড়াপীড়ি দেখিলে সমস্ত স্বীকার করিবে স্থির করিল—কারণ, পুলিশ যে কিরূপ প্রকৃতির জীব, তাহা সে কিছু কিছু অবগত ছিল; নানাকারণে তাহার উপরই যে সকলের সন্দেহ হইয়াছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিল। এই ব্যাপারে স্থূলবুদ্ধি কৃষ্ণকমলও তাহার বিরোধী হইল এবং আবশ্যক হইলে সে গুণের বড় দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেও প্রস্তুত হইল। গতিক দেখিয়া রামকমল বড়ই ভীত হইল এবং কৃষ্ণকমলকে তাহার পক্ষে টানিয়া লইবার জন্য সমধিক ব্যগ্র হইল। কৃষ্ণকমলের মতি ফিরাইতে যে তাহার অধিক সময়

লাগিবে না, তাহা সে জানিত।' বহির্ব্বাটীতে পুলিশ আসিয়াছে শুনিয়া, রামকমল ব্যস্ততা-সহকারে কৃষ্ণকমলকে গৃহের অন্তরালে ডাকিয়া নিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, 'কৃষ্ণকমল, শোন! তুমিও কি ওদের সঙ্গে ক্ষেপ্‌লে না কি? আমি কি তোমা ছাড়া? আমি যা ক'রেছি, তোমার জন্য আর আমার জন্যই ক'রেছি। জান ত স্বর্ণকমলকে বাবা গোপনে ঢের টাকা দিয়ে গ্যাছেন; আমি যা সরিয়েছি, বৃথা কেন স্বর্ণকমলকে তার ভাগ দিতে যাব? এ বিপদ্ চুকে গেলে, তোমাতে আমাতে সমান ভাগ ক'রে নেব। তুমি ওদের সঙ্গে নেচো না। জান ত আমি কি প্রকৃতির লোক?

কৃষ্ণকমল একটু হাসিয়া বলিল, 'তা, আগে আমাকে ব'ল্‌লেই ত সব চুকে যেতো। আচ্ছা—কত টাকা?'

রামকমল একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'সে সব কথা পরে জান্‌তে পার্‌বে। তার জন্য ভাবনা কি? আমি ত আর তোমায় ঠকাব না।'

কৃষ্ণকমল রামকমলের পক্ষাবলম্বন করিল। রামকমল মনে মনে ভাবিল যে, স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র অতি সুলোক; তাঁহারা মুখে যাহাই বলুক না কেন, তাহাকে কখনও বিপদে ফেলিবে না। এই ভরসায় সে তাহাদিগকে কোন কথা বলিল না। টাকা ও গহনা ইত্যাদি অপহৃত দ্রব্য-গুলিও ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করিল না।

এ দিকে সাহেবকে দেখিবার জন্য গ্রামের অধিকাংশ লোক একত্র হইয়াছে। তাহারা সকলে সাহেবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব ইহাতে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া দীনেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহারা কি চায়?'

দী। কিছু চায় না—আপনাকে দেখিতে আসিয়াছে!

কথাবার্ত্তা হইতেছিল ইংরাজীতে—সুতরাং গ্রামের লোক তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব অতঃপর উপস্থিত বিষয় উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় কিরূপে কি কি দ্রব্য চুরি হইয়াছে বলুন।'

দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইঁহাদের বাড়ী—সমস্ত কথা ইঁহার বলাই ভাল, আমার বাড়ী এ গ্রামে নয়। আমি এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি।'

স্বর্ণকমল অগ্রসর হইয়া সাহেবের সম্মুখীন হইল। সাহেব তাহার দিকে একবার চাহিয়া পুনরায় দীনেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার বাড়ী এ গ্রামে নয় বলিলেন, তবে কোথায়?'

দীনেশ। চন্দনবাগ-গ্রামে।

সাহেব। চন্দনবাগ গ্রাম আমার বোধ হয় অপরিচিত নহে—আমি সেখানে অনেকবার শিকারে গিয়াছি।

দীনেশ। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে জেলার অনেক সাহেব শিকারে আসিতেন।

সাহেব। সে গ্রামের জমীদার রাধাকান্ত বাবু আমার বন্ধু ছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'তিনি আমারই পিতা।'

সাহেব সে কথায় প্রীতিপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, 'আপনি তাঁহারই পুত্র শুনিয়া বড় সুখী হইলাম; আমি অনেকবার আপনাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি—তখন আপনি ছেলেমানুষ ছিলেন।'

এই কথা বলিয়া সাহেব দীনেশ-বাবুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে আপনার পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসাইলেন; তাঁহার পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কিরূপে স্বর্ণকমলের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে, তাহাও জানিয়া লইলেন। সেইরূপে অনেকক্ষণ দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমলের সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং সুন্দর ইংরাজীতে কথা কহিতে পারেন বলিয়া উভয়ের প্রশংসা করিলেন। তৎপরে স্বর্ণকমলের পিতৃ-বিয়োগে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পুনরায় চুরির কথা উত্থাপন করিলেন। স্বর্ণকমল তদুত্তরে বলিল, 'সবে আমার পিতা ম'রেছেন। এখনও সংসারের আর্থিক অবস্থা ভাল বুঝ্‌তে পারি নাই। তহবিলে কত টাকা ছিল, তা'

সব আছে কি না, চুরি ক'রে থাকলে, কে চুরি ক'রেছে, তা' নিঃসংশয়-রূপে ব'লতে পা'রছি না। এজন্য সম্প্রতি চুরির অভিযোগ উপস্থিত ক'রতে ইচ্ছুক নহি—প্রয়োজন হ'লে পরে অভিযোগ ক'রব।'

সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, 'বুঝিলাম, তোমরা বিষয়টা চাপা দিতে চাহিতেছ—বোধ হয়, কোন আত্মীয় লোক এ ব্যাপারে লিপ্ত আছে। কিন্তু যাউক, তোমরা বাদী না হইলে আমি মোকদ্দমা চালাইব না—আমি তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড় সুখী হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের কাহারও প্রতি সন্দেহ থাকিলে আমাকে বলিতে পার—তোমাদিগকে কোন ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইবে না—সে ভয় করিও না।'

স্বর্ণকমল সত্যপ্রিয়, কিন্তু মমতা-শূন্য নহে। টাকার জন্য আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বলিল, 'আপনার বড় অনুগ্রহ দেখ্‌ছি—সুতরাং আপনার নিকট কোন কথা গোপন করা ভাল বোধ হ'চ্ছে না। এক ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ হ'চ্ছে বটে, কিন্তু শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর ক'রে একজনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা সঙ্গত বোধ ক'রছি না।'

সাহেব। তোমার সকল কথায় সন্তুষ্ট হইলাম। আমি পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না। পরে প্রয়োজন হইলে আমাকে জানাইও, আমি সাধ্যানুসারে তোমাদের উপকার করিব।

সাহেবের সঙ্গে খানা আসিয়াছিল, তিনি তাহা উদরস্থ করিলেন। অনুচরবর্গ স্বর্ণকমলের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় সাহেব বন্ধুদ্বয়কে বলিয়া গেলেন, 'তোমাদের সহিত পরিচয় হওয়ায় আমি বড় সুখী হইলাম। যখনই তোমরা জেলায় যাইবে, আমার কুঠীতে যাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলে আমি আরও সুখী হইব। আমার দ্বারা কখন কোন-রূপ উপকার সম্ভব হইলে সাধ্যানুসারে তাহা করিব।'

সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-কর্ম্মচারিগণও চলিয়া গেল। এ যাত্রা

এরূপ নিষ্ফল হইবে, ইহা তাহারা পূর্ব্বে মনে করে নাই। সুতরাং মফঃস্বলে আসিয়া একেবারে শূন্য-হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইল বলিয়া তাহাদের মনে বড় দুঃখ হইল। সাহেব তদন্তে আসিলেন, এত লালপাগড়ী-ওয়ালা আসিল, তবু কাহারও খানাতল্লাস হইল না, হাতে হাতকড়ি পড়িল না, কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল না দেখিয়া গ্রামের লোক বিস্মিত, কেহ কেহ বা দুঃখিত হইল। সাহেবের সঙ্গে এতক্ষণ কি কথা হইল, সকলে দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমলকে পুনঃ পুনঃ সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দম্পতি

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দীনেশচন্দ্রের শ্বশুরালয় এই গঙ্গাতীর গ্রামে। ৺কালীকান্ত রায়ের জ্ঞাতিকন্যা শ্রীমতী গিরিবালা তাঁহার পত্নী। গিরিবালার পিতা হরিপদ রায় সঙ্গতিপন্ন লোক নহেন। কয়েক জন শিষ্য আছে! ইহার যৎসামান্য আয় দ্বারা কোন প্রকারে দিন-যাপনে স্ব— বাড়ীতে চারিখানা খড়ের ঘর আছে। পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই তাঁহার ক্ষুদ্র আয় ফুরাইয়া যায়, তাই সকল সময় ঘরের চালে খড় যোগাইতে তাঁহার কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীনচেতা। নিজের ব্যয়-সংকুলনার্থ পরপ্রত্যাশী হওয়া তিনি অপমানজনক বোধ করেন, এজন্য কখনও পরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না। তাঁহার জামাতা দীনেশ-বাবু সঙ্গতিপন্ন লোক। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই জামাতার নিকট সাহায্য পাইতে পারেন; কিন্তু তিনি কখনও সাহায্যপ্রার্থী হন নাই। নিজের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া, এ পর্য্যন্ত কখনও জামাতাকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারেন নাই, সুতরাং দীনেশ-

বাবুর এ পর্য্যন্ত শ্বশুরালয় দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। এ দিকে গিরিবালার মাতা জামাতাকে দেখিবার জন্য দিন দিন ব্যাকুলা হইতেছিলেন। দীনেশচন্দ্রের গঙ্গাতীরে আগমন অবধি সে ব্যাকুলতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণকমলের পিতা যখন রুগ্নশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহাকে দেখিবার উপলক্ষে রায়-বাড়ী যাইয়া, অন্তরালে থাকিয়া জামাতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সাধ মিটে নাই। জামাতাকে নিজ-গৃহে আনিয়া স্বহস্তে দরিদ্রের সম্বল শাকান্ন রাঁধিয়া খাওয়াইবেন স্থির করিলেন।

দীনেশচন্দ্র মনে মনে জানিতেন যে, তাঁহাকে এবার একবার শ্বশুরালয়ে যাইতে হইবে। সে জন্য তিনি প্রস্তুতও হইতেছিলেন। এমন সময়ে শ্বশুর জামাতাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতে আসিলেন। সে কালের কোন সম্পন্ন লোক বোধ হয় এরূপভাবে শ্বশুর-গৃহে যাওয়া অপমানজনক বোধ করিতেন। দীনেশচন্দ্র কিন্তু বিনা আপত্তিতে শ্বশুর-গৃহে গেলেন। দশটি টাকা প্রণামী প্রদান করিয়া শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শাশুড়ী একখান ঢাকাই ধুতি, একখানি উড়ানি ও ঐ টাকা দশটি আশীর্ব্বাদস্বরূপ প্রদান করিয়া দীনেশচন্দ্রের মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে হস্ত বুলাইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তেত্রিশ কোটি দেবতার নিকট জামাতার মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। এদিকে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আজ আনন্দোৎসব হইল। গিরিবালার পিতা, মাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্র ও কনিষ্ঠা ভগিনী চারুশীলা প্রভৃতি সকলে আনন্দে মত্ত হইল। গিরিবালার সঙ্গে তাঁহার স্বামীর বাড়ী হইতে একজন ভৃত্য ও একজন পরিচারিকা আসিয়াছিল। তাহারা তাহাদের বাবুকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইল। দ্বিজেন্দ্র ও চারুশীলা আহ্লাদে অট্টহাসি হাসিয়া এক একবার দীনেশচন্দ্রের গায়ে গিয়া পড়িতে লাগিল। শাশুড়ী জামাতার ভোজ্য-দ্রব্যাদি প্রাণপণ করিয়া রাঁধিলেন এবং গ্রাম্যসুলভ সকল প্রকার উৎকৃষ্ট আহারীয় সংগ্রহ করিলেন।

দীনেশচন্দ্র অতি পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করিলেন। তাঁহার বোধ

হইল, যেন তাঁহার আহারের জন্য ইতিপূর্ব্বে কেহ এত যত্ন করে নাই। ভোজনান্তে দীনেশচন্দ্র শয্যাগৃহে গেলেন। তাঁহার জীবনে আজই খড়ো-ঘরে শয়ন। দীনেশচন্দ্র শয়ন ও ভোজন-কষ্টে অনভ্যস্ত বলিয়া, শাশুড়ী জামাতার ভোজনের সঙ্গে শয্যারও যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সুপরিষ্কৃত গৃহে একখানি সামান্য তক্তপোষের উপর একখানি অতি পরিষ্কার শয্যা বিস্তৃত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র সেই তক্তপোষে বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে পত্নীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গিরিবালা ক্ষিপ্রহস্তে ভোজন শেষ করিয়া, কতকগুলি পানের খিলি লইয়া, শয়ন-ঘরে গেলেন, একটি পান স্বামীর মুখে বলপূর্ব্বক গুঁজিয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আজ আমাদের কি শুভ দিন!'

দীনেশচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, 'কেন?'

গিরি। অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্রের উদয়, আবার 'কেন' কি? ঐ যে বলে, গরীবের দুয়ারে হাতী', এ যে ঠিক তাই।

দী। তুমি দেখি বেশ কবি হ'য়ে উঠেছ!

গিরিবালা মৃদু হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'সেই হেতু আনিয়াছে হেথা, এ কনক-লঙ্কাপুরে বীর রঘুনাথে।'

দী। বেশ বেশ। এ যে দ্বিতীয় মাইকেল।

গি। 'মণি মুক্তা রতন কি আছে রে জগতে,
যাহে নাহি তুচ্ছ করি লভিতে সে ধন?'

দীনেশচন্দ্র পত্নীর চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

গিরিবালা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,—

'রাবণ শ্বশুর মোর মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?'

দী। তোমার বিদ্যার জোর দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে—দু পাঁচ দিন পিত্রালয়ে থেকে দেখি বেশ একজন কবি হয়ে উঠেছ।

গি। কি ব'ল্লে—'কবি' না 'কপি'? 'কপি' শব্দের অর্থটা কিন্তু আমার জানা আছে। বিদ্যা বড় কম নয়!

দী। এখন একটা টোল খুল্লে ভাল হয় না?

গি। মনের মত ছাত্র পেলে খুল্‌তাম বৈ কি।

দী। চেষ্টা ক'র্‌লে ভাল ছাত্র জুট্‌তে পারে।

গি। গুরুভক্ত শিষ্য জোটে কৈ? জুট্‌লে তাহাকে কিছু গৃহস্থালী শিখাতাম, কিসে স্ত্রীলোকের সুখ-দুঃখ হয়, তাহা বুঝিয়ে দিতাম। যে এক ছাত্র পেলাম, কপাল-দোষে, তার মাথা পেকে গিয়েছে—সে এখন নূতন পাঠ নিতে চায় না।

দীনেশচন্দ্র স্নেহভরে গিরিবালাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, 'আজ যে সবই নূতন কথা, ব্যাপারখানা কি?'

গিরি। আজ সবই নূতন, কথা নূতন না হবে কেন?—মহাশয়ের বুঝি বড় কষ্ট হচ্চে?

দী। মহাশয়ার যে গজেন্দ্রগমন, কষ্ট হ'য়েছিল বৈ কি! আমি ভাব্‌লুম, আপনি বুঝি আস্‌বেন না; আস্‌তে বুঝি বড় ইচ্ছা ছিল না?

গি। আমার জন্য ত তোমার ঘুম হয় না!

দী। সে কথা কতক সত্য বটে।

গি। আর ব'ল্‌তে হ'বে না—আজ ক'দিন ধ'রে ওখানে এসেছ, একটিবার দেখা ক'ল্লে না! বাবা যদি আজ না যেতেন, তবে বোধ হয়, ওখান থেকেই চ'লে যেতে।

তার পর, গিরিবালা সগর্ব্বে ব'লিল, 'বাপ মা বরং গরীব—দীন-দুঃখী! আমি ত আর এখন গরীব নই। দয়া ক'রে আমাকে একটিবার দেখ্‌তে এলে কি সম্মান খসে পড়্‌ত, না জমিদারী নিলাম হ'য়ে যেত? তুমি এখানে এলে, দু'দিন আমরা অপেক্ষা ক'র্‌লাম। তুমি এলে না দেখে অগত্যা আমি আর মা, ঝিকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণদাদার বাড়ী গিয়া আড়াল থেকে তোমাকে দেখে এলুম।'

দীনেশচন্দ্র পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ! আমি রোজই আস্‌ব আস্‌ব ভাব্‌ছিলুম, কিন্তু ওদের এই বিপদ্, কি ক'রে আসি বল?'

গি। মনে থাক্‌লে সব হয়। তোমাদের ইংরেজী কেতাবে বুঝি মেয়েমানুষের সুখ-দুঃখের কথা কিছু লেখা নাই! নইলে মানুষগুলি এত বোঝে, এই সামান্য কথাটি বোঝে না কেন?—তাই ত ব'ল্‌ছিলুম, একটা ভাল ছাত্র পেলে কিছু শিখাতাম।

দী। আমি ছাত্র হ'তে প্রস্তুত আছি।

গি। তোমার মাথা পেকে গেছে, সহজে নূতন পাঠ স্থান পাবে না। না, তামাসা যাউক, তোমার ত আজ কষ্ট হ'চ্ছে!

দী। কিসের কষ্ট?

গিরিবালা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'এমন সুন্দর শয্যায়ও কখন শোও নাই—এমন খাওয়াও বোধ হয় খাও নাই!'

দী। কেন, খাওয়া ত বেশ হ'য়েছে।

গি। বেশ বৈ কি!—বিদুরের ক্ষুদ্র-কণা।

দী। তোমার এত দৈন্যে প্রয়োজন নাই।

গি। আমি দৈন্য দেখাব কোন্ দুঃখে? আমার অভাব কিসের? আমার মত অদৃষ্ট ক'জনের?

দীনেশচন্দ্র পুনরপি রূপলাবণ্যবতী, সুচতুরা ভার্য্যার অলকগুচ্ছশোভিত সুকোমল গণ্ডদেশে স্নেহভরে চুম্বন করিলেন। সারানিশি বসিয়া প্রেমের কথা বলিলেও যত অনুরাগ প্রকাশিত না হয়, একটি চুম্বনে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক অনুরাগ প্রকাশিত হইল। সেই চুম্বনে বলিল, 'আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসি!'

রাত্রি অধিক হইয়াছে, আলো নির্ব্বাপিত হইল। দরমার বেড়া ভেদ করিয়া চন্দ্রের রশ্মি গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

গিরিবালা স্বামীকে তাহা দেখাইয়া বলিল, দেখ দেখি, এ ঘরে আজ ক মণি-মুক্তা জ্ব'লছে! তোমার জীবনে কখনও এরূপ সোণার ঘরে শোও নাই—শোবেও না। এজন্য আমাদিগকে তোমার কিছু বক্‌সিস দেওয়া উচিত।'

দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'বক্‌সিস পাবে বৈ কি! সে জন্য ভেবো না, বক্‌সিস্ দিব ব'লেই ত' এসেছি।'

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যার যার, তার তার

পরদিন প্রাতঃকালে কিছু জলযোগ করিয়া দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলের বাড়ী গেলেন। সকলে রামকমলের নিকট হইতে অপহৃত ধনাদি পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামকমল কিছুতেই হটিল না। এখন আর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই স্থির বুঝিতে পারিয়া, সকলের সমক্ষে, যেন একটু ক্রোধের সহিত সে বলিল, 'আমার নিকট টাকা চাওয়া হ'চ্ছে কেন?—আমি কি চোর নাকি? চুরি ক'রে থাকি বেশ ক'রেছি—সাধ্য থাক্‌লে আমাকে পুলিশে দিলেই ত' হয়। অত [illegible] হানাহানির প্রয়োজন কি?—আমার স্পষ্ট কথা, মন চায় খুসী হও, মন চায় বেজার হও। আমি কোন বেটার ধার ধারি না। এ দেশে যদি উচিত বিচার থাক্‌ত, এতদিন আমার নিজ উপার্জ্জনের যে টাকাগুলি সংসারে দিয়েছি, তা' আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত।'

রামকমলের কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইলেন।

দীনেশচন্দ্র বিরক্তি-সহকারে বলিলেন, 'সকল অবস্থায় ভদ্রতা ভাল নহে, পুলিশ-তদন্ত হ'লেই ভাল ছিল; আমার বিবেচনায় এখনও পুলিশে সন্দেহ করিয়া খবর দেওয়া উচিত।'

তারপর স্বর্ণকমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আর ভাব্‌ছ কি? যা' গিয়েছে, তার আশা ত্যাগ কর। একটু কঠিন হ'তে পা'র্‌লে এখনও কূল-কিনারা করা যেতে পারে, ভদ্রতায় কিছুই হ'বে না।'

স্বর্ণকমল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অদৃষ্টে যা' আছে, তাই হ'ক্, তবুও পিতার নামে কলঙ্ক রাখ্‌ব না। পৈতৃক ধনসম্পত্তি যা' কিছু ছিল, তাহার আশা ত্যাগ ক'র্‌লাম।'

কৃষ্ণকমল সে কথার পোষকতা করিল। সুতরাং এখন হইতে রাম কমলের কোনরূপ চিন্তা রহিল না।

৺কালীকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধ ভালরূপ হইতে পারিল না। তহবিলে তিন শত তের টাকা মাত্র। প্রাপ্য টাকার খতগুলি চুরি গিয়াছে, কাহারও নিকট টাকা পাওয়া গেল না। সুতরাং ঘরের ঐ সামান্য টাকায় কোন রূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল। যাহারা লুচি-সন্দেশ আশা করিয়াছিল তাহারা তৎপরিবর্ত্তে এক মুষ্টি চিপিটকও পাইল না দেখিয়া নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল। বলিল, 'সিংহের ঘরে সব শৃগাল জন্মেছে—এরা সব ক্রিয়াকলাপ লোপ ক'র্‌বে।'

শ্রাদ্ধের পরই রামকমল পৃথগন্ন হইবার প্রস্তাব করিল। পৃথগন্ন হইলে নিজে কর্ত্তা হইতে পারিবে ভাবিয়া কৃষ্ণকমল ইহাতে অনুমোদন করিল। স্বর্ণকমলও আর আপত্তি করিল না। সুতরাং সকলে পৃথগন্ন হইয়া পড়িল। পৈতৃক তৈজস-পত্র দ্রব্যসামগ্রী তিন ভাগে বিভক্ত হইল। রামকমল ও কৃষ্ণকমল তাহাদের ভাগ বুঝিয়া লইল। স্বর্ণকমল অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিল। ইষ্টকালয় দুটি রামকমল ও কৃষ্ণকমল লইয়া, অসম্পূর্ণ ইষ্টকালয়টি স্বর্ণকমলের ভাগে দিল এবং উহা সম্পূর্ণ করিবার ব্যয়-সংকুলনার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় স্বর্ণকমলকে কিছু নগদ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইল। আর খড়ের চৌচালাগৃহখানা সম্প্রতি জননীর বাসগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। রামকমল, কৃষ্ণকমল এই বণ্টন করিল, স্বর্ণকমলের পক্ষে কেহ কেহ

ইহাতে আপত্তি করিল, কিন্তু স্বর্ণকমল এই বণ্টন স্বীকার করিয়া বলিল, 'নির্বিবাদে যা হয়, তাই ভাল। আমি এ নিয়ে ঝগড়া ক'রব না। দাদারা যা ক'র্ছেন, তাই আমার স্বীকৃত।'

রামকমল ও কৃষ্ণকমল ইষ্টকালয় দুটি দখল করিয়া বসিল, তাহাদের দ্রব্যসামগ্রীতে প্রকোষ্ঠ পূর্ণ করিতে লাগিল। আর স্বর্ণকমলের দ্রব্যসামগ্রী সম্প্রতি জননীর গৃহেই রাখা হইল এবং যতদিন ইষ্টকালয়ের নিৰ্ম্মাণকার্য্য সমাধা না হয়, ততদিন সুকুমারীও শাশুড়ীর সঙ্গে থাকিবেন—স্থির হইল।

শোক-কাতরা গিন্নী কৃপাময়ী প্রিয়পুত্র ও পুত্রবধূকে আবাস-ঘর-শূন্য এবং তাহাদের নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। সুকুমারী বস্ত্রাঞ্চলে শাশুড়ীর অশ্রু মুছাইয়া বলিল, 'কাঁদিলে কি হবে, মা! সকলই ভগবানের ইচ্ছা, তিনি কৃপাদৃষ্টি ক'র্লে এ অবস্থা ফির্তে পারে।'

বলিতে বলিতে সুকুমারীর চক্ষু হইতে টস্-টস্ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। দেখিয়া গিন্নী-ঠাকুরাণীর দুঃখের সাগর আরও উথলিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া স্বর্ণকমল নিকটস্থ হইয়া বলিল, 'মা! তোমরা দুঃখ ক'রো না, যদি ভগবান্ দয়া করেন, তবে আবার সব হবে। নতুবা তিনি যেরূপ রাখেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে। ভেবে কি ক'র্বে?'

দীনেশচন্দ্র বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'স্বর্ণকমল আছে, ছোট-বৌ-আছে—আমরা আছি। আপনার কিসের দুঃখ, মা? সকলেই ত আপনার শত্রু নয়!'

বৃদ্ধা এ কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। জননী ও ভার্য্যার কষ্ট দেখিয়া স্বর্ণকমলের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যত শীঘ্র সম্ভব, তাঁদের দুঃখ দূর করিবে এবং ইষ্টকালয়টি সম্পূর্ণ করিবে, স্থির করিল। কিন্তু নগদ টাকা ও প্রাপ্য টাকার খতগুলি রামকমল হস্তগত করিয়াছে। যৎসামান্য ভূ-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা কোন প্রকারে মোটা ভাত, মোটা কাপড় চলিতে পারে মাত্র। রামকমল

ও কৃষ্ণকমল ইষ্টকালয়ের নির্ম্মাণ-জন্য যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহাও 'আজ দিব, কা'ল দিব' করিয়া দিল না। এই প্রতিশ্রুতির অনেক সম্ভ্রান্ত সাক্ষী ছিল। স্বর্ণকমল ইচ্ছা করিলে তাহা আদালতের সাহায্যে আদায় করিতে পারিত। কিন্তু স্বর্ণকমল বলিল, 'এতই যখন ত্যাগ ক'র্‌লাম, তখন আর এই জন্য আদালতে যাব না।'

সুতরাং নালিশও হইল না, টাকা আদায়ও হইল না। স্বর্ণকমল এখন চাকরীর অনুসন্ধানে দূরদেশে যাইবে স্থির করিল।

প্রজাদের নিকট হইতে মথুরানাথ পাল নামক এক ব্যক্তি খাজনার টাকা আদায় করিত। স্বর্ণকমল তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, 'আমি বিদেশে যাইব। আমার অংশের টাকা প্রতি কিস্তিতে নিয়ম মত মায়ের হাতে দি'ও। এইমাত্র তাঁদের ভরণপোষণের অবলম্বন, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।'

মথুরানাথ স্বীকৃত হইল। অতঃপর স্বর্ণকমল, জননী ও ভার্য্যাকে আশ্বস্ত করিয়া গৃহবহির্গত হইল। যাইবার সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে মাতার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রে রামকমল কৃষ্ণকমলকে নিজগৃহে ডাকিয়া নিয়া চুপি চুপি বলিল, 'তুমি টাকার তাগাদায় আমাকে অস্থির ক'রেছ, এই নেও তোমার টাকা। ছয় শত বার টাকা রাখিয়াছিলাম—তাহা হ'তে তোমাকে দুশত টাকা দিচ্ছি।'

বলিয়া সে টাকার তোড়া সম্মুখে রাখিল। কৃষ্ণকমল আব্দার করিয়া বলিল, 'তা কেন, বড় দাদা! আমাকে যে অর্দ্ধেক দিবে ব'লেছিলে?'

রামকমল উদারতা দেখাইয়া বলিল, 'আচ্ছা, তবে তাই লও, আমার কথা মিথ্যা হবে না। আর আমার মতে থাক্‌লে তোমার লাভ বৈ লোকসান হবে না—তা নিশ্চয় জেনো।'

'আমি কোন্ দিন তোমার মত ছাড়া বড়-দাদা!'

রামকমল টাকাগুলি ভাগ করিয়া তিন শত ছয় টাকা কৃষ্ণকমলকে দিল, বক্রী তিন শত ছয় টাকা পুনরায় থলের মধ্যে রাখিল। এই স্থলে আর কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। কৃষ্ণকমল পিতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শ্বশুরালয়ে গেলে, তাহার পাঠশালাটি ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েক দিন পরে আর এক ব্যক্তি একটি পাঠশালা খুলিলে তথায় সমস্ত ছাত্র দলে দলে যাইয়া ভর্ত্তি হইল। কৃষ্ণকমল চেষ্টা করিয়াও আর ছাত্র পাইল না। তাহার বাহিরের আয়ও আর কিছু রহিল না। এই টাকাগুলির দ্বারা সে কয়েক দিন বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতে লাগিল। রামকমলও মনিবের অনুমতি ব্যতীত চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া, মহাজন তাহার স্থানে আর এক-জন নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য রামকমলের বিশেষ কষ্ট হইল না। তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ ছিল—আবার এ দিকে নগদই প্রায় তিন হাজার টাকা প্রাপ্তি হইল। তা ছাড়া অনেক টাকার খত, অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারও তাহার হস্তগত হইয়াছে। ন্যায়পথে হউক, অন্যায়-পথে হউক, ধনবৃদ্ধিই তাহার মূলমন্ত্র হইল এবং সর্ব্বদা অবসর থাকায় নানারূপ কুচিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়খানা সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

চাকরী-প্রাপ্তি

স্নেহময়ী জননীর কাঁদ-কাঁদ মুখ এবং প্রিয়তমা ভার্য্যার অশ্রুপূর্ণ নয়ন ও শুষ্ক বদন দেখিয়া স্বর্ণকমল গৃহবহির্গত হইল। জননী ও স্ত্রীর বিদায়-কালীন মুখচ্ছবি দেখিয়া স্বর্ণকমলের এক পা অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু কি করে—তহবিল শূন্য, চাকরী ব্যতীত উপায়ান্তর খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার উদারহৃদয় প্রতিহিংসার জন্য ব্যস্ত হইল না। এমন কি,

সে কথা তাহার হৃদয়ে একবার উঠিলও না। এ দিকে রামকমল ও কৃষ্ণকমলের চিন্তা হইল, পাছে স্বর্ণকমল বিদেশে যাইয়া একটা ডেপুটীগিরি কিংবা জজীয়তি পাইয়া বসে। তাই তাহারা উভয়ে, বিশেষতঃ রামকমল, মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিল, 'হরিঠাকুর! স্বর্ণকমলের এ যাত্রা নিষ্ফল হউক, আমি সওয়া পাঁচ আনার বাতাসা হরির লুট দিব।'

ভগ্নহৃদয় স্বর্ণকমল গৃহ-বহির্গত হইল। গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে পৌঁছিতেই তাহার হৃদয় শূন্যবোধ হইতে লাগিল। এতদিন সংসার যে চক্ষে দেখিতেছিল, আজ আর সে চক্ষে দেখিতে পারিল না—থাকিয়া থাকিয়া মায়ের মুখ, স্ত্রীর মুখ তাহার মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয় লইবে, কাহার নিকট কৃপাভিক্ষা চাহিবে, এ চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। শতলক্ষ যোজন-বিস্তৃত মহাসমুদ্রে ভাসমান অর্ণবযানের দিক্‌ভ্রান্ত নাবিক আপনাকে যেরূপ বিপন্ন ও লক্ষ্যশূন্য মনে করে, স্বর্ণকমল আপনাকে আজ সেইরূপ মনে করিতে লাগিল। কোন্ দিকে গেলে কূলে পৌঁছিতে পারিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হঠাৎ নীলাকাশে একটি সুখ-তারা দেখা দিল—তাহাতে গতিনির্ণয়ের কিছু সুবিধা হইল। ইউল সাহেব বন্ধুভাবে উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং জেলায় গেলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন, স্বর্ণকমলের সে কথা মনে পড়িল। সাহেব বড় ভদ্র এবং বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার বড় অনুগ্রহ। স্বর্ণকমল এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া মাতা ও ভার্য্যাকে দুঃখ-দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাহেবের শরণাপন্ন হইবে স্থির করিল।

যথাসময়ে স্বর্ণকমল সহরে গিয়া পৌঁছিল। তখন বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। সে পর্য্যন্ত তাহার স্নানাহার ঘটিয়া উঠে নাই, পথের কষ্টে ও অনাহারে তাহার সুন্দর মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, চুলগুলি তৈলাভাবে রুক্ষ হইয়াছে এবং শরীরের স্বাভাবিক কান্তি তিরোহিত

হইয়াছে। স্বর্ণকমল সহরে পৌছিয়া, স্নান-আহারের অপেক্ষা না করিয়া, সামান্য অনুসন্ধানের পর, সাহেবের কুঠীতে গেল। সাহেবের দ্বাররক্ষক তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না। অগত্যা স্বর্ণকমল দ্বারবান্-প্রদত্ত একখানি শ্লেটে নিজ নাম, ধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া দিল। সাহেব তাহা পড়িয়া বাবুটিকে উপরে লইয়া যাইতে বলিলেন। স্বর্ণকমল আপনার চামড়ার ব্যাগটি দ্বারবানের নিকট রাখিয়া তাহার সঙ্গে সাহেবের নিকট গেল। সাহেব একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। স্বর্ণকমল গৃহে প্রবেশ করিলে সেখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, একটু হাসিয়া, তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন এবং তাহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বর্ণকমল কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বলিল, 'আপনি যে আমাকে এত সহজে চিনিতে পারিবেন, এ ভরসা আমার ছিল না।'

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'তোমরা আমাদিগকে বড় নিষ্ঠুর ও আত্মরত মনে কর—নয় কি? যাক্ সে কথা, তোমাকে এত বিষণ্ণ ও কাতর দেখাচ্ছে কেন? লজ্জা কি, আমার নিকট সব খুলিয়া বল।'

সাহেবের সদয় বাক্য শুনিয়া স্বর্ণকমল সাহসী হইল এবং কিরূপে পৈতৃক অর্থ অপহৃত হইয়াছে, কিরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিরূপে পৃথগন্ন হইয়াছে, কি উদ্দেশ্যে গৃহবহির্গত হইয়াছে ইত্যাদি সকল কথা যথাযথরূপে বর্ণন করিল। সাহেব তাহা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'তোমার দাদা হয় ত এখন নিঃশঙ্ক হ'য়ে অপহৃত টাকা-কড়ি ও গহনাগুলি নিজ বাক্সে রেখেছে। তোমার ইচ্ছা হ'লে আমি এখন চোর ধ'রে উপযুক্ত শাস্তি-প্রদানের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি। কিন্তু তুমি বোধ হয়, তা ক'র্‌তে চাও না। তোমাদের ইহা মহৎ দোষ—ভালবাসায় তোমরা কর্ত্তব্যজ্ঞান ভুলে যাও। আমরা এরূপ নাচাশয়, স্বার্থপর, তস্কর পিতাকেও আইন অনুসারে দণ্ডিত ক'র্‌তে দ্বিধা বোধ করি না। এরূপ দুষ্কার্য্যরত, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা মনুষ্যসমাজের

শত্রু। ইহাদিগকে দণ্ডিত ক'রলে পুণ্য হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, এদেশীয় সকল লোকেরই ধারণা অন্যরূপ। এক ভ্রাতার কারাবাসদণ্ড হ'লে পারিবারিক সম্মান খর্ব্ব হ'বে এই অসার ভয়ে এরা কর্ত্তব্য কাজ ক'র্‌তে ভীত হয়।

স্বর্ণকমল নতমস্তকে বিনীতভাবে বলিল, 'আপনার কথা সত্য। ফলতঃ এরূপ প্রকৃতির লোকের শাসন না হ'লে এদের অত্যাচার, স্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু নানা কারণে আমি পৈতৃক সম্পত্তির আশা ত্যাগ ক'রেছি, সুতরাং এ বিষয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি ক'র্‌তে চাই না। আপনি দয়া ক'রে একটা চাকরীর যোগাড় ক'রে দিলে, চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।'

তার পর, দু'চারি কথার পর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুলিশ-বিভাগে কার্য্য ক'রবে কি?'

স্বর্ণকমল প্রত্যুত্তরে বলিল, 'আমি কার্য্যক্ষেত্রে এই নূতন পা দিচ্ছি মাত্র। কোন্ বিভাগ ভাল, কোন্ বিভাগ মন্দ, আমি তা জানি না। আপনি দয়া ক'রে আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত ক'র্‌বেন, আমি তাই ক'র্‌ব।'

সাহেব। পুলিশ-বিভাগে কার্য্য ক'ল্লে আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি। কিন্তু প্রথম হেড্ কনেষ্টবলরূপে কার্য্য আরম্ভ ক'র্‌তে হবে। এ ভাল না লাগ্‌লে আসাম চা-বাগানে চেষ্টা ক'র্‌তে পার। আজকের কাগজে চা-বাগানে দুটি "বাবুর" প্রয়োজন ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়াছে। লালচক্ বাগানে বেতন পঞ্চাশ টাকা, উলুবন বাগানে বেতন ত্রিশ টাকা। কিন্তু লালচক্ স্থানটা কিছু অস্বাস্থ্যকর। এই উভয় বাগানের ম্যানেজার সাহেবদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমার পত্র নিয়ে গেলে উপকার হ'তে পারে। কি ক'র্‌বে, তুমি নিজে বিবেচনা ক'রে দেখ। আজ বেশ চিন্তা ক'রে দেখ, কা'ল প্রাতে আমাকে তোমার অভিমত জানালে, যা কর্ত্তব্য করা যাবে।'

. স্বর্ণকমল সাহেবকে সেলাম করিয়া বাহিরে আসিয়া দ্বারবানের নিকট হইতে ব্যাগটি লইয়া রাজপথে আসিল। তখন ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিয়া যাইতেছিল, একটা মিঠাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। একটা হোটেলে সে রাত্রিটি কাটাইয়া দিবে স্থির করিল। সহরে তাহার পরিচিত লোক অনেক ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের নিকট যাইতে তাহার লজ্জাবোধ হইল। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া একটা হোটেলে প্রবেশ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত পিরাণ ও চাদরখানি ব্যাগের উপর রাখিয়া একখানি কাষ্ঠাসনে বসিল। স্নান না করাতে তাহার মস্তক ঘুরিতেছিল, সুতরাং সেই সন্ধ্যার সময় স্নান করিবার জন্য সে ঝির নিকট জল চাহিল। ঝিকে কেহ কাজের হুকুম করিলে, হোটেল-স্বামীর বড় রাগ হইত, তাই সে ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'এই সন্ধ্যার সময় কে স্নান করবার জল এনে দেবে? এত সখ্ ক'রতে হ'লে, তার হোটেলে থাকা পোষায় না।'

স্বর্ণকমলের সংসারশিক্ষা রীতিমত আরম্ভ হইল। ব্যাপার দেখিয়া সে দিন স্নানের আশা ত্যাগ করিতে হইল। যথাসময়ে একখানা ইলিসমৎস্য ও একবাটি ঝোল দিয়া এক থালা ভাত মাখিয়া খাইয়া, হোটেলস্বামীর ভৃত্যের প্রদর্শিত একটা শয্যায় গিয়া বসিল। একতালা দালানের মেজে—স্যাঁত্-স্যাঁত্ করিতেছিল। তদুপরি সেই প্রকোষ্ঠটা অতি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধপূর্ণ। সেই গৃহের মেজেতে একটা মাদুর পাতা; মাদুরের উপর একটা অতি ক্ষুদ্র, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত বালিশ; তাহার উপর ঐরূপ গুণবিশিষ্ট, শতগ্রন্থিযুক্ত একটা ক্ষুদ্র মশারি। এই শয্যাতে স্বর্ণকমলকে সে রাত্রি কাটাইতে হইল! কিন্তু সেই প্রকোষ্ঠে, সেই মাদুর, বালিশ ও মশারির ভীষণ দুর্গন্ধে ও ছারপোকা-মশকের অত্যাচারে সারারাত্রির মধ্যে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষু বুজিতে পারিল না। সেই দিন অশ্রুজলে অনেকবার তাহার বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছিল। সারারাত্রি বসিয়া কাটাইল; পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এমন

সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল এবং হোটেলস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহার হস্তে ভোজন ও শয়নের মূল্য বাবদ মোট চৌদ্দটি পয়সা দিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত হইল। পূর্ব্ব-দিনের ক্লান্তি ও গত রজনীর অনিদ্রা-বশতঃ তাহার শরীর বড় খারাপ বোধ হইতে লাগিল; পথিমধ্যে একটা মুদীর দোকান হইতে একটি পয়সা দিয়া একটু তৈল লইয়া তাহা মস্তকে দিয়া একেবারে নদীর তীরে গেল। তখনও সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ। স্বর্ণকমল নদীর ধারে ব্যাগটি রাখিয়া স্নান করিয়া উঠিল এবং ব্যাগ হইতে একখানি ধৌত-বস্ত্র খুলিয়া পরিধান করিল। আর্দ্রবস্ত্রখানার জল যথাসাধ্য নিংড়াইয়া তাহা ব্যাগে পুরিয়া রাখিল। তার পর, পিরাণটি গায়ে দিয়া, চাদরখানা স্কন্ধে ফেলিয়া সাহেবের কুঠীতে গেল। তখন সাহেব প্রাতভোজন সমাপন করিয়াছেন মাত্র। স্বর্ণকমলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি যুক্তি স্থির ক'র্‌লে?'

স্বর্ণকমল সসম্মানে বলিল, 'পুলিশবিভাগ অপেক্ষা চা-বাগানই আমার ভাল বোধ হইতেছে। আমার জননীর ও স্ত্রীর আমি ব্যতীত আর কোন আশ্রয় নাই। সুতরাং আমাকে মধ্যে মধ্যে বাড়ী যেতে হবে, কিন্তু পুলিশবিভাগে সে সুবিধা ঘটবে না। অতএব চা-বাগানই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ব'লে বোধ হ'চ্ছে।'

সাহেব। তবে তাহাই কর। কিন্তু কোন্ বাগানে যাবে, লালচক্, না উলুবন?

স্বর্ণ। আপনি যেখানে ব'ল্‌বেন—

সাহেব। লালচকে বেতন বেশী, কিন্তু স্থানটি তেমন স্বাস্থ্যকর নহে, তাহা কল্যই ব'লেছি।

বাঙ্গালীর শরীরের প্রতি দৃষ্টি কম। তদ্ব্যতীত স্বর্ণকমলের তখন টাকার প্রয়োজন; মনে মনে ভাবিল, একটু সাবধানে থাকিলেই চলিবে। তাই বলিল, 'লালচকেই যাইতে চাই।'

'তবে যাও, কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখিও।'

বলিয়া সাহেব তাহাকে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিলেন। স্বর্ণকমল সাহেবকে সেলাম করিয়া বাহির হইল। সেই দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজে উঠিল, জাহাজ আসাম অভিমুখে চলিল, চতুর্থ দিনে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিল। তৎক্ষণাৎ একটা চাপরাসী জাহাজে উঠিয়া স্বর্ণকমলের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু এই দূরদেশে কেহ তাহার পরিচিত নহে ভাবিয়া স্বর্ণকমল তাহার কথার উত্তর দিল না। মনে ভাবিল, তাহার নামধারী অন্য কোন ব্যক্তিকে ডাকিতেছে। কিন্তু সেই চাপরাসীটা ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে দেখিয়া, অগত্যা স্বর্ণকমল সাহসে ভর করিয়া, ভাঙ্গা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ স্বর্ণকমল বাবুকে খোঁজ?'

'যিনি লালচক্-বাগানে যাবেন।'

'আমি লালচক্-বাগানে যাব।'

'আপনার নাম কি?'

'আমার নামও স্বর্ণকমল।'

'তবে আপনাকেই খুঁজিতেছিলাম।'

এই কথা বলিয়া সেই চাপরাসী স্বর্ণকমলের ব্যাগটি নিজে লইয়া বলিল, 'আপনি ভয় করিবেন না, আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য সাহেব আমাকে পাঠাইয়াছেন, আপনার জন্য ঘোড়া আসিয়াছে।'

স্বর্ণকমল অবাক্ হইয়া বলিল, 'তোমাদের সাহেব আমার পরিচয় জান্‌লেন কিরূপে? আর, আমি যে আজকার জাহাজে আস্‌ব, তাই বা তিনি কি প্রকারে জান্‌লেন?'

'ইউল সাহেব টেলিগ্রাফ ক'রেছেন, আপনার কাজে গতকল্য এক-জন বাবু নিযুক্ত হ'তেন, কিন্তু ইউল-সাহেবের টেলিগ্রাফ পেয়ে সাহেব তাকে নিযুক্ত করেন নাই।'

ইউল সাহেবের অনুগ্রহ ভাবিয়া স্বর্ণকমলের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত

হইল। তাহার চক্ষে এক ফোঁটা জল বাহির হইল। মনে মনে সাহেবকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে করিতে ঘোড়ায় চড়িয়া বাগানের দিকে চলিল। স্বর্ণকমল খুব ভালরূপ ঘোড়ায় চড়িতে পারিত না। ধীরে ধীরে কোন প্রকারে বাগানে পৌঁছিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিল। সাহেব তাহাকে বাগানের প্রধান কর্ম্মচারী করিয়া দিলেন। স্বর্ণকমলের পত্রে চাকরীর সংবাদ অবগত হইয়া বৃদ্ধা জননী ও ভার্য্যা সুকুমারী পরমানন্দিতা হইলেন। রামকমল, কৃষ্ণকমল, মহামায়া ও মুক্তকেশীর গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইল। রামকমল মহামায়ার নিকট বলিল, 'চাকুরী নিশ্চয়ই হয় নাই, হ'য়ে থাক্‌লে বেতন দশ পনর টাকার অধিক নয়; মান বাড়াইবার জন্য পঞ্চাশ টাকা লেখা হ'য়েছে।'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রাগ বাড়িল

যথাসময়ে স্বর্ণকমলের অতি সুন্দর একটি পুত্র জন্মিল। সুকুমারী ও তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। প্রতিবেশিগণ পুত্র দেখিয়া শিশুর রূপের প্রশংসা করিল, স্বর্ণকমলের ক্ষমাগুণ ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিল, ও ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গল-কামনা করিল। কেহ কেহ রামকমল ও কৃষ্ণকমলের ঘৃণিত চরিত্রের নিন্দা করিতেও ছাড়িল না। মহামায়া ও মুক্তকেশী পাড়াপ্রতিবেশীর উচিত কথা শুনিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের উপর সে রাগ মিটাইতে না পারিয়া, শাশুড়ী, ছোট-বৌ ও নবজাত সুন্দর শিশুর উপর তাহাদের ক্রোধ হইল। তাহাদিগকে গালাগালি করিয়া, শিশুটিকে 'বাঁদরমুখো ছেলে' বলিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিতে লাগিল।

স্বর্ণকমল বাড়ী হইতে যাইবার সময়, মাতা ও ভার্য্যাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গিয়াছিল, 'আমার একটা অনুরোধ, তোমরা উহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিও না; উহারা গালাগালি করিলেও তাহাতে কাণ দিও না, অভিসম্পাত করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিবে, তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে ভগবানের দিকে চাহিয়া তাহা সহ্য করিবে।'

বৃদ্ধা ও সুকুমারী এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন। সুতরাং রামকমল, কৃষ্ণকমল, মহামায়া বা মুক্তকেশী তাঁহাদিগকে নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে মর্ম্ম-পীড়াদায়ক কথা বলিলেও, তাঁহারা অশ্রুপাত করিতেন, কিন্তু কোন কথা বলিতেন না। ইহাতে মহামায়া ও মুক্তকেশীর ঝগড়া করিবার প্রবল ইচ্ছা অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যাইত। একদিন মহামায়া, সুকুমারী ও বৃদ্ধাকে শুনাইয়া বড় গলায় বলিল, 'এমন বাঁদরমুখো ছেলেও যদি সুন্দর হয়, তবে কুৎসিত কে? পাড়ার চোক্‌খাকী মাগীরা আবার এই বাঁদরেরই প্রশংসা করে!—মরণ আর কি! আমার পেটে এমন ছেলে হ'লে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তাম।'

সুকুমারী তদুত্তরে কাঁদিয়া বলিল, 'কি ক'র্‌ব দিদি! ভগবান্ যা দিয়েছেন, তাই ভাল। বাঁদরমুখো ব'লে ত আর ফেলে দিতে পারি না!

মহামায়ার কথা বৃদ্ধা কৃপাময়ীর সহ্য হইল না। তিনি সর্ব্বপ্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু নবনীত-সদৃশ কোমল শিশুটীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কথা বলায় তাঁহার অদমনীয় ক্রোধ উপস্থিত হইল, তিনি বড়-বৌকে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, 'দেখ্, বড়-বৌ! অত দেমাক্ করিস্ না; ওপরে ভগবান্, নীচে পৃথিবী আছে; এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠে; এখনও ধর্ম্ম আছে। এত বাড়াবাড়ি ক'র্‌লে হরিঠাকুর কখনও ভাল ক'র্‌বেন না। এমন ক'রে রোজ রোজ রকে জ্বালালে শেষে নিজেকে জ্ব'লে পুড়ে মর্‌তে হ'বে।'

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অশ্রুজল গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া বক্ষে পড়িতে লাগিল।

সেই দিন রজনীতে মহামায়া বালক-বালিকাদিগকে একটু শীঘ্র নিদ্রিত করিয়া স্বামীর নিকট রাগত-স্বরে বলিল, 'আর আমার সহ্য হয় না; এর কিছু কত্তে পার কর, নইলে আমার এ বাড়ীতে থাকা হবে না।'

রাম। তোমাকে একটা নূতন বাড়ী ক'রে দিতে হবে নাকি?

মহা। সকল সময় ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। পাড়ার মাগীদের কথায় আমার গা দগ্ধে যায়। তুমি নাকি হাজার হাজার টাকা চুরি ক'রেছ, ভাইদের ঠকিয়েছ, ছোটঠাকুরপোকে দেশত্যাগী ক'রেছ—

রাম। ক'রেছি ত বেশ ক'রেছি—আবার ক'র্‌ব, বেশ ক'র্‌ব শত্রুকে নির্য্যাতন ক'র্‌ব না ত ক'র্‌ব কাকে?

মহা। তোমার ঐ মুখেই সব। নির্য্যাতন ত ভারি ক'রেছ আর, কি? ঠাকুরপো বিদেশে গিয়েছে, ক্ষেমতা ক'রে চাকরী ক'রেছে। লোকে ধন্যি ধন্যি ক'চ্ছে। সবাই বলে, 'স্বর্ণকমল বুদ্ধিমান্, লেখা-পড়া জানে। ভাই দুটো মুখ্যু ব'লে ইচ্ছা ক'রে, স্বর্ণকমল তাদের সব দিয়ে গেছে! তার ভাবনা কি? যেই ঘরের বের হ'য়েছে, অমনি সাহেব মস্ত চাকরী দিয়েছে। আর দেখ দেখি, এই ক'মাসই বা চাকরী হ'য়েছে, এরি মধ্যে কত টাকা পাঠিয়েছে! সে দিনও চল্লিশ টাকা এসেছে। লোহার সিন্দুক টাকায় পুরে গেল যে!'

রাম। মুখ্যুই হই, আর যাই হই, আমি চেষ্টা ক'ল্লে এক দিনে এই চাকরী-টাকরী উড়িয়ে দিতে পারি।

মহা। আর ব'কো না—ক্ষেমতা ঢের দেখেছি!

তার পর গলা ভার করিয়া কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার মায়ের কথা আর আমার সহ্য হয় না। আজ আমি ওদের ছেলেটাকে একটু দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, তাই আমায় কি না গালাগালি

দিতে লাগ্‌লো। আর আমাদের জ্বালায় নাকি ওদের শশা, কলা, কুমড়া কিছুই গাছে থাক্‌তে পায় না। একশ লোকের মাঝে এ কথা বল্লে।’

সত্য-সত্যই রামকমল ও মহামায়ার উপদেশ শিক্ষানুসারে নবলক্ষ্মী ও নন্দগোপাল ছোট-বৌর গাছের শশা, কলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইত। রৌদ্রের কাপড়গুলি পিণ্ডাকার করিয়া পুকুরের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিত। কিন্তু সুকুমারী জানিয়া শুনিয়াও একদিন তাহাদিগকে কিছু বলিত না। বরং মঙ্গলা ও ভজহরি, কিছু বলিলে, সুকুমারী তাহাদিগকে বলিত, ‘ওরাই ত আমার সব। ওদের কেউ কিছু ব’লো না।’

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, পৃথগন্ন হইবার সময় মঙ্গলা ও ভজহরি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বর্ণকমলের সংসারেই গিয়াছিল।

এ সব কথায় বিশেষ ফল হইল না দেখিয়া, মহামায়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া একটু সখের কান্না কাঁদিয়া বলিল, ‘তোমাকে রোজ রোজ চোর মুখ্যু নানা কথা ব’ল্লে আমার তা সহ্য হয় না। কেন—তুমি কি এ বাড়ীর কেউ না? এত কথা বল্‌বার ওরা কে?’

মহামায়ার পতি-ভক্তিতে রামকমলের হৃদয় গলিয়া গেল। নিজের স্বভাব মনে করিয়া মনে মনে সে একটু লজ্জিত হইল। স্বর্ণকমল ও সুকুমারীর কোন দোষ নাই, ইহা সে মনে মনে বুঝিল। কিন্তু তবুও তাহাদের উপর ও জননীর উপর তাহার আরও ক্রোধ জন্মিল। স্বর্ণকমলের স্বভাব ভাল বলিয়াই ত লোকে রামকমলকে নিন্দা করে, স্বর্ণকমল ইংরাজী জানে বলিয়াই ত লোকে রামকমলকে মূর্খ ভাবে, স্বর্ণকমল বিদেশে গিয়াছে বলিয়াই ত তাহার সহিত লোকের এত সহানুভূতি, আর ছোট-বৌ পাড়াপ্রতিবেশীর উপকার করে বলিয়াই ত সকলে তাহার প্রশংসা করে, আর বড়-বৌর নিন্দা করে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকমল স্থির করিল যে, যতদিন ইহারা জীবিত থাকিবে, তত দিন

রামকমলের সুখ হইবে না, তত দিন সকলেই স্বর্ণকমল ও ছোট-বৌর গুণগান করিবে, আর রামকমল ও মহামায়ার নিন্দা করিবে। আর স্বর্ণকমলের চাকরী হইয়াছে, হয় ত সে শীঘ্রই অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়া ফেলিবে—অনেক সৎকার্য্য করিবে। তাহা হইলে ত এখন রামকমলের যে যৎকিঞ্চিৎ ধনগৌরব আছে, তাহাও থাকিবে না: ভাবিতে ভাবিতে রামকমলের অন্তঃকরণ হিংসাপূর্ণ হইয়া উঠিল। হিংসা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইল। সেই ক্রোধ-শান্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে মহামায়াকে বলিল, 'পাড়ার হিংসুটে মাগীগুলো আর বেটারা যাই বলুক, আমি ওদের ভিটেয় ঘুঘু চরাব, তবে ছাড়্‌ব।'

মহামায়া স্বামীর স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া মনে মনে আনন্দিতা হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

জাল উইল ও বুদ্ধি স্থির

পিতার লৌহসিন্দুক হইতে রামকমল খতগুলি চুরি করিয়াছিল, তাহা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। কয়েক মাস পরে সে প্রত্যেক খতের দায়িককে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, 'তোমার নিকট আমাদের সুদসহ অনেক টাকা পাওনা হ'য়েছে, এই খত দেখ। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ন্যায্য টাকার অর্দ্ধেক দাও, তবে আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে খতখানা ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারি। কিন্তু এই কার্য্য গোপনে ক'র্‌তে হবে। কেউ যেন টের না পায়।'

রামকমলের এই প্রস্তাবে প্রায় সকল দায়িক স্বীকৃত হইল এবং কেহ অর্দ্ধেক, কেহ এক তৃতীয়াংশ টাকা প্রদান করিয়া খত ফিরাইয়া পাইল। কেবল এক ব্যক্তি বলিল, 'আমি তা পার্‌ব না। আমার ন্যায্য দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ না ক'র্‌লে নরকগামী হ'তে হ'বে। আপনাদের

তিন ভ্রাতার সাক্ষাতে সমস্ত টাকা বুঝিয়ে দিব—গোপনে কিছু দিব না।' যাহা হউক, এই প্রকারে রামকমলের প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা প্রাপ্তি হইল। কৃষ্ণকমলকে সে অবশ্যই ইহার অংশ প্রদান করিল না। মূর্খ কৃষ্ণকমল বাড়ীতে থাকিয়াও ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। সোণারূপার গহনাগুলিও রামকমলের হইল। যাহারা উহা বন্ধক রাখিয়াছিল, উহা চুরি হইয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহারা আর টাকাও দিতে আসিল না, গহনাও ফিরাইয়া পাইল না। মহামায়ার আনন্দের সীমা রহিল না।

ইহার পর পৈতৃক তালুকের উপর রামকমলের দৃষ্টি পড়িল। এই তালুকের বার্ষিক আয় প্রায় সাত আট শত টাকা। সদর রাজস্বও অত্যন্ত কম, প্রায় কিছুই না বলিলেও হয়। প্রজাগুলি বেশ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং কখনও খাজনা বাকি পড়ে না। তালুকখানা নিজ গ্রামেই—সুতরাং তহশীলের খুব সুবিধা। রামকমলের ইহার প্রতি লোভ হইল। কিন্তু পৈতৃক তালুক ত আর নগদ টাকা নহে—সুতরাং ইহা হজম করা যে কষ্টসাধ্য, রামকমল ইহা বুঝিতে পারিল। মোহনগঞ্জ মহকুমায় রামকমলের এক শালা মোক্তারী করিত; রামকমল মহকুমায় যাইয়া তাহার সহিত পরামর্শ আঁটিয়া আসিল। তার পর, একখানা পুরাতন কাগজে তাহার পিতার নামের এক কৃত্রিম উইল প্রস্তুত করাইল। তাহাতে লেখা হইল যে, রামকমল ভূ-সম্পত্তি সমস্ত পাইবে। আর কৃষ্ণকমল ও স্বর্ণকমল প্রত্যেকে নগদ সম্পত্তির অৰ্দ্ধেক পাইবে। রামকমল ভূসম্পত্তি পাইল বলিয়া নগদ কিছুই পাইবে না। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পিতার মৃত্যু-তারিখে রামকমল টাকা-কড়ি ও গহনা-পত্রের সঙ্গে ৺কালীকান্ত রায়ের নামাঙ্কিত পিতলের মোহরটিও চুরি করিয়াছিল। আজ সে সেই মোহরটি খুলিল এবং তৈল-কালী প্রস্তুত করিয়া কৃত্রিম উইলে মোহর অঙ্কিত করিল। মোহরের ছাপার উপরে কালীকান্ত রায়ের নাম জাল করা হইল। সেই উইলে রামকমলের শালা রাইমোহন ও গ্রামের আর

তিন জন দুষ্ট লোক সাক্ষী হইল। উইলখানা একটু পুরাতন না হইলে বাহির করা সঙ্গত নহে বিবেচনায় রামকমল সম্প্রতি তাহা লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু মুখে প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহার পিতা তাহাকে উইল করিয়া সমস্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর রামকমলের একটু ভয় হইল। সে মনে ভাবিল—'স্বর্ণ-কমল, ছোট-বৌ এবং তাহাদের পুত্রটি বাঁচিয়া থাকিতে সে সম্পত্তি দাবি করিলে কিংবা উইলের মোকদ্দমা উঠিলে, গ্রামের সকল লোকেই স্বর্ণ-কমলের পক্ষ অবলম্বন করিবে। সুতরাং উইলখানা সত্য প্রমাণ করা সহজসাধ্য হইবে না। জাল উইল প্রস্তুত করা অপরাধে বিপন্ন হওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। এই অবস্থায় তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা উচিত। আর শত্রুবধে দোষই বা কি? ইহাদিগকে বধ করিতে পারিলে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সকলেই তাহার কথা শুনিবে। তবে তাহাই উচিত। ঘরে অগ্নি প্রদান করিলেই একসঙ্গে তিনজন শেষ হইবে। তার পর, স্বর্ণকমল কি আর ফিরিয়া আসিবে না—ভাবনা কি, একটা পথ হইবেই হইবে।

কৃষ্ণকমলের জন্য সে তত চিন্তা করিল না! রামকমল জানিত যে, কৃষ্ণকমলের প্রয়োজনমত সংসার-খরচের জন্য দুই একটি টাকা দিলেই সে নীরব থাকিবে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

রামকমলের পাশব-অত্যাচার

রামকমল গ্রামের কাহারও সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে না—যেন সকলেই তাহার চিরশত্রু। তাহার বাক্সে টাকা আছে, উদরান্নের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। এজন্য তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় গর্ব্বে পূর্ণ! সে কথায় কথায় লোকের

মর্ম্মে পীড়া প্রদান করে, বিনা কারণে কুৎসিত গালাগালি করে, কাহারও সম্মান রক্ষা করিয়া চলে না—কথায় কথায় বলে, 'আমি কোন ব্যাটার তোয়াক্কা রাখি না।' দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে তাহার হৃদয়ে একটুও কষ্টবোধ হয় না। পৃথগন্ন হইবার পর টাকা ধার দেওয়াই তাহার প্রধান ব্যবসা হইল। কিন্তু সামান্য সুদ তাহার নিকটে যথেষ্ট বোধ হয় না। এজন্য সে নিরক্ষর লোকের নামে কৃত্রিম খত প্রস্তুত করিয়া নালিশ করে এবং ডিক্রী পাইলে, ডিক্রীজারি করিয়া টাকা আদায় করে। যাহার প্রতি কোন কারণে তাহার একটু রাগের সৃষ্টি হয়, নানারূপ অত্যাচার, মিথ্যা ব্যবহার বা অসদুপায় দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে সে দ্বিধা বোধ করে না। তাহার হৃদয় হইতে ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান একেবারে পলায়ন করিল। এইরূপ নানা কারণে রামকমলের শত্রু-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যতই তাহার শত্রু-বৃদ্ধি হয়, যতই সাধারণে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিল, ততই স্বর্ণকমল, ছোট-বৌ ও বৃদ্ধা জননীর প্রতি তাহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। এই সময় স্বর্ণকমল দুই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিল। সাহেব তাহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বাড়ী আসিবার সময় তাহাকে দুই শত টাকা পুরস্কার দিয়া বলিয়া দিলেন, 'ছুটীর পর হইতে তোমার বেতন একশত টাকা হইবে।'

রামকমল এ সকল সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ভীত ও মর্ম্মপীড়িত হইল। তাহার প্রথম পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিলেও বোধ হয় তাহার এত কষ্ট হইত না। স্বর্ণকমল প্রায় এক বৎসরের পর বাড়ী আসিয়াছে। লালচকের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহকালমধ্যেই তাহার শরীর ভাল বোধ হইতে লাগিল। এই এক বৎসরে পারিবারিক ব্যয় বাদে প্রায় পাঁচশত টাকা জমিল। বেতনও বৃদ্ধি হইল। ইহাতে স্বর্ণকমলের সাহস হইল এবং জননী ও ভার্য্যার অনুরোধে ইষ্টকালয়টি

সম্পূর্ণ করিবার জন্য, ইট্, সুরকী ও চূণ আনাইয়া রাখিল। মনে মনে ভাবিল, আবার কয়েক মাস কাজ করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া পুনরায় দুই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিবে এবং কড়ি ও বরগা আনাইয়া ইষ্টকালয়টি বাসোপযোগী করিয়া জননী ও ভার্য্যার কষ্ট দূর করিবে। এ দিকে মাতার অনুরোধে পুত্রের জন্য একগাছি সোণার হার গড়াইয়া দিল। লোকে দশমুখে স্বর্ণকমলের প্রশংসা করিতে লাগিল। কয়েক দিনের জন্য সুকুমারী ও জননীর সকল কষ্ট দূর হইল। সুকুমারী পুনরায় গর্ভবতী হইল।

রামকমল ও মহামায়া ইট্, সুরকী, চূণ ও সোণার হার দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল। মহামায়া একদিন রামকমলকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'কৈ, তুমি না ওদের ভিটেয় ঘুঘু চরাবে? আর দু'বছর ছোট-ঠাকুরপোর চাকৃরী থাকৃলে, হয় ত তোমার ভিটাতেই ঘুঘু চ'র্‌বে। দেখ্‌চ ত ইট্ সুরকী চূণ কত এয়েছে? হাজার হউক, ওরা লেখা-পড়া শিখেছে—তোমাদের মত ত নয়! তুমি দশ টাকা মাইনের চাকরী ব'লেই উড়িয়ে দিয়েছিলে।'

মহামায়ার প্রত্যেক কথায় রামকমলের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। এবার স্বর্ণকমল কার্য্যস্থলে যাওয়া মাত্রই একটা কিছু করিবে স্থির করিল। স্বর্ণকমল বাড়ী হইতে যাইবার সময় পূর্ব্ববৎ জননী ও ভার্য্যাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া চলিল। বৃদ্ধা জননীর হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল—তিনি অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামকমল ও মহামায়া স্বর্ণকমলের মৃত্যু-কামনা করিল। কৃষ্ণকমল আশীর্ব্বাদ বা অভিসম্পাত কিছুই করিল না। মুক্তকেশী মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সুকুমারীর কষ্ট দেখিয়া মুক্তকেশীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নিজ স্বামীর মূর্খতাবশতঃ মুক্তকেশীর সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। এজন্য তাহাকে

মধ্যে মধ্যে খুব কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সুতরাং সে এখন ব্যথীর বেদনা বুঝিতে শিখিয়াছে। তাই সে আশীর্ব্বাদ করিল। আর তাহার স্বামী, ভাসুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া যে ভাল কাজ করে নাই, ক্রমে ক্রমে এ ধারণাও মুক্তকেশীর হৃদয়ে স্থান পাইতে লাগিল।

স্বর্ণকমল যে দিন চলিয়া গেল, তাহার পরদিন রাত্রে রামকমল একটি অতি ঘৃণিত ও পাশব কার্য্য করিল। রজনী দ্বিপ্রহর, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সুকুমারী ও বৃদ্ধা পুত্রটিকে লইয়া এক শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে; এমন সময় রামকমল সেই চৌ-চালা গৃহের খোলা বারান্দায় ধীরে ধীরে পা টিপিয়া উঠিল; এবং একটু এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া (পাঠক-পাঠিকাগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন) সেই গৃহ হইতে বহির্গমনের দরজার সম্মুখে মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার বৃদ্ধা জননী গৃহবহির্গত হইবার সময় সেই মলমূত্র মাড়াইলেন। আহা! বৃদ্ধা দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন, আপনার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিলেন এবং অবশেষে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন, 'যে আমাকে এইরূপে জ্বালাচ্ছে, মধুসূদন অবশ্যই তাকে শাস্তি দিবেন—সংবৎসরের মধ্যে তার ফলভোগ কর্‌তে হ'বে।

এই বলিয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন। বৃদ্ধার ন্যায় মঙ্গলাও উদ্দেশে অভিসম্পাত করিতে করিতে স্থানটা পরিষ্কার করিয়া, গোময় দ্বারা উহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিল।

রামকমল ঝগড়ার সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল; সুতরাং জননী ও মঙ্গলা দাসীর কথা শুনিয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, 'দেখ মা! এ ছেলে-পিলের সংসার। তুমি ভোরের বেলা অমনতর ক'রে শাপ দেবে, তবে তোমার গলা টিপে বাড়ী থেকে বের্ ক'রে দিব।'

বৃদ্ধা জননী কাঁদিয়া বলিল, 'আমি ত বাছা তোমাদের কিছু বলি নাই—তুমি ত আর এ কাজ কর নাই। গলা টিপে দিয়ে যদি সুখী হও, তবে

তাই কর। যদি দশমাস দশদিন উদরে ধ'রে থাকি, তবে ভগবান্ অবশ্যই তার বিচার ক'র্‌বেন।'

পাষণ্ড রামকমল গর্জ্জিয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, তোর আস্পর্দ্ধা বড় বেড়ে গেছে—নয়? তুই ফের শাপ দিতে লাগ্‌লি? বের হ বাড়ী থেকে,—হারামজাদি!'

এই বলিয়া রামকমল সত্য-সত্যই একখানি যষ্টি লইয়া মাকে তাড়িয়া মারিতে গেল।

'স্বর্ণকমল! বাপ আমার' বলিয়া বৃথা কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'কেঁদ না মা, কেঁদে আর কি হবে? এ সব অদৃষ্টের ভোগ।'

বৃদ্ধার ক্রন্দনে পাড়ার লোকজন একত্র হইল। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, 'আর কাঁদছ কেন মা! তোমার সোণার ছেলে স্বর্ণকমল বেঁচে থাক্‌লে তোমার সকল কষ্ট দূর হবে। এখন একটু স্থির হও।'

মহামায়া এই প্রতিবেশিনীর কথার উত্তরে বলিল, 'ও কাঁদ্‌বে বৈ কি? ওর সাধের ছেলে স্বর্ণকমলকে যে যমে নিয়েছে—হতভাগী, লক্ষ্মীছাড়ী!

মহামায়া পুনঃ পুনঃ এ কথা বলিতে লাগিল। বৃদ্ধা ও সুকুমারী কাঁদিতে লাগিল। মায়ের কান্না দেখিয়া কোলের শিশুটি কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী মহামায়াকে বলিল, 'ছি! এ তোমার বড় অন্যায়। এমন ক'রে মানুষের মনে কষ্ট দিলে ভগবান্ কখনই তার মঙ্গল করেন না।'

মহামায়া ও রামকমল প্রতিবেশিনীকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। তার পর রামকমল মঙ্গলা-দাসীর উপর রক্তচক্ষু হইল। মঙ্গলা অনেক দিন অনেক সহিয়াছে, কিন্তু আজ আর সহ্য করিতে পারিল না। রামকমল তাহাকে তাড়া করিয়া গেল দেখিয়া, সে যে ঝাঁটা দ্বারা উঠান ঝাঁট দিতেছিল, তাহা লইয়া দাঁড়াইল! রামকমল দ্রুতবেগে যাইয়া যষ্টি দ্বারা মঙ্গলার

পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে লাগিল। মঙ্গলাও আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই শতমুখী দ্বারা সজোরে রামকমলের মস্তকে, মুখে ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। তারপর মঙ্গলা কাহারও বারণ না শুনিয়া আর কাল-বিলম্ব না করিয়া মহকুমায় যাইয়া ডেপুটী বাবুর নিকট রামকমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল, মৌখিক এজাহারে সকল কথা বলিল। সেও যে আত্মরক্ষার জন্য শতমুখী প্রহার করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাও গোপন করিল না। মঙ্গলার ক্রন্দন ও সরলতা দেখিয়া ডেপুটী বাবুর ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। রামকমলের বিরুদ্ধে শমন জারি হইল, কিন্তু সে হাজির হইল না। অতঃপর ওয়ারেণ্ট বাহির হইল, পুলিশের লোক রামকমলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল, বহুচেষ্টায় রাম-কমল জামিনে খালাস হইল। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া মহকুমার ভাল ভাল উকীল, মোক্তার নিযুক্ত করিল—অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া জবাব দিল। কিন্তু ডেপুটী বাবু তাহার ও তাহার সাক্ষীর কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'মঙ্গলা বলিতেছে যে, সে আত্মরক্ষার জন্য রাম-কমলকে ঝাঁটার বাড়ি মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সরলতাপূর্ণ কথাটি আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, একটা ঘটনা না হইলে মঙ্গলার ঝাঁটার বাড়ি মারিবার কোন কারণ হইত না। অতএব ঘটনা সত্য। একটা ভদ্রলোকের এরূপ জঘন্য ব্যবহার অমার্জ্জনীয়: আমি আসামীর পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড করিলাম—তাহা না দিলে, আসামীকে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই টাকা আদায় হইলে তাহা হইতে মঙ্গলা এক শত টাকা পাইবে।'

রামকমলের এই অপমানে গ্রামের কোন লোকই দুঃখিত হইল না। মঙ্গলা একশত টাকা লইয়া পরমানন্দে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহদাহ

প্রজ্বলিত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। রামকমল আর স্থির থাকিতে পারিল না। অর্থদণ্ড দিয়া আসিয়া রামকমল গৃহদাহ, নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা প্রভৃতি কত প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু কল্পনাগুলি তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, আপনাকে শতপ্রকার ধিক্কার করিতে লাগিল। রণপটু সেনাপতি যেরূপ যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনা ও উৎসাহে তন্ময় হয়, রামকমলের তখন সেইরূপ অবস্থা। কেবল কল্পনা তাহার আর ভাল লাগে না—সত্য সত্যই কিছু করা চাই। মোকদ্দমা হারিয়া আসিয়া সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সাত দিনের মধ্যে একটা কিছু অবশ্যই করিবে, কিন্তু আজ দশ দিন চলিয়া যাইতেছে, তবুও কিছু করা হইল না। পূর্ব্বেও এরূপ কতবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, কিন্তু একবারও তাহা রক্ষিত হয় নাই। এইরূপ নানা চিন্তায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

গঙ্গাতীর গ্রামে তুফানী মোল্লা সুপরিচিত লাঠিয়াল! দাঙ্গাহাঙ্গামা, চুরি ইত্যাদি অভিযোগে তুফানী চারিবার কারাবাসদণ্ড ভোগ করিয়াছে, প্রমাণাভাবে সাত আট বার অব্যাহতিও পাইয়াছে। রামকমল দুইটি টাকা ট্যাঁকে গুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় তুফানীর বাড়ী গেল। তুফানীর বাড়ীতে দুইখানি মাত্র কুঁড়ে ঘর, তন্মধ্যে একখানি 'সদর' একখানি 'অন্দর'। তুফানী এই 'সদর' 'অন্দরে'র মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কার্য্য করে। রামকমল সদর-ঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিল, 'তুফানী সর্দ্দার, বাড়ী আছ?'

তুফানী তখন 'অন্দরে' ভাত খাইতেছিল। সেখান হইতে মস্তক বাহির করিয়া বলিল, 'কে তুমি?'

'এলেই চিন্‌তে পার্‌বে এখুন!'

তুফানী গলার স্বরে রামকমলকে চিনিতে পারিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আপনি! সদর ঘরের বারান্দায় বসুন, আমি যাচ্ছি।'

বলা বাহুল্য, সদর-ঘরের বারান্দায় বসিবার কোন আসন ছিল না। রামকমল প্রাঙ্গণে পাইচারী করিতে লাগিল। তুফানী ক্ষিপ্রহস্তে ভোজন-ব্যাপার সম্পাদন করিয়া আসিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, কি মনে ক'রে? যদি গরীবের বাড়ী মেহেরবাণী ক'রে এলেন, তবে একটু বসুন।'

কিন্তু তাহার বসিবার কোন আসন ছিল না।

রাম। না, বসাবসির প্রয়োজন নাই, এই টাকা দুটি নাও, ছেলে-পিলেদের জলখাবার কিনে দাও। আর আমার সঙ্গে এস, একটা কথা আছে।

তুফানী আহ্লাদ-সহকারে টাকা লইয়া 'অন্দরে' গিয়া তাহা তাহার বিবির হস্তে প্রদান করিয়া রামকমলের সঙ্গে চলিল। দুই পার্শ্বে লোকালয়, তাহার মধ্য দিয়া গ্রাম্যপথ। এই স্থানটুকু রামকমল ও তুফানী নিঃশব্দে অতিক্রম করিল। একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়া রামকমল তুফানীকে চুপি চুপি বলিল, 'একটা কাজ ক'ত্তে পার?'

তুফানীও ফুসফুস্ করিয়া উত্তর দিল, 'কি কাজ?'

রাম। এ কাজ তোমায় ক'র্ত্তেই হবে।

তুফানী। কি কাজ বলুন।

রাম। ক'র্‌বে বল?

তুফানী। আপনার কাজ ক'র্‌ব বৈ কি?—কাজটা কি?

রাম। তবে শোন—কিন্তু তোমায় খোদার দোহাই, এ কাজ ক'র্ত্তেই হবে। আর কেউ যেন এর কিছু জান্‌তে না পারে।

তুফানী। তার জন্য আর ভাবনা কি?—বলুন না, কি?

রামকমল। আপনার দুই হস্ত তুফানীর স্কন্ধের উপর দিয়া তাহার

কাণে কাণে কয়েকটি কথা বলিল। তুফানী তাহা শুনিয়া চমকিয়া বলিল,— 'বাপ্ রে! এ কাজ ত আমি কখনো করি নাই!'

রামকমল তাহার দুই হস্ত ধরিয়া বলিল, 'দেখ সর্দ্দার ভাই! এ কাজ তোমায় ক'র্ত্তেই হ'বে।'

তুফানী সে কথার কোন উত্তর প্রদান করিল না; রামকমল তাহার অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া বলিল,'তোমার নিকট আমার পঁচিশ টাকা পাওনা আছে। সুদও বার তের টাকা বাকি। এ পর্য্যন্ত একটি পয়সাও দাও নাই। তুমি আমার এ কাজ ক'রে দাও, আমি তাহার একটি পয়সাও চাইনে। তোমাকে আরও কিছু বক্‌সিস্ দেব।'

খতের টাকা দিতে হইবে না বলিয়া, তুফানী সর্দ্দার বড় একটা লাভ মনে করিল না। কারণ, এই ঋণ যে পরিশোধ করিবে না, ঋণ-গ্রহণের সময়ই সে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু নগদ বক্‌সিসের লোভটা সে ছাড়িতে পারিল না।

তুফানী। আপনি সঙ্গে থাকিয়া দেখাইয়া দিবেন।

রামকমল চিন্তা করিয়া বলিল, 'আমি সঙ্গে না থাক্‌লে পার্‌বে না?'

তুফানী। আজ্ঞে না—আমি এ কাজ কখনও করি নাই।

রাম। তবে যে ক'রেই হউক, থাক্‌ব।

রামকমল তুফানীকে লইয়া নিজ গৃহের দিকে চলিল। তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। রামকমল তুফানীকে নিজ বাড়ীসংলগ্ন একটা নিবিড় বাগানে একটা বৃক্ষের অন্তরালে বসাইয়া গৃহে যাইয়া স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিল, নিজে তাহা সেবন করিতে করিতে, কল্কেটি তুফানীর হস্তে দিল। তুফানী হস্তের দ্বারা হুকার কার্য্য করিয়া তামাক খাইল।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, সুতরাং পৃথিবী গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। তুফানী সর্দ্দার ও রামকমল অতি নিকটস্থ হইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কত কথা

কহিতেছে, কিন্তু সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। প্রত্যেক বৃক্ষপত্রের পতনশব্দে তাহারা চমকিয়া উঠিতেছে—বৃক্ষোপরিস্থ পক্ষিগণের পক্ষবাজনশব্দে ভীত হইতেছে। মশককুল মহাসমারোহে নিমন্ত্রণভোজনে নিযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু শব্দ হইবে ভয়ে তাহারা মশা তাড়াইতে পারিতেছে না। এইরূপে রজনী সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। রামকমল একখণ্ড বাঁশ, দুইটা টাকা, একটা আগুনের হাঁড়ি, এক আঁটি শুষ্ক খড় ও একটা দড়ি আনিয়া রাখিয়াছিল। তুফানী খড়গুলি একত্র করিয়া দড়ি দিয়া উহা বাঁশের অগ্রভাগে বাঁধিল। উভয়ে সেই চৌচালা-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে গেল। তখন সকলে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত—কোনরূপ সাড়াশব্দ নাই, রামকমল তুফানীর কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'বাহিরের দিকে ঘরের দরজা দুটা বেঁধে রাখ—যেন ঘরের বাহির না হ'তে পারে।'

তুফানী তাহা করিতে ভয় পাইল। রামকমল অগত্যা নিজ হস্তে সে কাজ করিল। তখন পূর্ব্বদিকে সোণার থালার ন্যায় চন্দ্র উঠিতেছে দেখা গেল। রামকমল তুফানীর নিকটস্থ হইয়া ব্যস্ততাসহকারে হস্ত নাড়িয়া, ইঙ্গিতে বলিল,—'শীঘ্র কর।'

তুফানী-সর্দ্দার হাঁড়ির আগুনে টাকা জ্বালিয়া খড়ের পাঁজার মধ্যে তাহা গুঁজিয়া ফুৎকার দিতে লাগিল। প্রতি ফুৎকারে তাহার মুখ আলোকিত হইতে লাগিল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিল। রামকমল পুনরায় নিকটে গিয়া বলিল, 'ভয় কি?—শীঘ্র কর।'

তুফানী ভয়বিহ্বল হইয়া অগত্যা কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁশটা উঁচু করিয়া সেই চৌচালা-গৃহের চালার এক কোণে অগ্নি প্রদান করিল। রামকমল নিজগৃহের দরজায় দাঁড়াইল। তুফানী ভীত হইয়া বাঁশটা তথায় ফেলিয়া রাখিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তাহার পায়ের ও বাঁশ-পতনের শব্দে মঙ্গলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বলিল, 'কে ও?'

কোন উত্তর না পাইয়া 'চোর চোর' শব্দে বিকট চীৎকার করিয়া মঙ্গলা বাহিরে আসিল; তাহার চীৎকারে ভজহরিও বাহিরে আসিল, হুহু শব্দে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত চালায় অগ্নি বিস্তৃত হইল। তাহা দেখিয়া ভজহরি ও মঙ্গলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চীৎকার করিয়া গিন্নী ঠাকুরাণী ও ছোটবৌকে ডাকিতে লাগিল। চীৎকারে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, ভয়ে সকলে উঠিয়া বসিলেন। গিন্নী কৃপাময়ী ব্যস্ততাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হ'য়েছে মঙ্গলা?'

'সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! শীঘ্র দরজা খুলুন।' বিপদে বুদ্ধিলোপ হয়। এ অবস্থায়ও তাহাই হইল। বাহিরে মঙ্গলা ও ভজহরি চীৎকার করিতেছে, আর গৃহের অভ্যন্তরে বৃদ্ধা ও সুকুমারী দরজা খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেক চেষ্টার পর দরজা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অনেক টানাটানি করিয়াও কেহ তাহা খুলিতে পারিল না। বৃদ্ধা ও সুকুমারী চীৎকার করিয়া এ কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরের ও ভিতরের চীৎকার মিশিয়া গেল—কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইতেছে না, অথচ সকলেই চীৎকার করিতেছে। আগুন তখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; মঙ্গলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; বৃদ্ধা ও সুকুমারী মস্তকের উপর আগুন দেখিয়া, বহির্গমনের পথ না পাইয়া ভীষণ কান্না জুড়িয়া দিল। গভীর রজনীর সেই বিকট চীৎকার ও ক্রন্দনধ্বনিতে কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশী বাহির হইল, পাড়ার লোক দৌড়িয়া আসিতে লাগিল, রামকমল ও মহামায়া দরজা খুলিল না। তখন আগুন গৃহান্তরে বিস্তৃত হইল। ভীষণ অগ্নির উত্তাপে সত্য-সত্যই বৃদ্ধা, সুকুমারী ও নবজাত শিশুটি অর্দ্ধদগ্ধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশী বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া নিজগৃহে যাইয়া একখানা দা লইয়া আসিল, ভজহরি বেড়ার বাঁধন কাটিয়া দিতে লাগিল। সকলে টানাটানি করিয়া বেড়াগুলি ফেলিয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধা সে দিন একাদশীর উপবাস

করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—সেই বিপদে তিনি হতজ্ঞান হইয়া ঘরের মেজেতে পড়িয়া গেলেন। সুকুমারী ছেলেটিকে কোলে লইয়া অগ্নির ভীষণ উত্তাপে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উপর হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড তাহাদের গায়ে পড়িতেছিল। মঙ্গলা, ভজহরি, কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশী প্রাণের ভয় না করিয়া সেই প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে টানাটানি করিয়া বাহিরে আনিল। তাহারা যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মঙ্গলা ও মুক্তকেশী প্রাণপণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যজন করিতে লাগিল।

এ দিকে পাড়ার লোক জড় হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারা অগ্নিনির্ব্বাণ পক্ষে বড় সাহায্য হইল না। গৃহসামগ্রীগুলিও বড় রক্ষা পাইল না। একে একে সব ঘরগুলি পুড়িয়া ছাই হইল। গৃহসামগ্রীগুলি ভস্মীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রামকমল ও কৃষ্ণকমলের রন্ধনগৃহ দু'খানাও গেল। কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশীর হৃদয়ে আজ দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা বৃদ্ধা, সুকুমারী ও নবজাত শিশুটির যন্ত্রণা-দূরীকরণে নিযুক্ত হইল। আপনাদের ক্ষুদ্র ঘরখানা পুড়িয়া গেল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু

ভোরের সময় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। রাত্রিতে যাহারা আসিয়াছিল, পরিশ্রান্ত হইয়া তাহারা গৃহে ফিরিল। রাত্রিতে যাহারা আসে নাই, তাহারা এখন দলে দলে তামাসা দেখিতে আসিল। রামকমল কার্য্যাপদেশে অতি প্রত্যূষে গৃহবহির্গত হইল এবং তাহার দলের জনৈক দুষ্কর্ম্মরত ব্যক্তি দ্বারা স্বর্ণকমলের নিকট একখানি মিথ্যা পত্র লিখাইয়া

দিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, স্বর্ণকমলের স্ত্রী, পুত্র, জননী ঘর পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা কৃপাময়ী তখনও বাহিরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। স্বর্ণকমলের শিশু-পুত্র মাখনলাল যন্ত্রণায় 'মা মা রবে চীৎকার করিতেছে। সুকুমারী অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সে পুত্রটিকে কোলে লইয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধার মস্তকে, বক্ষঃস্থলে ও দক্ষিণ পদে প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড পড়িয়াছিল। মস্তকের কতকগুলি চুল পুড়িয়া গিয়াছে এবং দগ্ধ স্থানগুলিতে ফোস্কা পড়িয়া ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়াছে। আহা! বৃদ্ধাকে আর চিনিতে পারা যায় না। মাখনলাল কচি শিশু, অগ্নির সেই ভীষণ উত্তাপে তাহার সুকোমল সোণার দেহ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়িয়াছে। সেই নবনীত-সদৃশ শিশু সর্ব্বাঙ্গের যন্ত্রণায় উঠিতে, শুইতে বা বসিতে পারিতেছে না, শরীরে জননীর হস্তস্পর্শ হইবামাত্র 'মা মা' করিয়া চীৎকার করিতেছে। সুকুমারীর অগ্নির উত্তাপে অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ক্রমেই একটু সুস্থ হইতে লাগিল, শিশুসন্তান ও শাশুড়ীর কষ্ট দেখিয়া অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রৌদ্রের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ও শিশুর যন্ত্রণাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ভজহরি ও মঙ্গলা ব্যজনকার্য্যে নিযুক্ত হইল। পরদুঃখকাতর প্রতিবেশিগণ এ দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

তার পর কথা উঠিল—কিরূপে, কাহার দ্বারা এ কাণ্ড হইল? সকলেই একবাক্যে বলিল, 'অবশ্যই ইহা কোন সর্ব্বনেশে লোকের কাজ, নহিলে চৌচালা-ঘরের চালের উপর আগুন আসিল কিরূপে? এ ত আর রান্নাঘর নয়। আর মানুষে এ কাজ না করিলে, বাহিরের দিকে ঘরের দরজা বাঁধিয়া রাখিল কে? আহা! এমন সোণার মানুষ—ইহাদের আবার শত্রু কে? এমন মানুষের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হয়, এমন নিষ্ঠুর, এমন পাষণ্ড কে আছে?'

মঙ্গলা দুঃখে ও ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'এ নিশ্চয়ই বড়-বাবুর কাজ—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।' আগুন নিবাতে কত লোক এল, কিন্তু বড়-বাবু এল না।'

মঙ্গলার স্বচক্ষে দেখার কথাটুকু মিথ্যা।

ভজহরি কহিল, 'ঝির চীৎকার শুনে আমি অন্দর-বাড়ীতে আস্‌ছিলাম, তখন দেখ্‌লাম, বড়বাবু তাঁর দালানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'র্‌লেন।'

এইরূপ অনেক কথা হইল। রামকমলের অনুপস্থিতিতে সন্দেহ আরও বাড়িল। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। পাড়ার লোক সকলে রামকমলের উপর চটিয়া গেল।

বৃদ্ধা কৃপাময়ীর একটু চৈতন্য হইল। এই সমস্ত আলোচনা তাঁহার কাণে গেল। আর বৃদ্ধা স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সজোরে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'হা ভগবান্, এই কি তোমার সৃষ্টি! কোন্ পাপে এখনও বেঁচে আছি?'

বৃদ্ধার মস্তকের দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ গণ্ড ব্যাপিয়া একটা ফোস্কা পড়িয়াছিল। করাঘাতে সেই ফোস্কা গলিয়া গেল। ফোস্কার জল চখে মুখে বাহিয়া পড়িল। বৃদ্ধা পুনরপি হতজ্ঞান হইলেন।

মাখনলাল যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ডাকিল, 'মা!' কিন্তু শিশুর স্বর ভগ্ন ও বিকৃত হইয়াছে, শব্দোচ্চারণ-শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। সুকুমারী অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে শিশুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, মুখে স্তন্য প্রদান করিল, কিন্তু শিশু তাহা পান করিল না—কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারীর চক্ষু হইতে প্রস্রবণ বহিতে লাগিল।

মুক্তকেশী নিজে চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'কেঁদ না ছোট-বৌ! চল ঘরে যাই।'

তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সুকুমারী পুত্রটিকে লইয়া মুক্তকেশীর গৃহে

গেল। বৃদ্ধাকেও তথায় ধরাধরি করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। সেদিন সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। সুশীলা ও সরলা আজ পিতা-মাতার সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াছে। তাহারাও ঠাকুর-মা ও কাকী-মার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

বৃদ্ধার আবার চৈতন্যোদয় হইল। সুকুমারীকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, 'মা লক্ষ্মি! কাঁদিস্ না মা—তুই কাঁদ্‌লে যে আমার মাখনলাল কেঁদে খুন হবে।'

মাখনের যে কি অবস্থা হইয়াছে, বৃদ্ধা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই। তাই বলিলেন, 'কৈ, মাখন কৈ আমার? আজ ত আমার সোণার চাঁদ একটিবারও আমার কোলে আসে নাই, মাখনকে একবার আমার কাছে দে।'

মঙ্গলা এতক্ষণ এক কোণে বসিয়া চক্ষু মুছিতেছিল। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'মাখন কি আর সে মাখন আছে গো! মানুষে কি এমন সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পারে? ধর্ম্ম কি নেই!—সংবৎসরের মধ্যে ভগবান্ তাকে দগ্ধে মার্‌বেন।

সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

কৃষ্ণকমল ডাক্তার ডাকিতে গেল। ডাক্তার আসিয়া দগ্ধস্থানে একটা মলম দিয়া গেলেন। মঙ্গলা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া চক্ষু মুছিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, মাখনের কেমন বুঝ্‌লে?—বাছা ভাল হবে ত?'

ডাক্তারবাবু মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'তা কি বলা যায়? হ'লেও হ'তে পারে।'

মঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল।

ক্রমেই মাখনলালের ও বৃদ্ধার কষ্ট বাড়িতে লাগিল। সুকুমারী আর এ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া মঙ্গলার কোলে মাখনকে দিয়া উপাধানে মুখ

লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল ; এমন সময় মহামায়া মুক্তকেশীকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল, "তুমি ক'চ্ছ কি ? শত্রুরের সঙ্গে আবার খাতির কি ?—কেন এত কষ্ট ক'চ্ছ ? এতে কি লাভ হবে ?—ওদের চরিত্র জান্‌তে কি তোমার এখনও বাকি আছে ?"

আজ মুক্তকেশী মহামায়ার মহামন্ত্র গ্রহণ করিল না। রাগতস্বরে বলিল, "ছি ! বড় দিদি ! এ তোমার বড় অন্যায়। দেখ দেখি ওরা কত কষ্ট পাচ্ছে, এ দেখে কার না দয়া হয় ? ঘর-দুয়ার, কাপড়-চোপড় কিছু নাই, মাখনলাল আর ঠাকুরাণী ত মর-মর হ'য়েছে। আহা ! এমন সোণার ছেলে কি হ'য়েছে দেখে যে পাষাণও গলে যায়। আর ভেবে দেখ দেখি, ওরা কার কি অন্যায় করে ? আমরা গায়ে প'ড়ে ওদের নানা রকমে জ্বালাতন করি, কত অনিষ্ট করি, তবু ওরা চুপ ক'রে থাকে। ভগবান্ আর কত সইবেন ? ছি ! এমন ক'রে মানুষের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে আছে ! তোমরা বড় নিষ্ঠুর !"

বলিতে বলিতে মুক্তকেশী চক্ষু মুছিল। মহামায়া বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে কষ্ট আরও বাড়িল। বৃদ্ধা আপনার কষ্টে বড় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু মাখনলালের অবস্থা শুনিয়া তিনি কতক্ষণ বিকট ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন এবং পৃথিবীর সমস্ত দেবতাকে সাক্ষী করিয়া শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিলেন, 'আমার এমন সোণার চাঁদকে যে পুড়িয়ে মার্‌লে, ভগবান্ তাকে দগ্ধে মার—মার—মার !'

ইহা বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় চৈতন্য হারাইলেন। গভীর রজনীর এই গভীর অভিসম্পাত রামকমল ও মহামায়া শুনিতে পাইল ; তাহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল ; মহামায়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কেঁপে উঠ্‌লে কেন ?'

রামকমল বলিল, 'কৈ ?—না।'

রজনী তৃতীয় প্রহর। মিটিমিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কৃষ্ণকমল গত রাত্রের অনিদ্রা ও পরিশ্রমহেতু নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা হতজ্ঞানাবস্থায় শয্যায় এক এক বার শিহরিয়া উঠিতেছেন। সুকুমারী মঙ্গলার কোল হইতে মাখনলালকে নিজ কোলে টানিয়া লইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মুক্তকেশী ও মঙ্গলা পার্শ্বে বসিয়া আছে। সকলেই কাঁদিতেছিল—কে কাহাকে প্রবোধবাক্য বলিবে?

মাখনলালের অবস্থার ভীষণ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সেই শিশু একটু পরেই কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, একটু রক্তবমন করিল, শ্বাস ঘন ও দীর্ঘ হইয়া আসিতে লাগিল, প্রত্যেক শ্বাস-গ্রহণের সময় তাহার তলপেট পর্য্যন্ত নড়িতে লাগিল। শিশুর এই অবস্থা দেখিয়া সুকুমারী ও মঙ্গলা অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মুক্তকেশী ভীতা হইয়া তাহার স্বামীকে জাগরিত করিল। কৃষ্ণকমল চক্ষু রগড়াইয়া আসিতে আসিতে মায়ের কোলে মাখনের প্রাণটুকু উড়িয়া গেল। সংজ্ঞাশূন্যা বৃদ্ধা এ সংবাদ জানিতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থাও ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল। শেষ-রাত্রে বৃদ্ধা প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'বেশ ক'রেছে, বেশ ক'রেছে। দিব না—কেন দেব? সোণার ছেলে নিয়ে যাবে?—তা হবে না, হবে না। উঁহুঁ হুঁ হুঁ, বাছা কাদ্‌ছে! আয় মাখন! আমার কাছে আয়—ভয় কি? এই যে আমি এখানে ব'সে আছি।' বৃদ্ধা একটু থামিয়া আবার বলিলেন, 'ঐ নিয়ে যায়, নিয়ে যায়—নিয়ে গেল, নিয়ে গেল, নিয়ে গেল! স্বর্ণকমল,—বাপ আমার! শীগ্‌গীর ধর্, ধর্।—কৈ তোকেও নিয়ে গেল! হায়! হায়!' রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু প্রলাপ থামিল না। 'আবার এয়েছে—আবার নেবে?—কত মারবে—মার, আমি কাঁদব না। কেন কাঁদব?—মাখন বড় হবে, মানুষ হবে, কেউ কিছু ব'লতে পারবে না। মাখন আমার সোণার চাঁদ!'

বৃদ্ধার প্রলাপবাক্য শুনিয়া সকলের চক্ষু হইতে বন্যার জলের ন্যায়

প্রবলবেগে বারিধারা পড়িতে লাগিল। ‘উহুঃ—বড় ব্যথা, তাই কাঁদে। আ-গুন্—আ-গুন্—আ-গুন্। পুড়ে গেল-অ, পুড়ে গেল-অঃ। হায় হায় হায়! কেউ নাই, কেউ নাই। স্বর্ণকমল এলো না। ঐ কুকুর—কুকুর! কামড়ায়—কামড়ায়। উ-হু-হু-হু বড় ব্যথা—মারিস্ না—মারিস্ না—কুকুর মেরে কি হবে?—ঐ কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ওর দাঁত ভেঙ্গে গ্যাছে—আর মারিস্ না। কুকুরটা মেরে ফেল্লি?—ছিঃ, কেন মাল্লি? হিংসা?—ছিঃ! রাগ?—ছিঃ!’

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বৃদ্ধার আবার চৈতন্যোদয় হইল, কিন্তু সে ক্ষণ-কালের জন্য। তখন সুকুমারী ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধা তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, ‘মা—লক্ষ্মি—কেঁদ না, কেঁদ না। এ দুঃখ থাক্‌বে না—ভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল ক’র্‌বেন; এস—আমার পায়ের ধূলা নাও।’

তার পর মুক্তকেশীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘মেজ-বৌ! মা! বড় সুখী হ’লুম। বেঁচে থাক মা! বড়-বৌ কোথা?’ মুক্তকেশী শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদবাক্য শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। বড়-বৌ আসিল না। সুকুমারী ও মুক্তকেশী অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বৃদ্ধার পদধূলি গ্রহণ করিল। বৃদ্ধার বাক্য-প্রয়োগের শক্তি নাই—তিনি মুখ নাড়িয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষু উপরে উঠিল। দুই তিন বার তাঁহার সেই দগ্ধ-শরীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। ক্রন্দনের রোলের মধ্যে বৃদ্ধার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সব হইল—সব ফুরাইল

লালচক্ .বাগানের জলবায়ু স্বর্ণকমলের সহ্য হইল না! বাড়ী গিয়া স্বাস্থ্য একটু ভাল হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যস্থলে যাইবার পরই আবার জ্বর হইল। ঔষধ-সেবনেও জ্বর বন্ধ হইল না। ডাক্তার বলিলেন, 'আর কয়েক দিন গেলেই সারিয়া যাইবে। কয়েক দিন গেল, জ্বর একটু থামিল, কিন্তু আবার দেখা দিল। এমন সময় রামকমল, রামনিধি বিদ্যালঙ্কারের নাম জাল করিয়া, স্বর্ণকমলের নিকট পূর্ব্বলিখিত মিথ্যা পত্র প্রেরণ করে। স্বর্ণকমলের মনে কষ্ট দেওয়াই রামকমলের উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। পত্রপাঠ করিয়া স্বর্ণকমল বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। সেই অসুস্থ-শরীরে স্ত্রী, পুত্র, জননীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ড একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল; সেই দিনই জ্বর একবারে প্রবলবেগে বৃদ্ধি পাইল। স্বর্ণকমল হতজ্ঞান হইল। সাহেব বাগানের ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ হঠাৎ এত জ্বর বাড়িল কেন?'

ডাক্তার সাহেবকে পত্র দেখাইয়া বলিলেন, 'এ পত্রের লিখিত শোক-সংবাদ পাঠ করাতে রোগীর হৃৎপিণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

সাহেব। রোগীর জীবন রক্ষা করিতে পারিবে ত?

ডাক্তার। সন্দেহ-স্থল—মানসিক যন্ত্রণা কমাইতে না পারিলে প্রাণ বাঁচান কঠিন হইবে। এ সময়ে শোক-নিবারণের উপায় দেখিতেছি না।

সাহেব। জীবন রক্ষা করিতে পারিলে একশত টাকা পুরস্কার পাইবে —প্রাণপণ করিয়া চিকিৎসা কর।

ডাক্তার। চেষ্টার ত্রুটি করিব না—ভগবানের হাত।

ডাক্তার বাবু বিশেষ পরিশ্রম-সহকারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; সাহেব প্রত্যেক ঘণ্টায় রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে তত্ত্ব লইতে লাগিলেন; কিন্তু উপশম বা হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং উত্তরোত্তর অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সাহেব ভীত হইলেন। স্বর্ণ-কমলের আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন। প্রকারান্তরে সাহেব স্বর্ণকমলের অভিমত জানিতে চাহিলেন, স্বর্ণকমল উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'আমার আছে কে, কাকে খবর দিতে ব'লব?'

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। উপাধানের নীচ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া তাহা সাহেবের হস্তে দিতে চাহিল।

সাহেব বলিলেন, 'পত্রের সংবাদ আমি শুনেছি, আমার বোধ হয় পত্রখানা কৃত্রিম। ঘটনা সত্য হ'লে তোমার ভাই পত্র লিখ্‌তেন।'

'আমার আবার ভাই কোথা?—আমি তাদের শত্রু।—এ সংসারে আমার যা ছিল, সব গিয়েছে, আমার কেউ নেই।'

স্বর্ণকমল হৃদয়ের আবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাহেব। সত্য তোমার ভাই সর্ব্বাগ্রে এ সংবাদ প্রদান ক'রে শত্রুতা সাধন ক'র্‌ত। হয় ত এ তোমার ভাইদের চক্রান্ত। তারা পরের নাম জাল ক'রে এই মিথ্যা সংবাদ দিতে পারে।

স্বর্ণকমলের মনেও অনেকবার এ কথা উঠিয়াছিল, এইরূপ চিন্তায় সে একটু শান্তিও বোধ করে, কিন্তু তবু তাহার মন স্থির হয় না। সন্দেহের বৃশ্চিক-দংশনে সে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, 'আপনি ব্যস্ত হ'বেন না, আমি শীঘ্র সঠিক খবর আনিয়ে আপনার চিন্তা দূর ক'রব।'

স্বর্ণকমল ভগ্নস্বরে বলিল, 'ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? ডাক্তারবাবু, আমি নিশ্চয় বুঝ্‌ছি যে, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে। আমার হৃদয় কাঁপ্‌ছে,

প্রাণটা হু হু ক'র্‌ছে, মন শূন্য শূন্য বোধ হ'চ্ছে, আমার বুঝ্‌তে কিছু বাকি নাই। স্বাভাবিক মৃত্যু হ'লে তা বরং সহ্য হ'ত, কিন্তু, ভাই, এ যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে!—দুঃখিনী মায়ের কষ্টের কথা মনে হ'লে আমার হৃদয় ফেটে যায়, স্ত্রীর কথা মনে পড়্‌লে আমি পাগল হই, আর শিশু ছেলেটি, তার কথা আর কি ব'ল্‌ব?'

স্বর্ণকমলের কণ্ঠ-রোধ হইয়া গেল, আর কথা বাহির হইল না। অশ্রুধারা মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'ভাই! একটি দিন তা'দিকে সুখী ক'র্‌তে পার্‌লেম না! আহা! তারা কত কষ্ট পেয়ে মরেছে, একবার ভেবে দেখ, তোমারও বুক ফেটে যাবে!—আমি কেন এত দূরদেশে এসেছিলুম, যাদের জন্য এসেছিলুম, তারা এখন কোথায়?'

স্বর্ণকমলের কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু চক্ষু মুছিলেন। স্বর্ণকমল ধীরে ধীরে বলিল, 'একটু জল।'

ডাক্তারবাবু রোগীর মুখে একটু জল দিলেন।

স্বর্ণকমল বলিল, 'আরও দাও।'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'অধিক জল খেলে ব্যারাম সার্‌বে না।'

স্বর্ণকমল একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি পাগল হ'য়েছ। আমার ব্যারাম সারিয়া দরকার?—আমার এ জীবনে আর প্রয়োজন কি ভাই?—আমার আছে কে? আমি কার জন্য বেগার খাটব?—যাহাদের কষ্ট দূর ক'র্‌ব ব'লে এই দূরদেশে এসেছিলাম, তারা চ'লে গেল, আমার থেকে প্রয়োজন? এখন যত শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়, ততই আমার কষ্ট কম হবে।

স্বর্ণকমল উপাধানে মুখ লুকাইয়া অবিরাম অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ডাক্তার তাহার স্থির-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আর কোন বিষয়ে আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর ডাক্তার রোগীর নিকট দুই একবার ঔষধ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্ণকমল তাহা সেবন করিল না।

স্বর্ণকমল একটু স্থির হইয়া দীনেশ বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইতে

বলিল। সংবাদ প্রেরিত হইল। অতঃপর স্বর্ণকমল সাহেবের নিকট বিনীতভাবে বলিল, 'আপনি আমার প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ ক'রেছেন, তজ্জন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আমার একটি নিবেদন আছে, আপনার অনুরোধ ও পরামর্শেই আমি পাঁচ হাজার টাকার জীবন-বীমা ক'রেছি। যদি পত্রের সংবাদ মিথ্যা হয়, তবে আমি মরিলে এই টাকাগুলি যাতে আমার দুঃখিনী স্ত্রী পেতে পারে, আপনি দয়া ক'রে সে চেষ্টা ক'রবেন। দীনেশ বাবু এ সংসারে আমার একমাত্র বন্ধু, তাঁকে জানাইলে তিনি সব ক'রবেন।'

সাহেব বলিলেন, 'তা ক'রব—কিন্তু তুমি এত ভীত হ'লে কেন?'

স্বর্ণ। কৈ, না—এখন আমার আর ম'রতে ভয় হ'বে কেন? এদিকে স্বর্ণকমলের প্রেরিত সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই দীনেশবাবু গঙ্গাতীরের সংবাদ জানিয়াছিলেন। তাই তিনি স্বর্ণকমলের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'তোমার গৃহদাহ হইয়া গিয়াছে। তোমার মা ও শিশুটি রোগগ্রস্ত—সুকুমারী ভাল আছে। তুমি ছুটী লইয়া শীঘ্র বাড়ী আইস।'

দীনেশচন্দ্র কি উদ্দেশ্যে স্বর্ণকমলের জননী ও শিশুটির মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। দীনেশচন্দ্রের প্রেরিত সংবাদে স্বর্ণকমল আবার উল্লাসিত হইল।

'সুকুমারী তবে এখনো বেঁচে আছে!' পুনঃপুনঃ সে এ কথা বলিতে লাগিল। আজ এগার দিন স্বর্ণকমলের পেটে ভাত পড়ে নাই, সুতরাং শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় দীনেশবাবুর প্রেরিত সংবাদ তাহার নিকট আসিল। অতি অবসাদের পর উল্লাসে রোগীর ভগ্ন-শরীর ভীষণ উত্তেজনা-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। 'সুকুমারী বেঁচে আছে' 'সুকুমারী বেঁচে আছে' ইহাই স্বর্ণকমলের মূলমন্ত্র হইল। ভীষণ উত্তেজনায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে সে শতবার সুকুমারীর নামোচ্চারণ করিতে লাগিল। ডাক্তারের বারণ শুনিল না, সাহেবের

বারণ গ্রাহ্য করিল না—কেবল 'সুকুমারী' কেবল 'সুকুমারী।' কখন হাসিয়া বলে, 'আমার সুকুমারী' পরমুহূর্ত্তে কাঁদিয়া বলে, 'কোথা—সে?' স্বর্ণকমলের সেই জীর্ণতরী উল্লাসের প্রবল তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে পারিল না। ডাক্তারবাবু সাহেবকে বলিলেন, 'লক্ষণ অত্যন্ত খারাপ—আর বাঁচাতে পারলাম না।'

সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

স্বর্ণকমল অজ্ঞানাবস্থায় প্রলাপ বকিতে লাগিল 'মা, মা, মা—যেও না, যেও না। এত ভাল, এত কষ্ট।—সব হবে, চিন্তা কি? পাপের শাস্তি হবেই হবে—ঐ ত মাথার উপর পরমেশ্বর। ঐ তিনি ব'ল্লেন, হবে। কি সুন্দর! কি সুন্দর!'

ডাক্তারবাবু মনে করিলেন, এ অসংবদ্ধ কথা, কিন্তু যাঁহারা তাহার পারিবারিক অবস্থা জ্ঞাত আছেন, যাঁহারা তাহার ভ্রাতৃচরিত্র অবগত আছেন, তাঁহারা কেহ আজ স্বর্ণকমলের শয্যাপার্শ্বে থাকিলে বুঝিতে পারিতেন যে, সে একটিও অসংবদ্ধ কথা বলে নাই। মায়ের দুঃখ, ভার্য্যার দুঃখ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নৃশংস ব্যবহারে ক্লিষ্ট ও ভগ্নহৃদয় হইয়া, ভ্রাতৃ-তাড়িত স্বর্ণকমল আজ সুদূর আসামের এক জনশূন্য প্রান্তে ভীষণ মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে করিতে প্রাণ হারাইতেছে। তিন দিবস হতজ্ঞানাবস্থায় স্বর্ণকমল কত কথাই বলিল। চতুর্থ দিন, 'এসেছ, বেশ ক'রেছ' বলিতে বলিতে তাহার মুখ একটু প্রসন্ন হইল। আবার একটু জ্ঞান হইল, কিন্তু তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য মাত্র। রোগীর হস্তপদ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল, চক্ষু দুটা স্থির, বিস্ফারিত ও ঊর্দ্ধগ হইল, নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু জল দেখা গেল। মুমূর্ষু রোগী ইঙ্গিতে কি একটা কথা বলিল, কিন্তু ডাক্তারবাবু তাহা বুঝিলেন না। যৌবনের প্রথমভাগে, পার্থিব ও সাংসারিক সুখভোগের পূর্ব্বে, হৃদয়ের আশা অপূর্ণ থাকিতে বিদেশে, নিজ পরিজন ও বন্ধুবর্গের অনুপস্থিতিতে, দুঃখের স্বপ্ন

দেখিতে দেখিতে, স্বর্ণকমলের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। রামকমলের সব হইল—সুকুমারীর সব ফুরাইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অশনি-পতন

দীনেশবাবু স্বর্ণকমলকে সংবাদ পাঠাইয়া সুকুমারীকে সান্ত্বনাপ্রদান জন্য এবং নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণে সাহায্যার্থ দুই তিন জন লোকসহ গঙ্গাতীরে রওনা হইতেছিলেন, এমন সময়ে চা-বাগানের সাহেবের প্রেরিত সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। দীনেশবাবু বিপদের উপর বিপদ্ দেখিয়া অস্থির হইলেন এবং স্বর্ণকমলের কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইলেন। তিন জন লোক গঙ্গাতীরে পাঠাইয়া তিনি সেই দিনই আসাম-প্রদেশে রওনা হইলেন। লালচক্ বাগানে পৌঁছিয়া দীনেশবাবু অবগত হইলেন যে, পূর্ব্বরাত্রে স্বর্ণকমলের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখনও তাহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে—সংকারের যোগাড় হইতেছে মাত্র। স্বর্ণকমলের সেই শবদেহ দেখিয়া দীনেশচন্দ্র কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সুকুমারীর দশা কি হইবে, ভাবিয়া অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। আর একদিন পূর্ব্বে এখানে পৌঁছিতে পারিলে স্বর্ণকমল অন্ততঃ একজন আত্মীয়ের মুখ দেখিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে পারিত, এই চিন্তায়ও তিনি ক্লিষ্ট হইলেন। দীনেশচন্দ্র আকুল-প্রাণে মৃতবন্ধুর সংকার করিলেন।

সাহেব দীনেশবাবুর নিকট অতি দুঃখের সহিত বলিলেন, "স্বর্ণকমলকে আমি বড় ভালবাসিতাম—এমন কার্য্যদক্ষ সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র সহকারী আমি আর পাই নাই; কিন্তু কি করিব, তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

দীনেশ। ডাক্তারবাবুর নিকট শুনিয়াছি, আপনি তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, আপনি কি করিবেন?

সাহেব। স্বর্ণকমল ছুটী চাহিয়াছিল, আমি তাহা দেই নাই, আমি তাহাকে ছুটী দিলে হয় ত দেশের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে সে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারিত। তাহার দুঃখিনী স্ত্রীর নিকট আমি ঋণগ্রস্ত রহিলাম।

বলিয়া সাহেব রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। চা-কর সাহেবের এরূপ সহৃদয়তা দেখিয়া দীনেশচন্দ্র সেই দুঃখের মধ্যেও একটু সুখী হইলেন, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার প্রাণ আপ্লুত হইল। সাহেব বলিলেন, 'স্বর্ণকমল মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে আপনার নিকট সংবাদ পাঠাইতে বলিয়াছিল—আপনিই নাকি তাহার একমাত্র বন্ধু। আপনি তাহার দ্রব্য-সামগ্রীগুলি লইয়া যান। আর, স্বর্ণকমল পাঁচ হাজার টাকার জন্য জীবন-বীমা করিয়াছিল—এই সেই কাগজগুলি নিন্। আপনি চেষ্টা করিয়া টাকাগুলি আদায় করিয়া দিয়া বিধবার প্রাণ বাঁচাইবেন।'

দীনেশচন্দ্র চক্ষে রুমাল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সাহেব বলিলেন, 'বৃথা দুঃখ করিবেন না, অনাথা বিধবার কি উপায় হইবে ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়াছিলাম, আপনাকে দেখিয়া সে চিন্তা দূর হইল, আপনার ন্যায় অভিভাবক থাকিতে বিধবার কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে, আপনাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমি বিধবাকে যৎসামান্য অর্থ সাহায্য করিব—'

সাহেবের কথা শেষ না হইতেই দীনেশচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, 'সাহায্যের প্রয়োজন হবে না—এই পাঁচ হাজার টাকা আছে, তা ছাড়া প্রয়োজন হ'লে আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য ক'রতে পারব।'

সাহেব। তাহা জানি,—আপনি যে একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার, তাহা আমি জানিয়াছি; কিন্তু বিধবাকে আমি কিছু না দিলে আমার মনে শান্তি

থাকিবে না। 'আমি পাঁচশত টাকা বেতন পাই, অনুগ্রহ করিয়া এই এক মাসের বেতন লউন, বিধবার হস্তে ইহা প্রদান করিবেন।

সাহেব জীবন-বীমার কাগজ, পাঁচশত টাকার পাঁচখানি নোট এবং স্বর্ণকমলের দ্রব্যসামগ্রীগুলি দীনেশবাবুকে বুঝাইয়া দিলেন। দীনেশবাবু আর আপত্তি না করিয়া, উহা লইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন।

দীনেশবাবুর প্রেরিত লোকমুখে তাঁহার আসাম-গমন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জীবন্মৃতা সুকুমারীর প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। পতির অমঙ্গল-আশঙ্কা সতীর হৃদয়ে জাগিয়াছিল। 'তাঁহার কোনরূপ বিপদ্ ঘটিয়া না থাকিলে, দীনেশদাদা আসাম যাইবেন কেন?' এই প্রশ্ন সুকুমারীর হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ জাগিতেছিল। কোন দুর্ঘটনা যে ঘটিয়াছে, ইহা সুকুমারী স্থির বুঝিল, কিন্তু ভগবান্ যে তাহার এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, এ কথা হতভাগিনীর মনে একবারও স্থান পাইল না। দীনেশবাবু আসিলেন, কিন্তু স্বর্ণকমল তাঁহার সঙ্গে আসে নাই, ইহাতে সুকুমারীর প্রাণ উড়িয়া গেল। যদি স্বর্ণ-কমল ভাল থাকিবেন, তবে দীনেশ দাদা এ কথা কহিতেছেন না কেন? তাঁহার সেই সুন্দর, সহাস্য মুখ আজ বিষণ্ণ কেন? নয়ন-কোণে অশ্রুরেখা কেন? তাঁহার মূর্ত্তি এত শুষ্ক কেন? মন্দভাগিনী সুকুমারীর হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ এইরূপ কত প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, হতভাগিনী বসিয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, পৃথিবী শূন্য বোধ হইতে লাগিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বের পদার্থগুলি যেন সুকুমারীকে কেন্দ্র করিয়া দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। দীনেশবাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না, সন্দেহের বৃশ্চিক-দংশনে তাহাকে পাগলিনী করিয়া তুলিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া স্বামীর মঙ্গল-সমাচার জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তখন মঙ্গলা দীনেশবাবুর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাদের বাবু ভাল আছেন ত?'

দীনেশবাবু সে কথার উত্তর না দিয়া চক্ষে হস্ত দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সুকুমারী আর সহ্য করিতে না পারিয়া হৃদয়ের সমস্তটুকু সাহস একত্র করিয়া বলিল, 'দাদা !'

কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। দীনেশচন্দ্র বস্ত্রদ্বারা চক্ষু আবৃত করিলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভয়বিহ্বলা, শোকাতুরা সুকুমারী নূতন অসহ্য শোক বক্ষে লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিল, 'দাদা ! সেখানকার সংবাদ কি ?'

দীনেশচন্দ্র সে স্থান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বহির্বাটীর একটী ধূলিপূর্ণ তক্তপোষের উপর গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দীনেশচন্দ্রের নিরুত্তরে সুকুমারী উত্তর বুঝিতে পারিল। তাহার হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল, মস্তকে অশনি পতন হইল—অনশনে দুর্ব্বলা, পুত্র-শ্বশ্রূ-শোক-কাতরা, দগ্ধ-কপালিনী সুকুমারী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে সুকুমারী পাগলিনী হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পাগলিনী

সত্য-সত্যই সুকুমারী পাগলিনীর ন্যায় হইল। চারি পাঁচ দিন তাহার মুখে এক বিন্দু জলও পড়িল না। দীনেশচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে গিরিবালাও গঙ্গাতীরে আসিলেন। অঙ্গাভরণ-পরিত্যক্তা, থান-বস্ত্র-পরিহিতা, শোক-দুঃখ-ম্রিয়মাণা সুকুমারীকে দেখিয়া গিরিবালা নিজেই অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল, প্রবোধবাক্য বলিবেন কাহাকে ? এখন সুকুমারীর সেই কান্তি নাই, সেই সৌন্দর্য্য নাই, হাসি নাই, সেই প্রফুল্লতা নাই ; সুকুমারীর ব্যবহারে সেই মধুরতা নাই, বাক্যে সেই সরসতা নাই, পরের অনুরোধ ও

জেদ রক্ষা বিষয়ে সে আগ্রহাতিশয্য বা ত্যাগস্বীকার নাই। সেই কোমল-স্বভাবা স্নিগ্ধনয়না হরিণী যেন রক্তচক্ষু, উগ্রস্বভাবা, ভীষণ তেজস্বিনী সিংহী হইয়া উঠিয়াছে।

দীনেশচন্দ্র কিংবা গিরিবালা তাহাকে এখন কোন কার্য্য করিতে জেদ করিলে, সুকুমারী সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সতেজে বলে, 'কেন ক'রব ?—কার জন্য ক'র্‌ব ?' এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হয়। সে কখন একাকিনী বসিয়া কাঁদে, কখন বা হাসে। কখন বা অস্ফুটস্বরে চুপি চুপি আপনা আপনি, কি কথা বলে, কেহ তাহার কিছু বুঝিতে পারে না। গিরিবালা একদিন বলিল, 'তুমি একা একা অত বক কি ?'

সুকুমারী সক্রোধে বলিল, 'যা খুসী।'

গিরি। তুমি ক্ষেপ্‌লে নাকি ?

সুকু। 'সে ত ভাল কথা,'—বলিয়া সে হাসিল।

গিরি। ছি! একটু স্থির হও।

সুকু। একেবারে স্থির হব।

গিরি। তুমি ও-সব অলক্ষ্য কথা ব'লো না।

সুকু। ভয় কার ?

গিরিবালা যুক্তি-তর্ক দ্বারা সুকুমারীর মত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, 'এ বাড়ীতে আরও লোক রয়েছে—তুমি অমন ক'রে পাগ্‌লামী ক'র্‌লে যে তাদের অসুবিধা হয়। অন্ততঃ পরের খাতিরেও তোমার একটু স্থির হওয়া উচিত।

সুকুমারী পূর্ব্ববৎ বিকটস্বরে বলিল, 'চুলয় যাক্।'

গিরিবালা একটু উগ্র হইয়া বলিল, 'তুমি একশবারই ও কথা ব'লো না—বল্‌ছি।

পাগলিনী তেমনি বা তদধিক উগ্র হইয়া বলিল, 'পাঁচ শ বার ব'ল্‌বো—

ভয় কার ? যার যা সাধ্যি ছিল, সে তো তা ক'রেছে। এখন আর আমার কে কি ক'র্‌বে ? আমার আছে কি ? কেন ভয় ক'র্‌ব ?'

বলিয়া পাগলিনী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

দীনেশচন্দ্র, গিরিবালা বা মুক্তকেশী কেহই তাহাকে স্থির করিতে পারিল না।

এক দিন অপরাহ্ণে, সুকুমারী আপনার মস্তকের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশগুলি কাঁচি দ্বারা স্বহস্তে, কচ্‌ কচ্‌ করিয়া কাটিয়া ফেলিল। গিরিবালা তাহা দেখিয়া বিস্ময়-সহকারে বলিল, 'এ ক'র্‌লে কি ?—এমন সুন্দর চুলগুলি কেটে ফেল্লে ?'

সুকুমারী। সুন্দর ব'লেই ত কাট্‌লুম।

গিরিবালা। কেন কাট্‌লে ?

সুকুমারী। যার জন্য রেখেছিলুম, তাকে দেব।

এই কথা বলিয়া সুকুমারী চুলগুলি প্রজ্বলিত অনলে ফেলিয়া দিল। দিন দিন সুকুমারী সংসারে বীতরাগ হইতে লাগিল। তাহার এখন কোন বিষয়ে যত্ন নাই, কোন কাজে আসক্তি বা আগ্রহ নাই! যেন এ সংসারে তাহার ভালবাসিবার কিছুই নাই। দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু সুকুমারীর মত-পরিবর্ত্তন হইল না। দীনেশবাবুর প্রেরিত লোক এ পর্য্যন্ত কোন কাজই করিতে পারে নাই। তাহারা নূতন গৃহ-নির্ম্মাণের যোগাড় করিতেছিল, কিন্তু সুকুমারী তাহাতে বাধা দিল। দীনেশবাবু অনেক পীড়াপীড়ি করায় সুকুমারী বলিল, 'আমার গৃহে প্রয়োজন কি ? আমি কাকে লয়ে ঘরে বাস ক'র্‌ব ? যদি একান্তই তুল্‌তে হয়, তবে একখানা ছোট চালা তুলে দাও—যথেষ্ট হ'বে।'

গিরিবালা ও মুক্তকেশী অনেক পীড়াপীড়ি করায়, সুকুমারী পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিল, 'তবে তোল ঘর—কিন্তু আমি ও ঘরে প্রবেশ ক'র্‌ব না। যে ঘরে শাশুড়ী-ঠাকুরাণী পুড়ে ম'র্‌লেন, যে ঘরে আমার

মাখনলাল পুড়ে ম'ল, সে ঘর সোণার ঘর হ'লেও আমি তাতে প্রবেশ ক'রব না।'

সুকুমারীকে সান্ত্বনা করিয়া দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'দেখ সুকুমারী! তুমি আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি কর, আমার কথা শোন—গৃহ প্রস্তুত হোক, তুমি বরং ঐ ঘরে না থাকবে। দালানটি সম্পূর্ণ ক'রে দেওয়া হউক, তাতে তুমি বাস ক'রো।'

সুকুমারী কাঁদিয়া বলিল, 'দাদা! আমার ও সবে আর প্রয়োজন কি? আমার জন্য তোমরা ভেবো না। কেন দালানে বৃথা কতকগুলি টাকা ফেল্‌বে?'

দীনেশ। এ আমার টাকা নয়, স্বর্ণকমল পাঁচ হাজার টাকা রেখে গিয়েছে, তা আমার নিকট আছে—তা হ'তে খরচ চ'ল্‌বে, আর সাহেব তোমাকে পাঁচ শ টাকা দিয়েছেন।

সুকুমারী ও গিরিবালা এ কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারীর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গৃহ নির্ম্মিত হইল। কিন্তু সুকুমারী ইষ্টকালয়ের কাজ কিছুতেই আরম্ভ করিতে দিল না। কিছু দিন গেল; দীনেশচন্দ্র নিজ বাড়ী-গমনে অধৈর্য্য হইয়া গিরিবালাকে বলিলেন, 'আমাকে দু এক দিনের মধ্যেই বাড়ী যেতে হবে। তুমি বরং এখানে আর দু একদিন থাক। সুকুমারী একটু স্থির হ'লে, নৌকা পাঠিয়ে দিব।'

গিরিবালা। বেশ কথা! আমি একা থেকে কি হ'বে?

স্বামীর বিশেষ পীড়াপীড়িতে অগত্যা গিরিবালা স্বীকৃতা হইল। সেই দিন অপরাহ্ণে দীনেশচন্দ্র সকলের সাক্ষাতে সুকুমারীকে বলিলেন, 'দেখ সুকুমারি! বৃথা দুশ্চিন্তা ক'রে যাতনা ভোগ ক'রো না—সকলই ভগবানের হাত। তুমি গর্ভবতী, এখন দিন-রাত অনাহারে থেকে কাঁদ্‌লে, উদরস্থ সন্তানের অনিষ্ট হবে। আমাকে আগামী কল্য একবার বাড়ী যেতে হবে—বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর একটি কথা আছে—স্বর্ণকমল পাঁচহাজার

টাকার জন্য জীবন-বীমা ক'রেছিলেন, এই সেই রসিদখানা লও। টাকা-গুলি আমি যোগাড় ক'রে এনে দিব। আর সাহেব তোমাকে পাঁচশত টাকা দিয়েছেন।'

বলিয়া দীনেশবাবু রসিদখানা ও পাঁচশত টাকা সুকুমারীর নিকট দিলেন। পাগলিনীর চক্ষু দুটি বাষ্পপূর্ণ হইল। সে গদগদকণ্ঠে বলিল, 'দাদা!' টাকা-কড়ি, কাগজপত্র নিয়া আমি কি ক'রব? এ সব তোমার কাছে থাকুক।'

দীনেশ। ছি! অমনতর পাগ্‌লামী ক'রো না—তোমার টাকা তুমি লবে না ত লবে কে?

সুকু। আমার যদি হয়, তবে আমি এ দ্বারা যা খুসী তাই ক'র্‌ব।

দীনেশ। তা ক'র্‌বে বৈ কি!—তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর।

'বেশ কথা' বলিয়া রুক্ষকেশা, উগ্রমূর্ত্তি পাগলিনী জীবন-বীমা কার্য্যালয়ের সেই পাঁচ হাজার টাকার রসিদখানা হস্তে লইয়া নিমেষমধ্যে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া সেই ছিন্ন কাগজখণ্ডগুলি কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দিল। 'যাক্ সব এক পথে' বলিয়া পাগলিনী চক্ষু মুছিল। সকলে অবাক্ হইয়া রহিল।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

খোকা কোথা গেল

গিরিবালা ও মুক্তকেশীর উপর সুকুমারীর যত্ন পরিচর্য্যার ভারার্পণ করিয়া দীনেশচন্দ্র চন্দনবাগ গেলেন। সুকুমারীর পাগ্‌লামী আরও বাড়িয়া উঠিল। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ; কিন্তু এ গভীর নিশীথেও মন্দভাগিনী সুকুমারীর চক্ষে নিদ্রা নাই।

বহুদিনের পর আজ একটু তন্দ্রা হইয়াছিল—সে সময় সুকুমারী স্বপ্ন দেখিল, যেন স্বর্ণকমল মাখনলালকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শ্বশ্রূঠাকুরাণী একখানি গরদের ধুতি পরিয়া, নিকটে একখানি কুশাসনে বসিয়া, রুদ্রাক্ষের মালা জপিতেছেন। মাখনলাল হাসিয়া হাসিয়া ঠাকুর-মার কোলে ঝাঁপ খাইয়া পড়িতে উদ্যত হইতেছে। স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনী শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিয়া সম্মুখে কিছু দেখিতে না পাইয়া অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিল—'কেন গেল, কোথা গেল' বলিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।—আজ সুকুমারীর শোকসাগর আবার উথলিয়া উঠিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে, জলপ্রবাহ যেরূপ প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে, সুকুমারীর শোকপ্রবাহ আজ তেমনি ছুটিল। গভীর নিশীথে পাগলিনীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে সকলে জাগরিত হইল। তাহার ক্রন্দনে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া, সেই দুঃখের মধ্যেও সুকুমারীর একটু লজ্জা বোধ হইল। অমনি পাগলিনী ক্রন্দন থামাইয়া উপাধানে মস্তক রাখিয়া সুপ্তবৎ পড়িয়া রহিল। সকলে মনে করিল, সুকুমারী একটু স্থির হইয়াছে—কিন্তু তখন যদি কেহ তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত, তবে দেখিত যে, দুঃসহনীয় শোকাগ্নিতে তাহার অর্দ্ধদগ্ধ হৃদয় একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। গিরিবালা, মুক্তকেশী পুনঃ পুনঃ গভীর রজনীতে এইরূপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সুকুমারী কোন উত্তর দিতে পারিল না। আজ সুকুমারীর মরিতে ইচ্ছা হইল; সারা রাত্রি নানারূপ কল্পনা চলিল। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সুকুমারী মুক্তকেশীর নিকট গেল। মেজ-বৌ তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে মাত্র। কৃষ্ণকমল, সুশীলা, সরলা তখনও নিদ্রা যাইতেছে। পাগলিনী মেজ-বৌর হাত ধরিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল, 'মেজ-দিদি, আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে।'

সুকুমারীর দুঃখে এখন মুক্তকেশীর হৃদয় কাঁদে। তাহার দুঃখ দূর

করিয়া পূর্ব্ব-ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য মুক্তকেশী সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাই সে আগ্রহাতিশয়-সহকারে বলিল, 'কি কথা ভাই!'

সুকুমারী। রাখ্‌বে—বল?

মুক্তকেশী। তোমার কথা রাখব বৈ কি।

সুকুমারী। তবে একটু দাঁড়াও।

বলিয়া সুকুমারী অন্যত্র যাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে একটি ক্ষুদ্র টিনের বাক্স হাতে করিয়া আনিয়া বলিল, 'আমার এ গহনাগুলি তুমি লও—সুশীলা, সরলাকে এগুলি দিও। এতে আপত্তি ক'রো না—আমার দিব্বি।'

'সে কি কথা!—ছিঃ' বলিয়া আজ মেজ-বৌ সরিয়া দাঁড়াইল। যে মেজ-বৌ একদিন আপনার বালিকা কন্যা সুশীলার দ্বারা এই গহনার বাক্স জলে ফেলিয়া দেওয়াইয়াছিল, যে মেজবৌ যে কোন উপায়ে সুকুমারীকে জব্দ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, আজ সেই মেজ বৌর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; আজ তাহার হৃদয় সদ্ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাই সে আজ বালা, অনন্ত, চিক ইত্যাদি নানারূপ স্বর্ণনির্ম্মিত বহুমূল্য গহনাপূর্ণ বাক্সটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করিল না। মেজ-বৌ বলিল, 'ছি! ছোট-বৌ, পাগ্‌লামী ক'রো না। ভগবান্ বিপদে ফেলেছেন, তিনিই উদ্ধার ক'র্‌বেন। মা কালীর আশীর্ব্বাদে এবার তোমার একটি ছেলে হ'লে সকল দুঃখ ঘুচে যাবে।'

পাগলিনী সুকুমারী বিরক্তিসহকারে, একরূপ বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমার দুঃখ ঘুচ্‌বে? এ জনমে নয়।'

পাগলিনী নীরব হইল—তাহার অন্তরে বিষাদপূর্ণ চিন্তাস্রোত বহিতে লাগিল।

মুক্তকেশী। মা কালী, মা দুর্গা অবশ্যই সদয় হ'বেন। এখনো ধর্ম্ম আছে—এখনো দিন-রাত হয়—

সুকুমারী। মিছে কথা—ধর্ম্ম নেই, নিশ্চয় নেই। তা যদি থাক্‌বে, তবে আমার এমন দশা হ'তো না।

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। মুক্তকেশী চক্ষু মুছাইয়া দিয়া স্নেহের সহিত বলিল, 'আমি তোমার ভগিনী—আমার কথা রাখ, একটু স্থির হও।'

সুকুমারী। আমার কথা রাখ্‌লে, তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌ব, নতুবা তোমার কথা আমি রাখ্‌ব কেন?

মুক্ত। আচ্ছা, তোমার কথা আমি রাখ্‌ব—কিন্তু মনে থাকে যেন, আমার কথাও তোমাকে রাখ্‌তে হবে!—বল, কি কথা?

সুকু। এই গহনাগুলি তুমি লও—সুশীলা, সরলা বড় হ'লে তাদের দিও। আর—আর একটি কথা—

মুক্তকেশী হাত পাতিয়া গহনার বাক্স লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'আর কি কথা?'

সুকুমারী বাম হস্ত দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আর একটা কাজ ক'র্‌তে হবে। আজ, তুমি একবার ননীগোপালকে আমার নিকট এনে দেবে। বড়-দিদি যেন টের না পায়, তা হ'লে ত জানই—সর্ব্বনাশ হবে। ছেলেটাকে মেরে খুন ক'রে ফেল্‌বে'

সুকুমারী মুখ আবৃত্ত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেজ-বৌ পুনরপি তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল—সেই দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মেজ-বৌ ননীগোপালকে আনিয়া সুকুমারীর নিকট দিল। সুকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে উহাকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিল। ননীগোপাল আজ অনেক দিনের পর কাকী-মার কোলে আসিয়াছে। এখন বালক সুন্দররূপে কথা কহিতে পারে। কাকী-মাকে কাঁদিতে দেখিয়া অবোধ বালক জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কাঁদিস্ কেন, কাকী-মা?'

সুকুমারী চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'কৈ, না—কাঁদ্‌ব কেন?'

ননী। তুই কাঁদ্‌লে আমি তোর কোলে থাক্‌বো না।

'না, আমি কাঁদ্‌ব না' বলিয়া সুকুমারী একটু স্থির হইল। আপন হস্তে একটা কচি শশা ছাড়াইয়া তাহা কাটিয়া ননীকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে লাগিল, তাহার চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে আজ ভাবের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। ননীগোপালের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে মাখনলালের ক্ষুদ্র মুখখানি মনে পড়িল, আর মন্দভাগিনী স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। অনেক চিন্তার পর মৃত্যুতেই তাহার শ্রেয়ঃ বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া সুকুমারী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'ননীগোপাল!'

ননীগোপাল ঘাড় ফিরাইয়া রোরুদ্যমানা কাকী-মার দিকে চাহিল। সুকুমারী কাঁদিয়া বলিল, 'দেখ্ ননীগোপাল!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। ননীগোপাল বলিল, 'কি কাকী-মা!'

'তুই লেখা পড়া করিস্।—দুষ্টুমি করিস্ না।—কারুর মন্দ করিস্ না—'

বলিতে বলিতে হতভাগিনী গভীর দুঃখের সহিত কাঁদিতে লাগিল। ননীগোপাল তাহার ক্রন্দন দেখিয়া বলিল, 'তুই কাঁদিস্ কেন?—তোর পেট ব্যথা ক'চ্ছে—বল্, কি হয়েছে?'

অবোধ শিশু এইরূপ নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইল না। অবশেষে ননীগোপাল অপেক্ষাকৃত ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকী-মা! তোর খোকা কৈ?'

অশ্রুমুখী সুকুমারীও মস্তকে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, 'আমার খোকা কোথা গেল?'

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

চিহ্ন ডুবাইব ?—ছি !

শোকে, দুঃখে, মর্ম্মযাতনায় ও অতীত স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনে অধীর হইয়া, মন্দভাগিনী পাগলিনী উদ্বন্ধনে বা জলনিমজ্জনে প্রাণত্যাগ করিবে, স্থির করিল। মৃত্যুর ভীষণ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারী মুক্তকেশীর নিকট গেল। মেজ-বৌ তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাকে এরূপ দেখাচ্ছে কেন, বোন্ ?'

পাগলিনী মেজ-বৌর কথার উত্তর না দিয়া ব্যগ্রতাসহকারে, দৃঢতার সহিত বলিল, 'দিদি ! তোমায় আজ আমার শেষ-কথা ব'ল্‌ব।'

'শেষ-কথা ! ছি ! এমন কথা মুখে আন্‌তে নাই।'

'তবে তোমার নিকট বলা হ'ল না।'

এই কথা বলিয়া পাগলিনী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিল। মুক্তকেশী পাগলিনীর বাক্যের দৃঢ়তা দেখিয়া ভীত হইল, পশ্চাৎ হইতে সুকুমারীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া তাহাকে থামাইল, তৎপরে কাঁদ-কাঁদ-স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, 'ছোট-বৌ ! অত ব্যস্ত হইও না—আমার কথা শোন। কা'ল প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে, তোমার গহনার বাক্স লইলে তুমি আমার কথা রাখ্‌বে, আর আমার নিকট মনের কথা খুলে ব'ল্‌বে। তোমার কথা আমি রেখেছি, এখন আমার কথা তোমাকে রাখ্‌তে হবে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা বল না, তা জানি। বল, আমার কথা রাখ্‌বে কি না ?'

সুকুমারী দ্রুত বলিল, 'কি কথা ?'

মুক্তকেশী সুকুমারীর হাত ধরিয়া বলিল, 'রাখ্‌বে—বল ?'

সুকুমারী। রাখ্‌ব।

মুক্তকেশী। ঠিক্ ?

সুকুমারী। ঠিক্ বৈ কি!

মুক্তকেশী। তবে, তোমার মনের কথা আমাকে খুলে ব'লতে হবে।

সুকুমারী। মনের কি কথা?

মুক্তকেশী। বল, তুমি কেন এমন ক'রছ?

সুকুমারী। কৈ—কি ক'রছি?

মুক্তকেশী। খাও না, দাও না; রাত্রে ঘুমাও না। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে থেকে, আধপেটা খেয়ে, ভেবে ভেবে সারা হ'লে। একবার চেয়ে দেখ দেখি, কি শরীর কি হ'য়ে গ্যাছে! সাহেব যে টাকাগুলি দিয়েছিল, সবগুলি বিলিয়ে দিলে। পাঁচ হাজার টাকার দলিলখানা আগুনে পুড়িয়ে ফেল্লে! ছি! এমন কর কেন বোন্?

আমরা একটি কথা বলি নাই। সুকুমারীর সাহেব-প্রদত্ত সেই পাঁচশত টাকা সমস্তই গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অনাথ ও পিতৃ-মাতৃহীন বালকবালিকাগণকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিল। মুক্তকেশীর কথার উত্তরে সুকুমারী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, 'সব যাক্—এই শরীর, টাকা পয়সায় আর আমার দরকার কি? আমার খেলা সাঙ্গ হয়ে গ্যাছে!'

মেজ বৌ নিজের দুই হস্ত দ্বারা সুকুমারীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "তোমার হাতে ধ'রে বলছি, আমার অনুরোধ রাখ—তুমি কেন এমন ক'রছ, আমাকে খুলে বল, আমি ত আর এখন তোমার শত্রু নই!"

পাগলিনী উত্তর প্রদান করিল না। তাহার চক্ষু দুটি ছলছল্ করিতে লাগিল। মেজ-বৌ আপন চক্ষু মুছিয়া অতি কাতরস্বরে বলিল, 'আমাকে বিশ্বাস ক'রে কোন কথা ব'লবে না, বোধ হয়। ব'লবে কেন?—আমি যে তোমার কত অনিষ্ট ক'রেছি। আমি তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি। কুলোকের মন্ত্রণা শুনে কত গালাগালি ক'রেছি। বলিয়া মেজ-বৌ কাঁদিতে

লাগিল। 'মাকে কত দুর্ব্বাক্য ব'লেছি। আমরাই ত তোমার সর্ব্বনাশের মূল। আমরা যদি ভাল হ'তাম, তবে হয় ত ঠাকুরপো বিদেশে যেতেন না, এ সর্ব্বনাশ হ'ত না। পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব ভাই?'

মুক্তকেশী ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিল না। তাহার গণ্ড বহিয়া দর-দর করিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল! পূর্ব্ব-কথা মনে করিয়া অনু-তাপানলে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সুকুমারীও কাঁদিয়া ফেলিল। মুক্তকেশীর মুখ মুছাইয়া দিয়া পাগলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ছি! কেঁদ না, তোমার দোষ কি দিদি! যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছি, তেমন হবে বৈ কি!'—আর কি ব'ল্লে—'তোমায় বিশ্বাস ক'র্‌ব না!' তুমি আমার কত উপকার ক'রেছ, আমি কি তা ভুলে গেছি? যে দিন বাড়ী-ঘর যথাসর্ব্বস্ব পুড়ে গেল, সে দিন তোমরাই ত আমাদের বাঁচালে! তোমাদের ঘরেই ত আমাদের মাথা রাখ্‌বার স্থান হ'য়েছিল। তোমার ঘরেই ত আমার সোণার চাঁদ আর মা শেষ শোয়া শুয়ে গেল!'

সুকুমারী আর কথা বলিতে পারিল না। উভয়ে কাঁদিতে লাগিল। নিকটে সান্ত্বনা-বাক্য বলিবার লোক ছিল না। সুতরাং উভয়ে অনেকক্ষণ কাঁদিল, তার পর সুকুমারী পাগলিনীর ন্যায় কর্কশ-স্বরে বলিল, 'তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌ব না, ত ক'র্‌ব কাকে? আমার পেটের বোন্ ছিল না—গৃহদাহের দিন হ'তে আমি বোন্ পেয়েছি—তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌ব না!'

মুক্তকেশীর হৃদয় আজ শোকে ও অনুতাপে পূর্ণ। সুকুমারীর কথা শুনিয়া তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের সহিত কাঁদিতে লাগিল, সুকুমারী আপন চক্ষু মুছিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন-স্বরে বলিল, 'আমার মনের কথা শুন্‌তে চাও? তবে শোন, কিন্তু কাকেও ব'ল্‌তে পার্‌বে না—গিরিকেও না।'

মুক্তকেশী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সুকুমারীর দিকে চাহিয়া রহিল। সুকুমারী গদ্গদস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'দিদি! দিদি!

আমার মনের কথা শুন্‌বে—মনের কথা—মনের কথা কি আর মাথা মুণ্ডু, আমি অনেক সয়েছি, আর সইতে পারি না—যাতনায় আমার প্রাণ বের হ'য়ে যাচ্ছে—পারি না। তাই স্থির ক'রেছি, দিদি! আমি কারো কথা শুন্‌ব না, কারো বারণ মান্‌ব না—আমি আজই আত্মহত্যা ক'র্‌ব। নিশ্চয় আজই,—মানুষে আর কত সইতে পারে, দিদি?'

সুকুমারী নির্ব্বাক্ হইল। মেজ-বৌ তাহার কথা শুনিয়া একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। সেও কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুকুমারীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, 'বোন্‌—এমন কথা মুখে এনো না। যিনি বিপদে ফেলেছেন, তিনিই উদ্ধার ক'র্‌বেন। আর যদি বোন্, তুমি আমার কথা না শোন, তবে জেনো, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিশ্চয় গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌ব—এ আমার প্রতিজ্ঞা!'

সুকুমারী। ছি! দিদি, তোমার দুঃখ কিসের?

মুক্তকেশী। তুমি আমাদের মায়া ত্যাগ ক'র্‌লে, আমার জীবনে প্রয়োজন নাই, বোন্! আমার সুশীলা, সরলা কি তোমার মেয়ে নয়? ওদের দু'জনকে তোমায় দিলাম, তুমি ওদের মা—ওদের ফেলে তুমি কোথায় যাবে? ওদের জন্য কি তোমার দুঃখ হবে না?

সুকুমারী। ওদের দেখ্‌লে আমি পাগল হই—তাই ত ম'র্‌তে চাই; তবু দিদি, তুমি ওদের আমার কাছে আস্‌তে দেও। কিন্তু বড়-দিদি যদি ননীকে আমায় একটু কোলে নিতে দিত, তবে আমার এত দুঃখ থাক্‌ত না।

এমন সময় সরলা কাছে আসিল, মায়ের ক্রন্দন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল। মুক্তকেশী তাহাকে সুকুমারীর কোলে বসাইয়া দিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'আমার সরলাকে তোমায় দিলাম, এখন যা ইচ্ছা তাই কর।'

বলিয়া মুক্তকেশী চক্ষু মুছিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। সুকুমারী রোরুদ্যমানা বালিকার মুখ মুছাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মুখ-চুম্বন করিল, অমনি তাহার হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হইল—চক্ষু হইতে টস্‌-টস্

করিয়া জল পড়িতে লাগিল, পূর্ব্বসঙ্কল্প টল-টল করিতে লাগিল। মুক্তকেশী বুদ্ধি স্থির করিয়া বলিল, 'আর বোন্! তুমি যে অন্তঃসত্ত্বা, তা কি তোমার মনে নাই? তুমি আত্মহত্যা ক'র্লে আত্মহত্যা ও শিশুহত্যার পাপ হবে। তোমার পেটে ঠাকুরপোর শেষ-চিহ্ন আছে—তা কি তুমি লোপ ক'র্বে?' বলিয়া মুক্তকেশী আবার কাঁদিতে লাগিল। তাহার শেষ-কথায় সুকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সুকুমারী ভাবিল, 'স্বামীর শেষ চিহ্ন' লোপ করিব? আমার কষ্ট হয় বলিয়া স্বামীর 'চিহ্ন' ডুবাইব?—ছি! আমি কি পাগল হ'য়েছি? ম'র্তে হয়, আর দুদিন বাদে ম'র্ব—এখন মরা হল না। প্রসবের পর স্বামীর সন্তান মুক্তকেশী বা গিরিবালার হাতে সঁপিয়া দিয়া আত্মহত্যা ক'রব—পূর্ব্বে মরা হবে না।'

স্বামীর 'শেষ-চিহ্ন' দেখিবার জন্য সুকুমারী ব্যাকুলা হইল। আপাততঃ সে মৃত্যুসঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

রামকমলের কথা

আমরা অনেকক্ষণ রামকমল, মহামায়া ও তাহাদের পুত্রকন্যাগণের সংবাদ লইতে পারি নাই। রামকমল দিনদিনই বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। এদিকে দেশে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, নিষ্ঠুর রামকমল ভ্রাতৃগণকে প্রবঞ্চনা করিয়া, সমস্ত পৈতৃক ধনসম্পত্তি, বিষয়াদি হস্তগত করিয়া, নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। অধমর্ণগণ প্রতিদিনই দলে দলে রামকমলের নিকট টাকা ধার করিতে আসিতে লাগিল। রামকমলও মানুষ বুঝিয়া টাকা দিতে লাগিল। এ সব দেখিয়া মহামায়ার হৃদয়খানা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। রামকমল সকল খতেই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লিখিয়া লইত এবং ছলে, বলে, কৌশলে, যেরূপেই হউক, তাহা

আদায় না করিয়া ছাড়িত না। এইরূপে তাহার বেশ দু পয়সা প্রাপ্তি হইতে লাগিল। কিন্তু ধন-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাহার শত্রুও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রামকমল দরিদ্র কৃষকের নিকট হইতে মাসিক শতকরা পাঁচ টাকা, ছয় টাকা হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায় করিত, কখনও কাহাকে একটি পয়সাও মাপ করিত না। কড়ার মত টাকা দিতে না পারিলে, মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিত এবং কাহারও থালা, ঘটি, বাটি, কাহারও গরু বাছুর, কাহারও লেপ-কাঁথা, কাহারও বা ঘর-দরজা বিক্রী করিয়া টাকা আদায় করিত। মামুদ বেপারী নামক একজন নিরীহ কৃষক রামকমলের নিকট হইতে পঁচিশ টাকা ধার নিয়াছিল। মামুদ ঐ টাকার সুদস্বরূপ রামকমলকে নানা তারিখে সত্তর টাকা প্রদান করিয়াছে, তবুও সে ঋণমুক্ত হইতে প্যারে নাই। রামকমল প্রাপ্ত টাকা সমস্ত বাদ না দিয়াই মামুদের নামে নালিশ উপস্থিত করিয়া মামুদের বিরুদ্ধে তিপ্পান্ন টাকা ডিক্রী করিল। মামুদ শুনিয়া একবারে অবাক্ হইয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। কত অনুনয়-বিনয় করিল, কিন্তু নির্ম্মম রামকমল কোন কথায়ই কাণ দিল না। গত্যন্তর না দেখিয়া, মামুদ স্ত্রীপুত্রের গহনা বিক্রয় করিয়া ত্রিশ টাকা সংগ্রহ করিল এবং তাহা রামকমলের হস্তে দিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'আজ ত্রিশ টাকা দিলাম, যদি আপনি একান্তই মাপ না করেন, তবে বাকি তেইশ টাকা ক্ষেতের ধান বিক্রী ক'রে দেব। আপনার পায় পড়ি, আমায় এক মাস সময় দিন।' রামকমল টাকা গ্রহণ করিল, কোন কথা বলিল না। প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে মনে করিয়া মামুদ একটু সুস্থির হইয়া গৃহে গেল। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিল, তাহার বাড়ীর আঙ্গিনায় আদালতের একজন প্যায়দা এবং রামকমলের পক্ষের চারি পাঁচ জন লোক বসিয়া রহিয়াছে মামুদের প্রাণ উড়িয়া গেল। প্যায়দা রুক্ষস্বরে বলিল, 'তিপ্পান্ন টাকা দিতে পার ত দেও, নইলে তোমার যা কিছু আছে, এখনি নীলামে বিক্রী হবে।'

মামুদ ভীত হইয়া বলিল, 'তিপ্পান্ন টাকা!—বল কি? কা'ল যে আমি ত্রিশ টাকা দিয়ে একমাসের সময় নিয়ে এসেছি। সময় না পাই না পাব, এই ত্রিশ টাকাও কি উসুল পাব না?'

হৃদয়শূন্য রামকমল ইচ্ছা করিয়াই প্যায়দা বা তাহার প্রেরিত লোকের নিকট টাকা-প্রাপ্তির কথা বলিয়া দেয় নাই। সুতরাং মামুদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না, তাহার গরু, বাছুর, থাল, ঘটি, বাসন, যাহা কিছু ছিল, সমস্ত প্রকাশ্য নীলামে বিক্রী হইয়া গেল। মামুদ সে দিন সপরিবারে উপবাসী রহিল।

রামকমল এইরূপে অসংখ্য লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। রামকমলের চক্রে পড়িয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অসংখ্য লোক তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই প্রতিহিংসার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল।

মহামায়া পতির ধনবৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইল বটে; কিন্তু এখনও বাড়ীখানা ষোল আনা দখল করিতে পারিল না, সুকুমারীকে তাড়াইতে পারিল না বলিয়া তাহার শান্তিসুখে কিছু বিঘ্ন হইতে লাগিল! সুকুমারীর জন্য স্বর্ণকমল পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছে, শুনিতে পাইয়া, মহামায়া একবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্বামীর নিকট গিয়া বলিল, 'আপদ্ যে শেষ হ'য়েও হয় না! শুন্‌তে পাচ্ছ—ছোট-বৌর জন্য নাকি পাঁচ হাজার টাকা রেখে গ্যাছে। ওর যদি খাবার সংস্থান থাকে, তবে যে ওর দেমাকে এ বাড়ীতে থাকা দায় হবে। এর যা হয়, একটা কিছু কর।

'চিন্তা কি?—সব হবে।'

বলিয়া রামকমল মহামায়াকে আশ্বস্ত করিল এবং সুকুমারীর প্রতি তাহার শেষ কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল।

রামকমলের জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দগোপাল এখন পাঠশালায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শৈশবের মাতৃ-দত্ত কুশিক্ষাক্রমে তাহার চৌর্য্যবৃত্তি দিন দিন প্রবল হইয়াছে। নন্দগোপাল প্রতিদিন পাঠশালা হইতে

সমপাঠিগণের কাগজ, কলম, পেন্‌শিল, ছুরী, জলখাবার পয়সা ইত্যাদি চুরি করিয়া আনিয়া মায়ের কাছে দেয়। মহামায়া এজন্য একদিনও পুত্রকে তিরস্কার বা প্রহার করে নাই, বরং পুত্রের দ্বারা কিছু কিছু লাভ হইতেছে দেখিয়া তাহাকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছে। ক্রমে নন্দগোপালের সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমেই সে মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। নন্দগোপাল চুরির এরূপ কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল যে, অনেক দিন পর্যান্ত গুরুমহাশয় বা ছাত্রগণ কে চুরি করিতেছে চেষ্টা করিয়াও তাহা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। শিক্ষক মহাশয় অনুমানে দুই তিনটি দরিদ্র বালককে বিনা দোষে প্রহারও করিয়াছেন, নন্দগোপাল সম্পন্নলোকের পুত্র বলিয়া কেহই তাহাকে সন্দেহ করে নাই। ক্রমে কিন্তু নন্দগোপালের উপরই সকলের সন্দেহ পড়িল। তাহার নিকট পাঠশালার কোন ছাত্র বসিতে চাহে না। পাঠশালার ছুটীর পর সকল ছাত্র সমস্বরে 'চোর গোপাল' 'চোর গোপাল' বলিয়া নন্দগোপালকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল। গুরুমহাশয় দুই তিন দিন নন্দগোপালকে তিরস্কার ও প্রহার করিলেন, কিন্তু সেই চোরবালক কিছুতেই অপরাধ স্বীকার করিল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তার সহিত চুরি অস্বীকার করিয়া পরের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে লাগিল। ক্রমে রামকমল ও মহামায়ার কর্ণে এ সব কথা পৌঁছিল। রামকমল পুত্রের প্রকৃতি অবগত ছিল, কিন্তু সম্মানের খাতিরে সে একদিন গুরুমহাশয়কে বলিল, 'মহাশয়! নন্দগোপালকে আর অমন ক'রে কেউ চোর-টোর ব'লবেন না—আজ সাবধান ক'রে দিলুম; ভদ্রলোকের ছেলেকে চোর বলা, বড় সহজ অপরাধ নয়'।

গুরুমহাশয় ভীত হইয়া ছাত্রগণকে সাবধান করিয়া দিলেন, সে অবধি নিজেও আর নন্দগোপালকে কোন কথাটি কহিতেন না। রামকমল পুত্রকে কিন্তু একটি কথাও বলিল না। মহামায়া নন্দগোপালকে বলিল, 'তোকে যখন ছোটলোকের ব্যাটারা চোর চোর বলে, তুই ওদের যা পাস্, বেশ ক'রে চুরি ক'রে এনে আক্কেল দিস্।'

নন্দগোপাল গৃহে উৎসাহ পাইল, পাঠশালায়ও তাহাকে ভয়ে কেহ কোন কথা বলে না। সুতরাং তাহার বেশ সুযোগ ঘটিল—সাহসও বৃদ্ধি হইল। একদিন পাঠশালার ছুটীর পর বাড়ী আসিয়া সে পাড়ায় খেলা করিতে গেল, নিকটবর্ত্তী ঘোষেদের বাড়ীর একটি শিশুর হস্তে স্বর্ণবলয় দেখিয়া তাহার লোভ হইল। সে শিশুকে একটি পেয়ারা দিয়া ভুলাইয়া, তাহার হাতের বালা খুলিয়া তাহা লইয়া ছুটিয়া গৃহে গেল এবং নবলক্ষ্মীর নিকট ব্যস্ততা-সহকারে বলিল, 'দেখ্ দিদি! কি এনেছি!'

কাপড়ের অভ্যন্তর হইতে স্বর্ণবলয় দু'গাছি বাহির করিয়া নবলক্ষ্মীর হস্তে দিয়া সে বলিল, 'এ সোণার তৈয়ারী! বিক্রী ক'রে ঢের পয়সা হবে, জানিস্! সে পয়সা দিয়ে তোতে আর আমাতে সন্দেশ কিনে খাব, খেল্না কিন্‌ব, বাঁশী কিন্‌ব। তোর কাছে এখন রেখে দে। দেখিস্, মাকে যেন বলিস্ না—ব'ল্লে সে নিয়ে যাবে—আমাদের সন্দেশ খাওয়া হবে না, জান্‌লি?'

নবলক্ষ্মী প্রীতিপ্রফুল্ল-মুখে বলিল, 'তা, ব'ল্‌ব কেন?'

একটি মৃণ্ময় হাঁড়ির মধ্যে স্বর্ণবলয় দুটি লুকাইয়া রাখিয়া, নবলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে বাহিরে গেল।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ধরা পড়িল

সুকুমারীর বিপদের উপর বিপদ্ দেখিয়া নির্দ্দয় নির্ম্মম রামকমলের কঠিন হৃদয়েও একটু দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য মাত্র। যে মুহূর্ত্তে সে শুনিতে পাইল যে স্বর্ণকমল স্ত্রীর জন্য পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে রামকমল পুনরায় পূর্ব্ব-মূর্ত্তি ধারণ করিল। রামকমল যে জাল উইল প্রস্তুত করিয়া নিজে পৈতৃক

ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছে, পাঠক-পাঠিকাগণের বোধ হয় তাহা স্মরণ আছে। সেই উইলখানা বলবৎ করিবার জন্য এখন তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল। স্বর্ণকমল মরিয়া গিয়াছে, তাহার একমাত্র পুত্রও ইতিপূর্ব্বেই মরিয়া গিয়াছে। সুকুমারী ত পাগলিনী। কৃষ্ণকমল এখন পূর্ব্ববৎ রামকমলের আজ্ঞাবহ না থাকিলেও তাহাকে বাধ্য করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে না। রামকমল এইরূপ চিন্তায় উৎসাহিত হইল। সুকুমারী যে গর্ভবতী, তাহা সে জানিতে পারিয়াছে। তাহার গর্ভে একটি পুত্র হইলে, হয় ত গ্রামের লোক তাহার পক্ষাবলম্বন করিবে। সে সময় উইলের মোকদ্দমায় কৃতকার্য্য হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইবে। এজন্য আর বিলম্ব না করিয়া, উইলখানার একটা কুলকিনারার কথা সে কর্ত্তব্য মনে করিল। উকীল-মোক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকমল একজন প্রজার নামে বাকি খাজনা আদায়ের জন্য নালিস করিল, প্রজা দেনা স্বীকার করিল বটে; কিন্তু বলিল যে, খাজনার টাকা একা রামকমল পাইবে না—তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকমল এবং সর্ব্ব-কনিষ্ঠ স্বর্ণকমলের বিধবা পত্নীও ইহার অংশ পাইবেন। রামকমল বলিল যে, '১২৭০ সনের ৯ই ভাদ্র তারিখের পিতৃকৃত উইলের মর্ম্মানুসারে তিনি পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির একমাত্র মালিক।' তাহার কথার পোষকতার জন্য, রামকমল 'মা দুর্গার' নামে মহিষ মানসিক করিয়া সেই কৃত্রিম উইলখানা আদালতে দাখিল করিয়া দিল। দেশে কৃত্রিম উইলের বিবরণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে এ কথা দীনেশবাবুর কাণে গেল। দীনেশবাবু তখন নিজ জমিদারীর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু বন্ধু-পত্নীর স্বার্থলোপভয়ে এবং দুষ্টবুদ্ধি রামকমলকে শিক্ষা দিবার জন্য, কালবিলম্ব না করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন এবং উইলের কৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। রামকমল ভীত হইল।

এ দিকে রামকমল নিজ দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা গ্রামের সকল লোককে শত্রু

করিয়াছে। কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। বিশেষতঃ তাহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়াই যে, স্বর্ণকমল বিদেশী হইয়া, বিদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার পাপ-চক্রান্তেই যে মাখনলাল ও বৃদ্ধা জননী পুড়িয়া মরিয়াছে, এ কথা জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। ইহার পর, অত্যাচারী রামকমল আবার কৃত্রিম উইল প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণকমল ও স্বর্ণকমলের অনাথা ভার্য্যাকে প্রবঞ্চনা করিবার যোগাড় করিতেছে শুনিয়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে, নিমন্ত্রণবাড়ীতে—সর্ব্বত্র রামকমলের কথা উঠিতে লাগিল—সকলেই প্রায় প্রকাশ্যভাবে রামকমলকে প্রবঞ্চক, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর-হৃদয়, অবিবেচক, ভ্রাতৃ-হন্তা, মাতৃ-ঘাতক, ভ্রাতুষ্পুত্র-হন্তা জালিয়াৎ ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ অভিসম্পাত করিতেও ছাড়িল না। এতদিন তাহার কুব্যবহার ও অত্যাচারে যাহারা মুখব্যাদন করে নাই, আজ তাহারা তাহার প্রত্যেক কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিল, প্রত্যেক কার্য্যে তাহার জঘন্যতা ও দোষ বাহির করিতে লাগিল, সমস্ত পল্লী আজ তীব্র সমালোচক ও স্পষ্টবাদী হইয়া উঠিল। কেহ কেহ বলিল, 'দীনেশবাবু যখন রামকমলের পাছে লেগেছেন, তখন এবার নিশ্চয়ই তার শিক্ষা হবে। দীনেশবাবু বড় জমিদার; তাঁর সঙ্গে বুঝ করা রামকমলের কাজ নহে।'

রামকমলের পক্ষে উইল প্রমাণ করিবার জন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী উপস্থিত হইল না, উইলখানা জাল সাব্যস্ত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ৺কালীকান্ত রায়, উদ্ধবচন্দ্র পাল নামক একজন মহাজনের গণেশপুরের গদীতে কার্য্য করিতেন। মহাজন একজন দায়িকের বিরুদ্ধে তিন হাজার টাকা দাবিতে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ১২৭০ সনের ৯ই ভাদ্র তারিখে ৺কালীকান্ত রায় ঐ মোকদ্দমায় জেলায় সাক্ষী দিয়াছিলেন। জেলা গঙ্গাতীর হইতে দেড়

দিনের পথ। উদ্ধবচন্দ্র পাল এইরূপ সাক্ষ্য দিলেন। ৯ই ভাদ্র তারিখে গঙ্গাতীর হইতে উইল লিখিয়া জেলায় যাইয়া সাক্ষ্য দেওয়া যেরূপ অসম্ভব—জেলায় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া উইল লেখাও তেমনি অসম্ভব। সুতরাং হয় উইল কৃত্রিম, নতুবা উদ্ধবচন্দ্র পালের সাক্ষ্য মিথ্যা। বিচারক উক্ত মোকদ্দমার নথি তলপ দিয়া আনিয়া দেখিলেন যে, ৺কালীকান্ত সত্য-সত্যই ১২৭০ সনের ৯ই ভাদ্র তারিখে জেলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার জবানবন্দী ঐ নথিতে আছে। বিচারক রামকমলের উপর অতিশয় চটিয়া গেলেন, রামকমল একা খাজনা পাইবার অধিকারী নহে বলিয়া তাহার দাবি ডিস্‌মিস্ করিলেন এবং জাল উইল প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া এক দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া রামকমলকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

রামকমল কারাবাসে

রামকমল ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইয়াছে শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল। সে অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অনেকের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছে, অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকে পাঁচ টাকা ধার দিয়া পঞ্চাশ টাকা সুদ আদায় করিয়াও মূল টাকার জন্য তার বাড়ী-ঘর নীলাম করিয়াছে, অনেকের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া জ্বালাতন করিয়াছে। তাই আজ তাহার বিপদে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। প্রতিহিংসার জন্য কত লোকের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মামুদ বেপারী প্রথম সুযোগেই রামকমল ও তাহার স্ত্রীকে, যেমন করিয়া হউক, এক দিন সাধ মিটাইয়া প্রহার করিবে, স্থির করিয়াছিল। আজ এ সংবাদ শুনিয়া সে একটু আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু স্বহস্তে প্রহার করিবার সঙ্কল্প একবারে ত্যাগ করিতে পারিল না। গঙ্গাতীর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের এক ব্যক্তিও রামকমলের এ বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ

করিল না,' বরং সকলেই তাহার অমঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'পাপ কত কাল গোপন থাকে?—ভগবান্ আর কত সইবেন?' কেহ বলিল, 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। দেখ দেখি—পিতার নাম জাল করিল, মোহর জাল করিল, লেখা অবিকল জাল করিল। সব ঠিক—কোনরূপ একটু কিছু খুঁত নাই, কিন্তু কেবল ঐ এক তারিখের গোলমালে ধরা প'ড়ে গেল।—ভগবানের লীলা বুঝা ভার।' কেহ বলিল,' 'ধর্ম্ম কি নেই? এবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে; সে দিন আমি মহকুমায় গিয়েছিলুম, সেখানকার একজন বড়লোক আমায় ব'ল্লে যে, এবার রামকমলের পঁচিশ বছর জেল হবে।—যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। নরহন্তা, মাতৃ-ঘাতক, আপনার গর্ভধারিণী মাকে দগ্ধে মেরেছে। সেই বৃদ্ধার অভিসম্পাতের ফল এত দিনে ফলিতে আরম্ভ করিল। এরূপ সর্ব্বনেশে লোকের শাস্তি না হ'লে যে দেশ রসাতলে যাবে।'

মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটিবাবু রামকমলকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। সুকুমারী যখন শুনিতে পাইল যে, এবার রামকমলের কারাবাস হইবে, তখন সে একটু চিন্তিত হইল। রামকমলের প্রতি তাহার ভক্তি বা শ্রদ্ধা না থাকিলেও, ননীগোপাল ও মহামায়ার দুঃখে সে দুঃখিত হইল। সুকুমারী দুঃখের যাতনা ভুগিয়াছে, তাই অতি বড় শত্রুর দুঃখ দেখিলেও তাহার সরল হৃদয় দয়ায় অভিভূত হয়। তাই সুকুমারী ব্যস্ত হইল এবং ইহার প্রতীকার-চেষ্টা করিবে, স্থির করিল। কিন্তু দীনেশবাবু সুকুমারীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, 'এ সব নরঘাতক, নরপিশাচের শাস্তি না হ'লে যে দেশ অশান্তিময় হবে।—এবার আমি যেমন ক'রে পারি, ওকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব। তুমি এ সব কিছু বুঝ্‌তে পার না, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ ক'রো না।'

দীনেশবাবুর দৃঢ়তা দেখিয়া সুকুমারী টলিল না। রামকমলকে রক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে বলিল, 'দাদা! আমার

এই অনুরোধটি তোমায় রাখ্‌তেই হবে। তিনি যাতে এ যাত্রা রক্ষা পান, সে চেষ্টা তোমাকে ক'র্‌তেই হবে। তাঁর জেল হ'লে ননীগোপাল, নন্দগোপালের কি দশা হবে বল দেখি? একজন দোষীর সঙ্গে যে তিন চারি জন নির্দ্দোষ ব্যক্তি মারা প'ড়্‌বে!'

সুকুমারীর বিশেষ অনুরোধে দীনেশবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোকদ্দমাটি আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহকুমার ডেপুটীবাবু রামকমলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কাজেই মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। সুকুমারী এ সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইল।

রামকমল অনেক লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে, কিন্তু নিজে কথন তেমন বিপদ্‌গ্রস্ত হয় নাই। সুতরাং বিপদে পড়িলে মানুষের যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা সে ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হওয়া অবধি সে তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিল। এখন আর তাহার পক্ষে কেহ একটি কথা বলে না, কেহ তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না; এমন কি, যাহারা পূর্ব্বে রামকমলের সাক্ষাতে মধুর কথা বলিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছে, বরাবর তাহার পক্ষে থাকিবে বলিয়া আশা দিয়াছে, তাহারাও এখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে লাগিল। রামকমলের চক্ষু স্থির হইল, ইতিকর্ত্তব্যতা লোপ হইয়া আসিতে লাগিল, সে আজ চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কারাবাস-যন্ত্রণা ভুগিবার আশঙ্কায় তাহার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। মহামায়ার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, গর্ব্ব কমিয়া আসিল, প্রখর বাক্যবাণের ধার কমিয়া আসিল। সে একদিন কাঁদিয়া স্বামীকে বলিল, 'যত টাকা লাগে লাগুক্, তুমি এবার যাতে রক্ষা পেতে পার, তা কর।'

রামকমল উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার হস্তে অধিক টাকা ছিল না। চুরি, জুয়াচুরি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা দ্বারা সে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, সুদের আশায় তাহা পরের হস্তে অর্পণ করিয়াছে। নিজ প্রয়োজনের সময় সে অনেক

পীড়াপীড়ি করিয়াও টাকা আদায় করিতে পারিল না। সুতরাং অর্থা-ভাবেও তাহার কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। রামকমল ধনবান্ বলিয়া খ্যাত, সুতরাং পরের নিকট সহসা টাকা ধার চাহিতেও তাহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। রামকমল দীর্ঘকাল কারাবাস ভোগ করিবে, এই আশঙ্কায় কেহ তাঁহাকে টাকা দিতেও স্বীকৃত হইল না। এদিকে রামকমল অবস্থাপন্ন লোক বুঝিতে পারিয়া, উকীল, মোক্তার, তদ্বিরকারক, সাক্ষী প্রভৃতি সকলেই রামকমলকে শোষণ করিয়া টাকা আদায় করিতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া রামকমল অনেক পীড়াপীড়ি করায়, মহামায়া অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহার গহনাগুলি কাঁদিতে কাঁদিতে রামকমলের হস্তে দিল। তাহা বিক্রয় করিয়া কয়েকদিন খরচ চলিল মাত্র। অগত্যা রামকমল কূলকিনারা না দেখিয়া, নিজ খানাবাড়ী, ইষ্টকালয় ও সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি: আবদ্ধ রাখিয়া আরও তিন হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিল।

জেলার জজ উড্ সাহেবের এজলাসে রামকমলের মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। রামকমল বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কৃত্রিম উইলের সাক্ষিগণকে বাধ্য করিয়া, জেলায় লইয়া গেল। প্রধান প্রধান তিনজন উকীল নিযুক্ত করিল। বিপক্ষে গভর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন, দীনেশবাবু সুকুমারীর অজ্ঞাতে নিজ-ব্যয়ে আরও তিন জন উকীল নিযুক্ত করিলেন। 'দুষ্টের দমন'—নীতি অবলম্বন করিয়া দীনেশচন্দ্র এই মোকদ্দমাটী অতি যত্ন-সহকারে চালাইতে আরম্ভ করিলেন। রামকমলের পক্ষে মোকদ্দমা ভাল চলিল না! তাহার প্রধান সাক্ষী তাহার শ্যালক রাইমোহন। রাইমোহন উইলের সত্যতা সপ্রমাণ করিল, দস্তখত, মোহর, উইল লেখাপড়া ইত্যাদি সমস্ত তাহার সাক্ষাতে হইয়াছিল বলিল, উকীলের জেরায়ও বড় ঠকিল না, কিন্তু তবুও উড্সাহেব তাহার কথায় বড় বিশ্বাস করিলেন না। তাহার দ্বিতীয় সাক্ষী, পৈতৃক সম্পত্তির তহশিলদার সেই মথুরানাথ পাল। রামকমল মথুরানাথকে নগদ পাঁচ শত টাকা দিয়াছে, তাহার

তহশিলী দেনা টাকা লইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে এবং মোকদ্দমায় জয়লাভ হইলে তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। কিন্তু মথুরানাথ উকীলের কূট-প্রশ্নে আত্মগোপন করিতে পারিল না। জজসাহেব তাহাকেও বিশ্বাস করিলেন না! একে একে রামকমলের সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইল। সাহেব রামকমলকে মনে মনে দোষী স্থির করিয়াছিলেন, সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াও তাঁহার সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল না। রামকমলের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী ছিলেন, উদ্ধবচন্দ্র পাল ও আমাদের দীনেশবাবু। ইহাদের জবানবন্দীতে রামকমলের প্রকৃত চরিত্র বাহির হইয়া পড়িল। প্রতারণা, প্রবঞ্চনাই যে তাহার কার্য্য, পরের সর্ব্বনাশ-সাধনেই যে তাহার আনন্দ, দ্বেষ, হিংসা ও স্বার্থসাধনেরই যে সে চিরদাস, কোনরূপ সৎপ্রবৃত্তি যে তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, বিচক্ষণ বিচারক জজসাহেব তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। জুরীরা একবাক্যে আসামীকে 'দোষী' স্থির করিলেন। জজসাহেব রামকমলের প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর 'কারাবাস' দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। পুলিশ-প্রহরীরা রামকমলের হস্তপদে লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া, তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে কারাগারে লইয়া গেল। আর রাইমোহন ও মথুরানাথ পাল এই মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে বলিয়া জজসাহেব তাহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিলেন। বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। অন্যান্য সাক্ষীরা মূর্খ ও নীচশ্রেণীর লোক বলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও রামকমল মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। নগদ যাহা কিছু ছিল, তাহা গিয়াছে, স্ত্রীর গহনাপত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছে—তদুপরি তিন হাজার টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। রামকমলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে—মুক্তিলাভ করিয়া সকল দায়িকের নামে নালিস করিয়া, টাকা আদায় করিয়া, অবিলম্বে ঋণমুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু যখন সাহেব তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন, প্রহরীরা তাহার হস্তপদে লৌহবলয় পরাইতে লাগিল, তখন সে প্রায় চৈতন্য হারাইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন, সে শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার পর পুলিশ-প্রহরীরা যে তাহাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে জেলের দিকে লইয়া যাইতেছিল, অব্যবস্থিতচিত্ত নষ্টবুদ্ধি রামকমল প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পর্য্যন্ত তাহা টের পায় নাই। যখন সে তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল, তখন তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল—তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন রাজপথের সমস্ত লোকই তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতি ঘৃণায় অঙ্গুলি প্রদর্শন করিতেছে এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহাকে কারাগৃহের প্রকাণ্ড লৌহফটকের নিকট লইয়া গেল। সেই ফটক ও ভীষণমূর্ত্তি বন্দুকধারী প্রহরিগণকে দেখিয়া রামকমলের হঠাৎ বোধ হইল যেন, ইহা যমপুরীর দরজা! ভয়ে তাহার হৃদয় কণ্টকিত হইল। সেই ভয় বাড়াইবার জন্যই যেন যমকিঙ্করবৎ রক্তচক্ষু প্রহরিগণ তাহাকে প্রতি পাদবিক্ষেপে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিল। অবিলম্বে রামকমলের বেশ পরিবর্ত্তন হইল। থানধুতি, চিনাকোট,

ঢাকাই উড়ানী ও দেরাদুনের জুতা ছাড়িয়া তাহাকে একটা জাঙ্গিয়া ও একটা হাত-কাটা পিরিহান গায়ে দিতে হইল। নূতন বেশে রামকমল কারাগৃহে প্রবেশ করিল। সে দিন হইতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

সারারাত্রি রামকমল চক্ষু বুজিতে পারিল না। গভীর রজনীতে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূত, তখন রামকমল কম্বলশয্যা ও ইষ্টকনির্ম্মিত উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইল। অন্ধকারে তাকাইয়া তাকাইয়া সে দরজার নিকট আসিল, কিন্তু দরজা বাহিরের দিকে তালাবদ্ধ ছিল, সুতরাং তাহার বাহিরে যাওয়া ঘটিল না। রামকমল তখন সেই অন্ধকারে বসিয়া মস্তকে হাত দিয়া চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। বাড়ীর কথা তাহার মনে পড়িল, আর অমনি সে অতি দুঃখে কাঁদিতে লাগিল।

"স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণের কি দশা হইবে?—কে তাহাদের রক্ষা করিবে? কে তাহাদের ভরণপোষণ করিবে?—উপায় কি? এই সাত বৎসর কেমন করিয়া চলিবে? এক দিন, দু'দিন নয়! এক বৎসর দু'বৎসর নয়!—সাত সাত বৎসর!! কেমন করিয়া চালিবে? কি উপায় হইবে?"

ভাবিতে ভাবিতে রামকমল অতি দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। মহামায়ার হস্তে একটি পয়সাও ছিল না, তাহা সে জানিত। তাহার প্রাপ্য টাকাও যে কেহ আর দিবে না, এই সাত বৎসরে সমস্ত তামাদি হইয়া যাইবে তাহাও রামকমলের মনে উদয় হইল। হঠাৎ আর একটি চিন্তা উপস্থিত হইয়া রামকমলকে পাগল করিয়া তুলিল। মোকদ্দমার খরচ সংকুলনার্থ সে যে বাড়ী-ঘর, ইষ্টকালয় আবদ্ধ রাখিয়া তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, তাহা পরিশোধেরই বা উপায় কি? যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না হইলে, মহাজন তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিয়া, তাহার স্ত্রীপুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমস্ত দখল করিয়া বসিবে—রামকমল এই চিন্তায় অস্থির হইয়া গেল।

'হায়! হায়! তবে কি আমার স্ত্রীপুত্র নিজবাড়ী হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে?'

বলিতে বলিতে রামকমল পাগলের ন্যায় আপনার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্ত মর্দ্দন করিতে লাগিল। হঠাৎ স্বর্ণকমলের কথা আজ তাহার মনে পড়িল—রামকমল শিহরিয়া উঠিল। সেই কারাগৃহে সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে রামকমলের নিকট যেন একটি মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল—তাহা তাহার বৃদ্ধা জননীর অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তি! রামকমল মনঃকল্পিত মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া কারাগৃহের ইষ্টকনির্ম্মিত মেজের উপর পড়িয়া গেল। সেই পতনে তাহার মস্তকের একস্থানে একটি ক্ষত হইল, উহা হইতে রক্তপ্রবাহ ছুটিয়া রামকমলের জাঙ্গিয়া, কম্বল রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল। রামকমল তাহা জানিতেও পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উঠিয়া বসিল। তখন সে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রবল অনুতাপানলে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—'কেন আমি অর্থলোভে আপনার গলায় আপনি ছুরি বসাইলাম? আমি যদি ন্যায়-পথে থাকিতাম, তবে ত আজ আমার এমন দশা হইত না! অর্থের জন্য আমি কি না করিয়াছি?—বৃদ্ধ পিতাকে মনঃকষ্ট দিয়াছি, স্নেহের ভাই স্বর্ণকমলকে নিঃসম্বল করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া তাহাকে প্রাণে বধ করিয়াছি। বৃদ্ধা জননীকে প্রহার করিতে গিয়াছি!—অবশেষে নিজের মাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছি। আমার দশা কি হইবে?—মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর! আমি মাতৃবধ করিয়াছি, ভ্রাতৃবধ করিয়াছি, ভাইপো বধ করিয়াছি।—আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?—কিন্তু হায়! যে ধনের জন্য এত করিলাম, সে ধন এখন কোথায়?—এখন যে আমি ঋণগ্রস্ত! এই ঋণের জন্য মহাজন আমার স্ত্রীপুত্রকে নিজের গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবে! আমার স্ত্রীপুত্র এখন

পেটের দায়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। আহ্ন, আজ যদি স্বর্ণকমল থাকিত, তবে ত আমার এত দুঃখ হইত না! আমিই ত তাহাকে বিনাদোষে দেশত্যাগী করিলাম, আমিই ত তাহার মৃত্যুর কারণ। লোভেই সর্ব্বনাশ হইল!'

কাঁদিতে কাঁদিতে রামকমল অস্থির হইয়া সেই ইষ্টকোপাধানে মস্তক রক্ষা করিল। অশ্রুজল থামিল না! ইহারই মধ্যে তাহার একটু তন্দ্রা হইল—রামকমল ভীষণ স্বপ্ন দেখিল। দেখিল যেন—তাহার অর্দ্ধদগ্ধা জননী প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে লাল, নীল, সবুজ, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি নানারঙ্গের চিত্র-বিচিত্র শত-সহস্র বিষধর সর্প প্রকাণ্ড ফণা বিস্তার করিয়া রামকমলের দিকে চাহিয়া ক্রোধে শোঁ শোঁ করিয়া মেদিনী কাঁপাইতেছে! আর জননীর বামপার্শ্বে মস্তকশূন্য কৃষ্ণবর্ণ ও অতি স্থূলকায় কতকগুলি মানুষ প্রজ্বলিত মশাল হাতে লইয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার অর্দ্ধদগ্ধা জননী সেই প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশক্রমে রামকমলকে দেখাইয়া দিলেন, আর অমনি শত সহস্র সর্প অতি ক্রোধের সহিত অগ্রসর হইয়া তাহাকে 'সপাং সপাং' করিয়া দংশন করিতে লাগিল এবং মস্তক-বিহীন মনুষ্যগুলি প্রজ্বলিত মশাল দ্বারা রামকমলকে প্রহার করিতে লাগিল! রামকমল ভয়ে সত্যসত্যই চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া কারাগারের প্রহরিগণ তাহার প্রকোষ্ঠের নিকট আলো লইয়া আসিয়া, তালা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং রামকমলের বিকট চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রামকমলের হৃৎপিণ্ডটা তখন দপ্-দপ্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না। প্রহরীরা আলোক-সাহায্যে সমস্ত গৃহটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে রামকমলের পৃষ্ঠদেশে, কম্বল ও জাঙ্গিয়ায় রক্ত দেখিতে পাইল। তখনও রামকমলের মস্তক হইতে রক্ত-

প্রবাহ ছুটিতেছিল। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, 'এ রক্ত কোথা হইতে আসিল?'

রামকমল নিজ মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কম্বলে রক্ত দেখিয়া অবাক্ হইল। সে যে হতজ্ঞান হইয়া মেজেতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, 'এ রক্ত কোথা হইতে আসিল? তবে কি সত্য-সত্যই আমাকে সাপে দংশন করিয়াছে?'

প্রহরিগণের কথায় রামকমল কোন উত্তর দিতে পারিল না। প্রহরীরা তাহাকে দুর্ব্বোধ্য হিন্দিতে গালাগালি করিতে লাগিল। রামকমল তাহা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পরদিন প্রাতঃকালে প্রহরীরা রামকমলকে জেইলারের নিকট লইয়া গিয়া তাহার মস্তকের ক্ষতস্থান, রক্তাক্ত দেহ ও কম্বল দেখাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কতকগুলি কথা বলিল। জেইলারবাবু রামকমলের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, 'দেয়ালের গায় মাথা ঠুকিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছিলে! ধ্যাঃ পাজি হারামজাদ্, বসো মজা দেখ্‌বে!'

আত্মহত্যার চেষ্টা করা অভিযোগে রামকমল পুনরায় অভিযুক্ত হইল, আদালতে যথারীতি বিচার হইল। বিচারক রামকমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আত্মহত্যা ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলে?'

'না।'

'তোমার মাথায় ক্ষতচিহ্ন হ'ল কিরূপে?'

'আমি তার কিছুই জানি না।'

রামকমলের এই সত্যকথাও আজ কেহ বিশ্বাস করিল না—সময়ের এমনই গতি! তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ সাব্যস্ত হইল। সাহেব তাহার এক বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞা করিলেন। ছিল সাত বৎসর, হইল আট বৎসর। রামকমল ইতিপূর্ব্বে অনেক গুরুতর অপরাধ করিয়াও অব্যাহতি পাইয়াছে, আজ তাহার বিনা দোষে শাস্তি হইল! এখন হইতে সে কারাগৃহের মধ্যে

একজন চিহ্নিত মানুষ হইল। প্রহরীরা তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিত—অতি পরিশ্রমের কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করা হইত। তিরস্কার ও বেত্রাঘাত তাহার নিত্য সহচর হইল। প্রতি-রজনীতে শয্যাগৃহে যাইয়া রামকমল গভীর শোকে অভিভূত হইয়া কাঁদিত। রামকমল স্ত্রী-পুত্রকন্যার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে স্বর্ণকমল, জননী, ছোট-বৌ, মাখনলাল ইত্যাদির ভাবনাও না ভাবিয়া থাকিতে পারিত না। পূর্ব্বকৃত পাপের স্মৃতি, হতভাগা রাম-কমলকে পাগল করিয়া তুলিতে লাগিল। রামকমলের কারাবাস-বিবরণী বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আভাসে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রামকমল যেরূপ গুরু-পাপ করিয়াছিল, তেমনই গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

বিপদের উপর বিপদ্

'কুকথা বাতাসের আগে যায়' এই প্রবাদ-বাক্যটি মিথ্যা নহে। মোকদ্দমার ফল জানিতে মহামায়ার অধিক বিলম্ব হইল না। মহামায়া ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মহামায়া ইতিপূর্ব্বে অনেক দিন মায়া-কান্না কাঁদিয়াছে, স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সখের কান্না কাঁদিয়া অনেক দিন পারিবারিক কলহোৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অন্তকার ন্যায় দুঃখের কান্না সে আর কাঁদে নাই। গভীর যাতনায় অধীরা হইয়া মহামায়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনে পাড়ার সমস্ত বালক, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা একত্র হইল। স্বামীর জন্য সে তত দুঃখিত হইল না, যত হইল নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। 'আমার কি দশা হবে?—আমি কোথায় যাব?' ইহাই তাহার ক্রন্দনের মূল ভিত্তি হইল। এতদিন মহামায়া ধরাখানাকে শরা জ্ঞান করিয়াছে, ধন-সম্বলকে পৃথিবীর

একমাত্র সার বস্তু মনে করিয়া গৌরবভরে হেলিয়া দুলিয়া মাটীতে পা ফেলিয়াছে ; ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া পাড়াপ্রতিবেশিনী বা অন্য কাহারও প্রতি কখনও সুব্যবহার করে নাই ; দুর্ব্বাক্য ও মর্ম্মপীড়াদায়ক উক্তি ব্যতীত কাহাকেও ভুলিয়াও একদিন একটি প্রিয় কথা বলে নাই, পরের সুখ, সুবিধা, অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, স্বামীর ন্যায় মহামায়াও সকলের প্রতি ঘৃণামিশ্রিত তাচ্ছিল্য ও যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছে ; কিন্তু আজ একটি ঘটনায় তাহার সমস্ত পূর্ব্ব-ভাব যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মহামায়া এই সমস্ত পৃথিবীটা তাহার স্বামীর করতলগত মনে করিয়াছে—তাহার স্বামীর যে এমন দশা ঘটিতে পারে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই! যখন মহামায়া প্রথম শুনিল যে, তাহার স্বামীর 'মেয়াদ' হইয়াছে, তখন তাহার সে কথাটা মিথ্যা মনে হইল। সে ভাবিল, হিংসুক মানুষগুলি তাহাকে মনঃকষ্ট দিবার জন্য এই মিথ্যা জনরব করিতেছে ; কিন্তু যখন সে দেখিল যে, রামকমল, রাইমোহন ও মথুরানাথ পাল ব্যতীত উভয় পক্ষের আর সকল সাক্ষিগণ বাড়ী আসিল, তখন তাহার একটু আশঙ্কা হইল। অনতিবিলম্বে প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারিয়া, মহামায়া তাহার জীবনে প্রথম দুঃখের কান্না কাঁদিল। আজ সে পৃথিবীটা শূন্য দেখিতে লাগিল। কিছুকাল পরে মহামায়া একটু স্থির হইল। মনে করিল, এই কয়টা বৎসর সে পিত্রালয়ে যাইয়া কাটাইয়া আসিবে। তাহার জ্যেষ্ঠ রাইমোহন মহকুমায় মোক্তারী করিত, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ আছে। রাইমোহনের ভরসায় মহামায়া একটু স্থির হইল। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে যখন তাহার বড়দাদা রাইমোহনের প্রতিও কারাদণ্ডভোগের আদেশ হইয়াছে শুনিল, তখন মহামায়া সজোরে কপালে করাঘাত করিয়া পাগলিনীর ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তাহার পর মহামায়া জজ-সাহেবকে শত সহস্র গালাগালি করিতে লাগিল—দীনেশবাবুকে তাঁহার ন্যায্য অংশ প্রদান

করিতেও ভুলিল না। কিন্তু আজ মহামায়া কাঁদিয়া, গালিবর্ষণ করিয়া এবং অভিসম্পাত করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষু ফুলিয়া গেল, ভূমিতে লুটাইতে লুটাইতে তাহার শরীর ও বস্ত্র ধূলিধূসরিত হইল, গালিবর্ষণ ও অভিশাপ করিতে করিতে তাহার গলা ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তবুও মহামায়া আজ কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইল না।—চতুর্দ্দিক্ তাহার নিকট আজ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল 'বাবা গো' 'মামা গো' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহামায়ার ব্যবহারে কেহই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু তবুও তাহার এই বিপদে সকলেই তাহার জন্য অল্লাধিক দুঃখিত হইল—সকলেই দুই একটা প্রবোধবাক্য বলিয়া চলিয়া গেল। কেহ কেহ দুই এক বিন্দু অশ্রুত্যাগও করিল। কিন্তু তাহার এই বিপদে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিতা হইল—আমাদের সুকুমারী। সুকুমারী এই অল্প বয়সেই অনেক যাতনা সহ্য করিয়াছে, অনেক বিপদ্ মস্তক পাতিয়া লইয়াছে, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, বিপদে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়া সহ্য করিয়া অনেকপ্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সুতরাং পরের বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সে অত্যন্ত পটু—পরের দুঃখ, লাঞ্ছনা দেখিলে স্বভাবতঃই তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হয়। মহামায়ার এই উপস্থিত বিপদে, সুকুমারী তাহার পূর্ব্ব-চরিত্র একবারে বিস্মৃত হইল—ননীগোপালকে কোলে লইয়া সে মহামায়ার কাছে বসিয়া প্রবোধবাক্য বলিতে লাগিল। 'দিদি! আর কেঁদ না, বড় দিদি! তোমার চিন্তা কি? আমাদের যেমন ক'রে চলে, তোমারও তেমনি ক'রেই চ'ল্‌বে। তুমি কি আমাদের পর?'

আজ সুকুমারী মনের সাধে ননীগোপালকে কোলে লইল। মহামায়ার তাহাতে আজ দুঃখ বা হিংসা হইল না—বরং সে মনে মনে একটু প্রীতা হইল।

কিন্তু ইহাই সব নহে। মানুষের যখন বৃহস্পতি সহায় থাকেন, তখন সে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়, প্রত্যেক কার্য্যেই সুফল প্রসব হয়, নানারূপ অসম্ভাবিত সুখসম্পদে সময় কাটিতে থাকে। ফল কথা, তখন কোনরূপ ক্লেশ, লাঞ্ছনা বা বিপদ্ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু যখন সেই সুসময়টুকু চলিয়া যায়, রাহুর দশা উপস্থিত হয়, তখন সেই মানুষেরই ভাল কার্য্যে মন্দফল ফলে, নানা-প্রকার বিপদে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরে এবং কোথা হইতে বিপদের উপর বিপদ্ আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। রামকমল, মহামায়ার সেই সুসময়টুকু চলিয়া গিয়াছে—রাহুর দশা উপস্থিত হইয়াছে। রামকমলের প্রতি সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল, আবার দুদিন না যাইতেই আরও এক বৎসর বাড়িয়া গেল। আবার রামকমলের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার ভাই রাইমোহনেরও হাতে হাতকড়ি পড়িল! কিন্তু ইহাও সব নহে। সব দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই একদিন প্রাতঃকালে রাম-কমলের অন্দরবাটীর আঙ্গিনা দারোগা, হেড্‌কনষ্টেবল, পুলিশ ও অন্যান্য লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। রামকমলের জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দগোপাল যে একদিন পাঠশালার ছুটীর পর বাড়ী আসিয়া পাড়ার একটি শিশুর হস্ত হইতে স্বর্ণবলয় চুরি করিয়া, নবলক্ষ্মীর নিকট দিয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাগণের বোধ হয় তাহা স্মরণ আছে। সেই বালকের পিতা সোণার বালা চুরি গিয়াছে বলিয়া পরদিনই থানায় এজেহার দিয়াছিল। পুলিশ অনুসন্ধানে আসিয়া পাঠশালার ও গ্রামের বালক-বালিকাগণের নিকট নন্দগোপালের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইয়াছে। তাহাতে তাহাদের সন্দেহ হয়। সেজন্য, রামকমলের বাটী খানাতল্লাস করিবার জন্য আজ তাহার বাড়ী লালপাগড়ীওয়ালায় পূর্ণ হইয়া গেল। পুলিশের লোকে পরের দুঃখ, সময় অসময় বিবেচনা করে না, সুতরাং মহামায়ার এই বিপদে তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক কর্কশ ব্যবহার ও উগ্রমূর্ত্তি

পরিত্যাগ করিল না। যথারীতি রামকমলের বাটী খানাতল্লাস করিতে লাগিল। ভয়ে নবলক্ষ্মী ও নন্দগোপাল ছাদের উপর যাইয়া পলাইয়া রহিল। মহামায়া এ চুরির সংবাদ অবগত ছিল না। সুতরাং তাহার এই দুঃসময়ে বিনা দোষে তাহাদিগকে এরূপ অপমানিত করিতেছে—মনে করিয়া, সে সুকুমারীর নিকট যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পুলিশ-কর্ম্মচারীরা তাহার ঘরের দ্রব্য-সামগ্রীগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং উহা নানা স্থানে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে লাগিল। মৃণ্ময় হাঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই উগ্ররূপিণী মহামায়া আজ কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সকল অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল হতবুদ্ধির ন্যায় এক স্থানে বসিয়া রহিল। কিন্তু সুকুমারী এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না—তাহার শ্বশুরের পরিবারে চুরির অপবাদ—কালীকান্ত রায়ের বাড়ী খানাতল্লাস, ইহাতে তাহার মর্ম্মে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। সুকুমারী জানিত না যে, অপহৃত স্বর্ণবলয় রামকমলের গৃহেই লুক্কায়িত আছে। তাই সুকুমারী তাহার ভৃত্য ভজহরিকে বলিল, 'দেখ, ঐ বাবুদের বল যে, এ চোরের বাড়ী নয়—এখানে এত অত্যাচার করা তাদের ভাল হ'চ্ছে না?

ভৃত্য ভজহরির কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। সুকুমারী অতি দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আজ আমার শ্বশুর নাই, স্বামী নাই, দীনেশদাদাও এখানে নাই, এ দীন-দুঃখীর কথা বাবুরা গ্রাহ্য ক'র্‌বেন কেন?

কিয়ৎকাল অনুসন্ধানের পর, একটা অর্দ্ধভগ্ন হাঁড়ির মধ্যে চারি পাঁচটি ক্রীড়া-পুত্তলী ও সেই অপহৃত স্বর্ণবলয় দু'গাছি পাওয়া গেল। যাহাদের বলয় চুরি হইয়াছিল, তাহারা বলিল, 'ইহাই আমাদের বলয়। সকলে অবাক্ হইল। মহামায়া নন্দগোপালের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিল, সুতরাং প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে তাহার কালবিলম্ব ঘটিল না।

দারোগা ও কনষ্টেবলগুলি নানারূপ অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিতে লাগিল ; অবশেষে সুকুমারীকে লক্ষ্য করিয়া একটা পুলিশ কর্ম্মচারী বলিল, 'কে, সেই ঠাক্‌রুণ কৈ ? এটা নাকি চোরের বাড়ী নয় ?—চুরিই যাদের ব্যবসা, তাদের আবার অত বড় বড় কথা কেন ?'

সুকুমারী সেই মধুর বাক্যে ম্রিয়মাণা হইল। যাহাদের বাড়ী চুরি হইয়াছিল, তাহারা সুকুমারীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া পুলিশের হস্তে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া বলিল, 'এ চুরি নহে—নন্দগোপাল ছেলেমানুষ, এ তারই কাজ। সে বুঝিতে না পারিয়া এরূপ ক'রেছে। আমরা চুরির দাবি রাখি না—আপনারা দয়া ক'রে গোলমাল মিটিয়ে দিন্।'

গ্রামের সমস্ত লোকেই এইরূপ বলিল। মহামায়ার শত্রুগণও আজ তার বিপদ্ দেখিয়া তাহার পক্ষে দুই একটি কথা বলিল। কিন্তু পুলিশ কাহারও কথা শুনিল না। কৃষ্ণকমল ও নন্দগোপালকে সঙ্গে লইয়া তাহারা থানায় চলিয়া গেল। বাড়ীতে আবার ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ইহার উপর নূতন বিপদ্

গ্রামে একজন এটর্ণী-মোক্তার ছিল। পরদিন সে পরম সুহৃদের ন্যায় আসিয়া বলিল, 'কিছু অর্থ ব্যয় করিলে এখনও অব্যাহতি হ'তে পারে !'

কিন্তু মহামায়ার হস্তে পয়সা নাই। মুক্তকেশীও রিক্তহস্তা। উপায়ান্তর না দেখিয়া, শোকাকুলা মহামায়া পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য মান, মর্য্যাদা, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, পূর্ব্বে সে সুকুমারীর প্রতি কিরূপ জঘন্য ও নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে, তাহা একবার মনে না করিয়া, আজ সুকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কৃপা-ভিক্ষা চাহিল।

মহামায়া অস্থির হইয়া কাঁদিয়া বলিল, 'ছোট-বৌ—আর ব'ল্‌ব কি ?—আজ তুমি দয়া ক'রে উদ্ধার না ক'র্‌লে আমি পুত্রহীন হই।'

এই কথা বলিয়া মহামায়া সত্য-সত্যই সুকুমারীর পদপ্রান্তে মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, 'ছি দিদি! ছিঃ কি ? তুমি কি আমাদের পর ?—তোমার নন্দগোপাল, ননীগোপাল কি আমার নয় ?'

বলিতে বলিতে সুকুমারীও অশ্রুমুখী হইল।

সুকুমারী আর সময় ক্ষেপণ না করিয়া গিরিবালার নিকট হইতে একশত দশ টাকা লইল। গিরিবালা তখনও সুকুমারীর সঙ্গে ছিল। সে একটু বাধা দিয়া বলিল, "একটু সবুর কর, টাকাগুলি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর দিয়ে ফেলো না। আগে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক্।"

স্নেহশীলা সুকুমারীর হৃদয় কৃষ্ণকমল ও নন্দগোপালের জন্য কাঁদিতেছিল। সে গিরিবালার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। এটর্ণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কত টাকা লাগ্‌বে ?'

এটর্ণী উত্তর করিল, 'একশত টাকা হ'লে হ'তে পারে।'

সুকুমারী। কাজ হবে ত ?

এটর্ণী। তা হবে বৈ কি।

সুকুমারী। তবে এই লও—একশত টাকাই দিলাম। যেমন ক'রে পার, বাবুকে আর নন্দগোপালকে এনে দেবে। আরও কিছু টাকা লাগ্‌লে, তাও দিব।

এটর্ণী-মোক্তার চলিয়া গেল। মহামায়া ও মুক্তকেশী একটু আশ্বস্ত হইল। কৃষ্ণকমল নির্দ্দোষ, রামকমলের সহিত পৃথগন্ন, তাহার গৃহে মাল পাওয়া যায় নাই, সুতরাং দারোগা নিজেই তাহাকে ছাড়িয়া দিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় এটর্ণী-মোক্তার থানায় গিয়া দারোগা বাবুর হস্তে পাঁচটি টাকা দিল। দারোগা বাবু কৃষ্ণকমলকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু

নন্দগোপালকে ছাড়িল না। মেজ-কাকাকে সঙ্গে দেখিয়া এতক্ষণ নন্দ-গোপালের একটু সাহস ছিল। কৃষ্ণকমল চলিয়া গেলে, সেই অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকের মধ্যে একাকী পড়িয়া নন্দগোপাল ভীষণ কান্না জুড়িয়া দিল।

যথাসময়ে এই চুরির মোকদ্দমার বিচার হইল। নন্দগোপাল ভদ্র-লোকের সন্তান, এই কিশোর বয়সে চুরি করিতে শিখিয়াছে দেখিয়া বিচারক দুঃখিত হইলেন এবং যথারীতি প্রমাণ গ্রহণ করিয়া হতভাগা নন্দগোপালকে পাঁচ বৎসর চরিত্র-সংশোধক কারাগারে থাকিতে আদেশ করিলেন। নন্দগোপাল আলিপুর চরিত্র-সংশোধক কারাগারে প্রেরিত হইল। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া জাহাজ ও রেলপথে আলিপুরে গিয়া পৌঁছিল। মহামায়া ও সুকুমারীর বক্ষে শেল বিদ্ধ হইল।

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

উপর্য্যুপরি বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়ায় মহামায়ার হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল। সুখশান্তি তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিল। প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার শিক্ষাও আরম্ভ হইল। পাপ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয়, পরের সর্ব্বনাশ করিতে গেলে যে ভগবান্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন—এক কথায় মস্তকের উপর যে সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বনিয়ন্তা, অনন্তশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ রাজদণ্ড ধারণ করিয়া পৃথিবী শাসন করিতেছেন, মহামায়ার এত দিন সে কথা একটিবারও মনে হয় নাই,—এজন্য স্বামীর ন্যায় পরের সর্ব্বনাশসাধন করিতে সে কখনও দ্বিধা বোধ করে নাই। বিপদে পড়িয়া এখন তাহার নানা কথা মনে হইতে লাগিল। নিদ্রা তাহার চক্ষু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, শোকাশ্রু সে স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

মহামায়া দিনান্তে এক মুষ্টি আহার করে, আর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদে আর কি চিন্তা করে। পরম পূজনীয়, স্নেহশীল, পিতৃতুল্য শ্বশুরের প্রতি সে যে কত অশিষ্ট ও জঘন্য ব্যবহার করিয়াছে, বৃদ্ধা শ্বশ্রূর প্রতি কত সময় কত দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, মিথ্যাকথা বলিয়া স্বামীকে উত্তেজিত করিয়া তাহার দ্বারা কত সময় বিনা প্রয়োজনে শ্বশুর-শাশুড়ীর হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়াছে, কত সময় স্থির-প্রকৃতি বালিকা সুকুমারীকে অনর্থক যাতনা প্রদান করিয়াছে, অবশেষে স্বামী দ্বারা সুকুমারীর গৃহে অগ্নি প্রদান করাইয়া কিরূপে শাশুড়ীকে ও মাখনলালকে পোড়াইয়া মারিয়াছে, একে একে এ সকল কথাই তাহার মনে উপস্থিত হইতে লাগিল। অনেক দুশ্চিন্তার পর, মহামায়া চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে অস্ফুট-স্বরে আপনা আপনি বলিল, 'আমার এ দশা হইবে বৈ কি।—আমি পরের সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমার সর্ব্বনাশ না হবে কেন? আমি পরকে স্বামিসুখে বঞ্চিত ক'রেছি, একজনের বুকের ছেলে আগুনে পুড়িয়েছি, আমার এমন দশা না হবে কেন? তাই বিনা আগুনেও আমার ঘর পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল, তাই পতিপুত্র কারাগারে গেল, একমাত্র ভাইও তাদের সঙ্গের সঙ্গী হ'ল। শ্বশুর, শাশুড়ী ও সুকুমারীর অভিসম্পাতে আজ আমার এই দশা—আজ আমি অনাথিনী, পর-প্রত্যাশিনী, অন্নের কাঙ্গালিনী, আর বাছা নন্দগোপালও আজ আমার দোষেই কারাগারে কষ্ট পেয়ে ম'র্‌ছে। আমি যদি তাকে শিশুকালে ছোট-বৌর শশা. বেগুন চুরি ক'র্‌তে না শিখাতাম, তবে ত বাছার আমার এ অভ্যাস হ'তে পার্‌ত না, তবে ত বাছা আমার কাছেই থাক্‌ত। আমি যেমন কর্ম্ম ক'রেছি, তেমনই তার ফল পাচ্ছি।'

এইরূপ মনকষ্টে তাহার দিন যাইতে লাগিল। রামকমল জেলে যাইবার সময় যে চাউল ডাউল ক্রয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে দুই মাস চলিল। ইহার পর মহামায়াকে উদরান্নের জন্যও

পুত্রপ্রত্যাশিনী হইতে হইল। রামকমল যাহাদের নিকট টাকা পাইত, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া দেনা অস্বীকার করিতে লাগিল। মহামায়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মহামায়ার উপর আর এক বিপদ্ চাপিল। তুফানী মোল্লার পুত্র মামুদমোল্লা একদিন আসিয়া মহামায়াকে বলিল, 'আমার বাপ আপনাদের পক্ষে সাক্ষী দিতে গিয়ে আর বাড়ী ফিরে নাই, আমাদের ঘরে এক মুঠা চাউল নাই। আমরা কি না খেয়ে মরব? বাবা না আসা পর্য্যন্ত আমাদের খরচ আপনাকে চালাতে হবে।'

মামুদের কথামত সাহায্য প্রদান না করিলে যে, তাহারা পেটের দায়ে মহামায়ার প্রতি অত্যাচার করিতেও বাধ্য হইবে, ইঙ্গিতে সে কথা বলিতে ছাড়িল না। মহামায়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

গৃহের সঞ্চিত চাউল নিঃশেষিত হইল, হাতে যে কয়টি পয়সা ছিল, তাহাও গেল, তার পর ধার আরম্ভ হইল। সুকুমারী তাহার মহাজন হইল। কোন দিন একসের চাউল, কোন দিন দু-গণ্ডা পয়সা, কোন দিন একটু লবণ, কোন দিন একটু তৈল—এইরূপ কয়েকদিন চলিল। তার পর গৃহস্থিত তৈজসাদি বিক্রয় আরম্ভ হইল। তাহাতে কিছুকাল চলিল। এইরূপে কোন দিন একাহার, কোন দিন অনাহার, কদাচিৎ পূর্ণাহারে সময় কাটিতে লাগিল। তৈজসপত্র ফুরাইল, ধার বন্ধ হইল। সুকুমারী সর্ব্বদাই প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিত এবং অনেক সময় মহামায়ার প্রয়োজন বুঝিয়া অযাচিত হইয়াও নবলক্ষ্মীর নিকট দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিত। কিন্তু মহামায়ার বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে এ পর্য্যন্ত সুকুমারীর নিকট হইতে যত ধার নিয়াছে, তাহার একটিও শোধ করিতে পারে নাই। সুতরাং আর হাত পাতিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। এমন সময় মহামায়ার বৃদ্ধা জননী মহামায়া প্রভৃতিকে নিজবাটীতে লইয়া যাইবার জন্য একখানি ডিঙ্গী নৌকা পাঠাইয়া দিল। মহামায়া সন্তানগণকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু এবার মহামায়াকে

নিরালঙ্কারা হইয়া, মাত্র দু'গাছি শাঁখার বালা পরিয়া পিতৃগৃহে যাইতে হইল। মহামায়ার জননী তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। মহামায়ার পিত্রালয়ের অবস্থা বড় সচ্ছল ছিল না; তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহকুমায় মোক্তারী করিয়া পঁচিশ-ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিত, তদ্দারা কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত মাত্র। এখন সে উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ থাকায়, রাইমোহনের স্ত্রী পুত্র জননীর উদরান্নেরও উপায় রহিল না, এমন অবস্থায় মহামায়া তাহার পুত্র-কন্যা লইয়া পিতৃগৃহে যাওয়ায়, তাহাদের সকলেরই কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল—এমন কি, সকল দিন সকলের দু-মুঠা অন্ন জুটিত না; তদুপরি প্রায় প্রতিদিনই ভ্রাতৃবধূর সহিত মহামায়ার কলহ হইতে লাগিল, অতি কষ্টে মহামায়ার দিনযাপন হইতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণ

পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, যথাসময়ে সুকুমারীর দ্বিতীয় পুত্র জন্মিয়াছে। পুত্রটির বয়স এখন কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর হইয়াছে। দীনেশবাবু বালকের নাম রাখিয়াছেন, 'সুধীরচন্দ্র'। এই সুধীর নামেই সকলে তাহাকে ডাকিত। গিরিবালা নাম রাখিলেন, 'সুবোধচন্দ্র'। দীনেশবাবু আদর করিয়া কখন ইহাকে 'সুধীরবাবু' কখন বা 'সুবোধবাবু' বলিয়া ডাকিতেন। সুকুমারী নাম রাখিল, 'দুঃখীরাম'। কিন্তু এই নামে কেহই ডাকিত না। মধ্যে মধ্যে সুকুমারী 'দুঃখ-বাবু' বলিয়া ডাকিত মাত্র। আমরা ইহাকে সুধীর-চন্দ্র বলিয়াই উল্লেখ করিব। সুধীরচন্দ্র অতি সুন্দর, সুলক্ষণাক্রান্ত এবং বয়সের তুলনায় বেশ সুবুদ্ধিসম্পন্ন। সুধীরের জন্ম হইলে, সুকু-মারী অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে স্বামীর 'শেষ-চিহ্ন' অবলোকন করিল,

আর মনে মনে ভাবিল, 'আজ যদি তিনি থাকিতেন!' সুধীরকে দেখিয়া সুকুমারী স্বামিশোক একটু ভুলিতে পারিল—সেই দিন হইতে তাহার সংসারে একটা নূতন আসক্তি হইল। সুকুমারী মৃত্যুকামনা পরিত্যাগ করিল; কিন্তু তাহার অশ্রুজল শুষ্ক হইল না। সুধীর মায়ের মুখপানে চাহিয়া চাঁদমুখে মধুর হাসি হাসিত—অমনি সুকুমারীর নয়নকোণে অশ্রু দেখা যাইত। সুধীর মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে হামাগুড়ি দিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত, আবার ফিরিয়া আসিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিত, তখনই সুকুমারী বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া পুত্রকে কোলে লইত। সুধীর একটু একটু কথা বলিতে শিখিল—অস্ফুটস্বরে বলিত 'মা', সুকুমারী পুত্রের মুখপানে চাহিত। অবোধ শিশু বলিত 'বাবা', সুকুমারী সেই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। সুধীর অন্য বালকের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী বা বাঁশী দেখিলে, মায়ের নিকট তাহা চাহিত—সুকুমারী তাহাতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না। সুধীর কাহারও পরিধানে লালবস্ত্র দেখিলে দৌড়িয়া মায়ের কাছে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত, 'মা! আমার আঙ্গা কাপল।' সুকুমারী তাহাকে কোলে লইয়া, তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, মুখচুম্বন করিত এবং নিজের চক্ষু মুছিত। এইরূপে সুধীরচন্দ্র বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সুকুমারীর অশ্রুজল শুকাইল না।

সুধীরচন্দ্রের জন্মগ্রহণের কয়েক মাস পরে দীনেশবাবুর একটি পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল ইন্দুভূষণ। দীনেশবাবু ও গিরিবালা পুত্রমুখ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। দীনেশবাবু ইতিমধ্যে তাঁহার জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখন স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়া কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবেন, মনস্থ করিলেন। গিরিবালা সে প্রস্তাবে আহ্লাদ-সহকারে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কলিকাতার মোক্তারের নিকট বাসা-ভাড়া করিবার জন্য হুকুমচিঠি গেল। বহুবাজারে, পঞ্চাশ টাকা

ভাড়ায় একটি নাতিক্ষুদ্র বায়ুপূর্ণ দ্বিতল বাটী স্থির হইল। কলিকাতা রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দীনেশবাবু সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে আসিলেন, তথায় চারি দিন অবস্থিতি করিলেন। তখন নন্দগোপাল ও রামকমল কারাবাসে। স্বর্ণকমলের পৈতৃক সম্পত্তির খাজনাদি তহশীল জন্য একজন সচ্চরিত্র লোক নিযুক্ত করিলেন। তার পর সুকুমারীকে তাঁহার সহিত কিছুকাল কলিকাতা যাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সুকুমারী স্বীকৃত হইল না। দীনেশবাবু ও গিরিবালা অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, সুকুমারী বলিল, 'দাদা! তুমি ত জান যে, শ্বশুর মহাশয় মরবার সময় আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে গেছেন যে, সুখে হ'ক, দুঃখে হ'ক আমি এ বাড়ীতেই থাক্‌ব। এই জন্য, আমি তাঁর মৃত্যুর পর একদিনও পিত্রালয় যাই নাই। তুমি কি আমায় সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌তে বল? তুমি আমার জন্য যা ক'রেছ, মায়ের পেটের ভাইও তেমন করে না। আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, নইলে কি তোমার কথায় আপত্তি করি?'

সে কথার প্রত্যুত্তরে দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'তোমাকে জনমের মত এ বাড়ী ত্যাগ ক'রে যেতে ব'ল্‌ছি না। কিছুকালের জন্য যাবে, আবার সময় সময় আস্‌বে। বিশেষ কলিকাতা তীর্থস্থান—কালী-গঙ্গার স্থান—সেখানে থাক্‌তে তোমার নিষেধ নাই। আর তোমার শ্বশুরের ভিটায় যাতে রোজ প্রদীপ জ্বলে, আমি তার যোগাড় ক'রে যাচ্ছি, সে জন্য তোমার চিন্তা নাই।'

সুকুমারী: তবে কি যেতেই বল?

দীনেশ। হাঁ, কিছু কালের জন্য। তুমি যাবে ব'লে আমরা কলিকাতায় একটা বড় বাসা ভাড়া ক'রে রেখেছি।

গিরিবালা আনন্দিতা হইয়া বলিল, 'যদি তুমি একান্তই না যাবে, তবে আমরা সুবোধকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। এ বাড়ীতে এ শিশুকে কখনই রাখা হবে না—এ আমরা স্থির ক'রে এসেছি—তা বুঝে যা হয় কর।'

সুকুমারী বাষ্পপূর্ণলোচনে, গদ্গদকণ্ঠে গিরিবালার কাণে কাণে বলিল, 'এখন আর আমার কেউ শত্রু নাই।'

গিরি। তা ভেবে নিশ্চিন্ত থেকো না—চল তুমি আমাদের সঙ্গে—আপত্তি ক'রো না—এই আমার অনুরোধ।

গিরিবালা সুকুমারীর হস্ত ধরিল, সুকুমারী স্বীকৃতা হইল। গিরিবালা পিত্রালয়ে যাইয়া পিতা-মাতার চরণধূলি লইয়া আসিল।

সুকুমারী কলিকাতা যাইতেছে শুনিয়া মুক্তকেশী, সুশীলা, সরলা ও কৃষ্ণকমল অত্যন্ত দুঃখিত হইল। এ পর্য্যন্ত সুকুমারী দ্বারা মুক্তকেশীর বিশেষ সাহায্য হইতেছিল, সে সাহায্য বন্ধ হইলে মুক্তকেশীর সংসার চলা দায় হইবে। তাই মুক্তকেশী কাঁদিয়া বলিল, 'ছোট-বৌ! তুমি গেলে আমাদের দশা কি হবে, ভগবান্ ব'ল্‌তে পারেন।'

সুকুমারী তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, 'কোন চিন্তা ক'রো না, মেজ-দিদি! দীনেশদাদা আর গিরিবালা আমার যে উপকার ক'রেছে, তা ত চক্ষের উপর দেখ্‌ছ—বাপ-মায় এত করে না! এখন তাদের অনুরোধ রক্ষা না ক'র্‌লে অন্যায় হয়। আমি কলিকাতা গিয়েই তোমায় পত্র লিখ্‌ব। যখন যা হয়, আমাকে লিখে জানিও, তবেই সব হবে। তোমার সুশীলা, সরলা কি আমার নয়?—তাদের জন্য কি আমার চিন্তা থাক্‌বে না? তুমি ব্যস্ত হয়ো না, দিদি।'

মুক্তকেশী এ কথায় একটু স্থির হইল। সে জানিত, সুকুমারী কথা অপেক্ষা কার্য্য অধিক ভালবাসে। ভৃত্য ভজহরি বাড়ীতে প্রহরিস্বরূপ রহিল। মঙ্গলা সুধীরচন্দ্রের শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে চলিল। গিরিবালা, সুকুমারী, ইন্দুভূষণ ও সুধীরচন্দ্র, মঙ্গলা ও অন্যান্য দাস-দাসী সমভিব্যাহারে দীনেশচন্দ্র কলিকাতা গেলেন। কালীকান্ত রায়ের ত্যক্ত সম্পত্তির তহশীলদারী কার্য্যে যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, দীনেশবাবু তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, রীতিমত তহশীল ক'র্‌বে—মহালে যেন টাকা বাকী

পড়্‌তে না পারে। আয়ের এক-তৃতীয়াংশ কৃষ্ণকমল বাবুর হস্তে দিবে, এক-তৃতীয়াংশ রামকমল বাবুর স্ত্রীর নিকট তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিবে, আর এক-তৃতীয়াংশ হ'তে ভৃত্য ভজহরির বেতন তিন টাকা ও খোরাকী বাবদে চারি টাকা, মোট সাত টাকা দিয়া যা থাক্‌বে, তা নিয়মিতরূপে সুকুমারীর নামে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিবে। ইহাতে যেন অন্যথা না হয়।'

তহশীলদার স্বীকৃত হইয়া গেল। অর্থের অসচ্ছলতা কাহাকে কহে, সুকুমারী তাহা জানিতে পারিল না। সুকুমারী দুঃখে অধীরা হইয়া সেই পাঁচ হাজার টাকা জীবনবীমার রসিদখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। দীনেশ বাবু কলিকাতায় যাইয়া নিজে বিশেষ চেষ্টা করিয়া, বীমা-কার্য্যালয় হইতে সুকুমারীর ন্যায্য প্রাপ্য ঐ পাঁচ হাজার টাকা আনিয়া সুকুমারীর নিকট দিলেন। সুকুমারী সেই টাকাগুলি দীনেশবাবুর দ্বারা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিল। দীনেশবাবুর সুবন্দোবস্তে সুকুমারীর নিকট প্রতি কিস্তিতে তাহার অংশে অন্ততঃ এক শত টাকা আসিতে লাগিল। সুকুমারী আবশ্যকমত নিজ খরচের জন্য সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখিয়া বক্রী টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করিল। মুক্তকেশীর অবস্থা বড় সচ্ছল নহে, পৈতৃক সম্পত্তির আয় দ্বারা তাহার যে খরচ সঙ্কুলন হইবে না, ইহা সুকুমারী জানিত। সুতরাং তাহাদের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, এ জন্য সুকুমারী প্রতি মাসে সরলার নামে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিত। পূজা নিকটবর্ত্তী হইল, সুকুমারী এবার বাড়ী যাইতে পারিল না। পূজা-খরচ নির্ব্বাহের জন্য কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। কিন্তু কৃষ্ণকমল সে টাকা দ্বারা নিজ দেনা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইল—সুতরাং এবার হইতে পূজা বন্ধ হইল। সুকুমারী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যতদিন না ভালরূপ পূজা ক'র্‌তে পারি, ততদিন আর গঙ্গাতীরে যাব না।'

ইহার পর সুকুমারী দীনেশবাবুর সঙ্গে দুই একবার পিত্রালয়ে গিয়া কয়েক দিন কাটাইয়া আসিয়াছে।

দীনেশবাবু সুধীরচন্দ্রকে অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং ইন্দুভূষণ ও সুধীরচন্দ্রের জন্য একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উভয়ের খাওয়া-দাওয়া বসন-ভূষণে কোনরূপ পার্থক্য রহিল না। বাহিরের লোকে সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণকে দেখিয়া প্রথমতঃ উভয় বালককে দীনেশ-বাবুর পুত্র বলিয়াই স্থির করিত। বালকদ্বয় বাল্যকাল হইতে একত্র বাসহেতু, পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ও স্নেহশীল হইয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতা আসিয়াই দীনেশবাবু বালকদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দীনেশবাবুর সতত চেষ্টা ও গৃহশিক্ষকের সাহায্যক্রমে সুধীর ও ইন্দু বেশ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে, উভয় বালককে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল স্বাভাবিক সুবুদ্ধিবলে, বালকদ্বয় বিদ্যানুশীলনে কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। সুধীর স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ বালক, মায়ের মলিন মুখ দেখিয়া পারিবারিক প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। ইন্দুভূষণ, তাহার অবস্থায় যে অনেক পার্থক্য, তাহা বুঝিয়া বালক ও তদনুসারেই চলিতে আরম্ভ করিল। মায়ের কষ্ট দূর করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগসহকারে সে লেখাপড়া করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

গৃহ-বহিষ্কৃতা

রাইমোহন বৎসরান্তে মুক্তিলাভ করিয়া গৃহে ফিরিল। মহামায়া তখন পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছিল। অর্থের অভাবে রাইমোহনের বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। রাইমোহন দেখিল, তাহার স্ত্রীপুত্রের অতি হীনাবস্থা হইয়াছে—তাহাদের পরিধানে বস্ত্র নাই, গৃহের চালে খড় নাই, জালায় তণ্ডুল নাই। স্ত্রী, পুত্র, জননীর মুখঃ শুষ্ক ও কেশ রুক্ষ। সে বুঝিতে

পারিল, গত ছয় মাসের মধ্যে তাহাদের মস্তকে এক বিন্দু তৈলও পড়ে নাই। এমত অবস্থায় আবার সসন্তানা ভগিনীকে দেখিয়া রাইমোহনের চক্ষু টাটাইতে লাগিল। তদুপরি স্ত্রীর নিকট শুনিল, গত রজনীতে তাহাদের পেটে অন্ন পড়ে নাই। উপসংহারে রাইমোহনের স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল, 'ভগবান্ অদৃষ্টে যা লিখেছেন, তা সহ্য ক'রেছি, তাতে তত দুঃখ হয় নাই, কিন্তু তোমার গুণের ভগিনীর ব্যবহারে বড় জ্বালাতন হ'চ্ছি। প্রতিদিন হাড় পুড়িয়ে মেরেছে। অনেক দেখেছি, এমনটি দেখি নাই। ঘরে যা কিছু দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তা ত বেচে কিনে খেয়েছে, অবশেষে আমার যে দুই একখানা গহনা ছিল, তাও খেয়েছে। তার পর, ধারকর্জ্জে সংসার ডুবিয়েছে। পাঁচ বৎসরেও যে এই দেনা শোধ ক'রে আগেকার মত হ'তে পারবে, বোধ হয় না। এর উপর আবার রোজ গালাগালি, রোজ ঝগড়া-বিবাদ। কি আর ব'লব, তোমার বোনের গোষ্ঠী এসে ধনে প্রাণে সর্ব্বপ্রকারে মেরেছে। ওরা যদি এমন ক'রে ব'সে ব'সে না খেত, এমন ক'রে সর্ব্বনাশ না ক'ত, তবে আজ বাড়ীর এমন দশা দেখ্‌তে না।'

রাইমোহন সেদিন কোন কথা বলিল না। ধার করিয়া কিছু অর্থ-সংগ্রহ করিয়া গৃহের বন্দোবস্ত করিল। পরদিন প্রাতঃকালে, কোন সূত্রে মহামায়ার সহিত কলহ উৎপাদন করিয়া সে ভগিনীকে পুত্রকন্যাগণ সহ অবিলম্বে তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিল। মহামায়া দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে তাহার বৃদ্ধা জননীও অশ্রুত্যাগ করিল। রাইমোহন জননীকে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে হুকুম করিল। অনন্যগতি হইয়া মহামায়া পুনরায় অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গাতীরে স্বামিগৃহে গেল। সুকুমারী কলিকাতায় রহিয়াছে শুনিয়া মহামায়ার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং কিরূপে উদরান্নের সংস্থান হইবে, ভাবিতে ভাবিতে মহামায়া ব্যাকুল হইল; এদিকে নবলক্ষ্মী বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে—তাহার বিবাহেরই বা কি উপায় হইবে? কয়েক দিন ধারে চলিল। মুদী

তৈল, লবণ, চাউল, দাইলের মূল্যের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল— দুর্ব্বাক্য বলিতেও ছাড়িল না। অনন্যোপায় হইয়া মহামায়া সুকুমারীর নিকট পত্র লিখিল। সুকুমারী দশটি টাকা পাঠাইয়া দিল। এইরূপ কায়ক্লেশে কোনরূপে দিনপাত হইতে লাগিল।

মুক্তকেশীর সঙ্গেও এখন আর মহামায়ার সদ্ভাব রহিল না। মহামায়ার দৃঢ় ধারণা যে, কৃষ্ণকমলের দোষেই তাহাদের এইরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; কৃষ্ণকমল যদি জেলায় যাইয়া তাহার স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিত, তাহা হইলে তাহার স্বামীর এমন দশা ঘটিত না। তাহাদেরও এরূপ দুরবস্থা হইত না। মহামায়া প্রকাশ্যরূপে এ সব কথা বলিতে লাগিল। সুতরাং মুক্তকেশীর সঙ্গে প্রতিদিনই বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে লাগিল। মুক্তকেশী কুশিক্ষাপ্রাপ্ত স্বামীর হস্তে পড়িয়া বিকৃতবুদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ একেবারে অপ্রশস্ত ছিল না। ঝগড়া করিতে সে মহামায়ার ন্যায় সুপটু নহে, এজন্য তাহাকেই প্রায় হটিতে হইত। কৃষ্ণকমল এই কলহ-ব্যাপারে মধ্যে মধ্যে যোগ দিতে বাধ্য হইত। যে দিন দেখিত, মহামায়া তাহার প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করিতেছে, সে দিন সে মহামায়াকে মর্ম্মপীড়াদায়ক বাক্য শুনাইয়া দিত, মহামায়া পাড়ার লোক একত্র করিত, কিন্তু তথাপি স্বভাব-দোষ ছাড়িতে পারিত না—আবার পরদিনই ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইত। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু মহামায়ার আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না—আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল। সুকুমারীর সাহায্য ব্যতীত আয়ের আর কোনরূপ পথ রহিল না।

রামকমল মোকর্দ্দমা-খরচ চালাইবার জন্য হরিদাস বণিক্য নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে বাড়ী-ঘর আবদ্ধ রাখিয়া তিন হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। হরিদাস চার পাঁচ দিন মহামায়ার নিকট সুদের টাকা চাহিল। মহামায়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের অবস্থা জানাইল, কিন্তু তাহার

কাতরোক্তিতে সুদখোর মহাজনের মন আর্দ্র হইল না। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সে প্রাপ্য টাকার জন্ত আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল। মোকর্দ্দমা মায় খরচ ডিক্রী হইল। সে রামকমলের ইষ্টকালয়, বাড়ী এবং পৈতৃক সম্পত্তির তাহার এক-তৃতীয়াংশ ক্রোক করিয়া, প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করাইয়া, নিজে তাহা ক্রয় করিয়া লইল। হরিদাস নিজে তৎসমস্ত দখল করিল। রামকমলের বাড়ী গেল, ঘর গেল, ইষ্টকালয় গেল, যথাসর্ব্বস্ব গেল। মহামায়াকে হরিদাসের লোক আসিয়া ইষ্টকালয় হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। মহামায়া পিতৃগৃহ হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীগৃহে আসিয়াছিল, আজ আবার অনন্যোপায় হইয়া স্বামীগৃহ হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃগৃহে চলিল। আজ মহামায়ার বড় মর্ম্মান্তিক যাতনা বোধ হইতে লাগিল। আজ তাহার অনেক কথা মনে পড়িতে লাগিল—সুকুমারীর কথা, মুক্তকেশীর কথা, শাশুড়ীর কথা, স্বর্ণকমলের কথা, মাখনলালের কথা, জুয়াচুরি-প্রতারণা-প্রবঞ্চনার কথা, দ্বেষহিংসার কথা, গৃহে অগ্নিপ্রদানের কথা। এক একটি কথা মনে পড়িয়া তাহার যাতনা তিনগুণ বৃদ্ধি হইল। মহামায়া অতি দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিল, 'এ সব কি তারই ফল? হা পরমেশ্বর! আমার কি উপায় হবে?' সর্ব্বশেষে মহামায়া ভাবিল, 'আমি কোথায়, কার কাছে যাই? ভাই ও তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন উপায়?' মহামায়া উপায় খুঁজিয়া পাইল না—পথহারা শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

অনুতপ্ত রামকমল

নন্দগোপাল পাঁচ বৎসরের পর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শুনিতে পাইল, তাহাদের বাড়ীঘর নীলাম হইয়া গিয়াছে; তাহার পিতা এখনও

কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহার মাতা কোথায়, কি অবস্থায় আছে, তাহার নিশ্চয় নাই। সে আর গৃহে গেল না—ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রামকমল কলিকাতার জেলখানায় প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে সে কয়েদীগণের সর্দ্দার হইল। দীনেশবাবুর সঙ্গে জেলরক্ষকের সৌহৃদ্য ছিল। একদিন অপরাহ্নে দীনেশবাবু সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা গড়ের মাঠে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় জেলরক্ষকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। জেলরক্ষক তাঁহাকে জেলখানা দেখিতে অনুরোধ করিলেন। দীনেশবাবু আহ্লাদসহকারে জেলখানা দেখিতে গেলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রামকমল যেখানে কাজ করিতেছিল, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকমল দীনেশবাবুকে চিনিতে পারিয়া মুখ ফিরাইল, কিন্তু রামকমলের চেহারা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার তনবেশে দীনেশবাবু তাহাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই। এ জন্য তিনি রামকমলকে চিনিতে পারিলেন না। রামকমলের মলিন মুখ দেখিয়া দীনেশবাবুর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রামকমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি?'

রামকমলের চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল—মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না। কিন্তু দীনেশবাবুর কথার উত্তর না দেওয়ায় জেলরক্ষক 'সপাং' করিয়া তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়া বলিলেন, 'নাম বলিস্ না কেন রে?'

রামকমল বামহস্ত দ্বারা চক্ষু মুছিয়া মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আমার নাম রামকমল রায়।'

দীনেশবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। আর তিলার্দ্ধ তথায় বিলম্ব না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়া

রুমাল দ্বারা চক্ষু মুছিলেন। জেলরক্ষকের কাণে ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া, ইন্দুভূষণ ও সুধীরকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সেই দিন হইতে রামকমলের শারীরিক ক্লেশ কমিয়া গেল। দীনেশবাবু বাসায় আসিয়া গিরিবালা ও সুকুমারীকে সকল কথা বলিলেন। সুকুমারী রামকমলের অবস্থা, বিশেষতঃ বেত্রাঘাতের কথা শুনিয়া, অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। ইহার দুই তিন দিন পরে, দীনেশবাবু কতকগুলি সুখাদ্য দ্রব্য লইয়া পুনরায় বালকদ্বয় সমভিব্যাহারে জেলখানায় গেলেন, জেলরক্ষকের সাহায্যে রামকমলকে একটি শূন্য প্রকোষ্ঠে আনাইলেন এবং তাহার সম্মুখে খাদ্যদ্রব্যগুলি রাখিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সত্ত্বেও, রামকমল তাহা মুখে না দিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে রামকমলের সাহস হইল না—হতভাগা আকুল-প্রাণে কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বালক দুটি কে ?'

দীনেশবাবু উহাদের পরিচয় প্রদান করিলে, রামকমল সুধীরচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং সুধীরকে কোলে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। কিন্তু সাত বৎসরের বালক সুধীর কয়েদীর কোলে যাইতে ভয় পাইয়া একটু সরিয়া দাড়াইল। দীনেশবাবু সুধীরকে অভয় দিয়া বলিলেন, 'ভয় কি সুধীর ! যাও ওঁর কাছে।'

সুধীরচন্দ্র রামকমলের নিকট গেল। রামকমল তাহাকে আপনার কোলে বসাইল এবং বালকের মুখপানে নির্ণিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিল। স্বর্ণকমলের সহিত সুধীরচন্দ্রের মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া রামকমল উচ্চৈঃস্বরে 'ভাই স্বর্ণকমল রে!' বলিয়া পাগলের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল, জেলরক্ষকবাবু তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া দূর করিয়া দিলেন। দীনেশবাবু ও জেল-রক্ষকবাবু চক্ষু মুছিলেন। বালক ইন্দু ও সুধীর অবাক্ হইয়া একবার দীনেশবাবুর প্রতি এবং একবার রামকমলের প্রতি তাকাইতে লাগিল।

ক্রমে রামকমল একটু স্থির হইল এবং খাদ্য-সামগ্রীগুলি সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণকে খাওয়াইতে লাগিল। ইহাতে আজ তাহার যত সুখ হইল, এ জীবনে সে কখনও আর তত সুখ ভোগ করে নাই। দীনেশবাবু ও জেলরক্ষক অনেক পীড়াপীড়ি করাতে রামকমলও দুই একটি সন্দেশ উদরস্থ করিল।

আট বৎসরের যাতনায় রামকমলের অনেক শিক্ষা হইয়াছে। আট বৎসর অবিশ্রান্ত স্বীয় জঘন্যতার ফলভোগ করিতে করিতে রামকমলের পাপ অনেক ক্ষয় হইয়াছে, হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হইয়াছে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। আজ সে স্বর্ণকমলের জন্য কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল, মাখনলাল ও বৃদ্ধা জননীর মৃত্যু স্মরণ করিয়া সে দেওয়ালের গায়ে মস্তকাঘাত করিয়া উন্মাদের ন্যায় শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। আজ সুধীরচন্দ্রকে তাহার কোল হইতে ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না—ঘন ঘন তাহার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিল। রামকমল অতিশয় আগ্রহের সহিত সুকুমারীর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, গিরিবালার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, কৃষ্ণকমল, মুক্তকেশী, ভৃত্য ভজহরি, পরিচারিকা মঙ্গলা ও গ্রামের সকলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু মহামায়া, নবলক্ষ্মী বা নন্দগোপালের সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। দীনেশবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিবার সময় বলিয়া আসিলেন, 'সকলে শারীরিক ভাল আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

রামকমল মুখ বিকৃত করিল। ফলতঃ নিজ পরিজনবর্গের প্রতি তাহার কেমন একরূপ বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া গেল—তাহাদের মুখ দর্শন করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া দীনেশবাবু বালকদ্বয়কে লইয়া এইরূপ মধ্যে মধ্যে জেলখানায় যাইয়া রামকমলের সহিত দেখা করিয়া আসিতেন। ক্রমে ক্রমে রামকমল স্বীয় পরিবারের অবস্থা কিছু কিছু অবগত হইল।

কিন্তু সেই জেলরক্ষকবাবু হঠাৎ স্থানান্তরে বদলী হইয়া যাওয়ায় দীনেশবাবুর সহিত রামকমলের দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

মহামায়া, নবলক্ষ্মী ও ননীগোপাল

মহামায়া, ননীগোপাল ও নবলক্ষ্মীকে লইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে পিতৃগৃহে গেল। কিন্তু রাইমোহন তাহাদিগকে তীব্র গালাগালি দিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল। আহার করিতেও বলিল না। ননীগোপাল ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিল—মহামায়া সংসার শূন্য দেখিতে লাগিল। বুদ্ধিহারা মহামায়া তাহাকে আহারের পরিবর্ত্তে মনোদুঃখে প্রচুর প্রহার প্রদান করিল। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। পেটের জ্বালায় ও মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া মহামায়া, তাহার জননী, ননীগোপাল ও নবলক্ষ্মী একত্র হইয়া বহির্ব্বাটীতে বসিয়া 'বাবা গো' 'মা গো' 'কোথা যাব রে', 'কি হবে রে' ইত্যাদি বলিয়া ভীষণ কান্না জুড়িয়া দিল। পাড়ার বালিকা বৃদ্ধা ও যুবতীর দল, রামকমলের কোন অমঙ্গল সংবাদ আসিয়াছে মনে করিয়া, বেশ ঔৎসুক্যের সহিত দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহারা অবগত হইল যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ আসে নাই, তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিল। কিন্তু কেহই মহামায়ার ও তাহার ক্ষুধার্ত্ত পুত্র-কন্যার আহারের কোনরূপ যোগাড় করিল না। পাড়ার একটি চিরকুমারী কুলীন-কন্যার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তাঁহার নাম উত্তমা সুন্দরী, বয়স ত্রিশ বৎসর, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। উত্তমা সুন্দরী সময়ে সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু কুলের ঘরে বর জুটিল না বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিবাহ দেন নাই। উত্তমা মাতৃ-হীনা, কিন্তু তাঁহার আটজন বিমাতা

আছে। তাহাদের মধ্যে ছয়জন বয়সে উত্তমার ছোট। উত্তমা শুধু সুন্দরী নহেন ; সচ্চরিত্রা, গুণবতী, সহৃদয়াও বটেন। নিজে চিরদুঃখিনী বলিয়া, তিনি পরের দুঃখ বুঝিতে পারেন। এই দিবা তৃতীয় প্রহরেও ইহাদের পেটে অন্ন পড়ে নাই দেখিয়া, উত্তমা সুন্দরী দুঃখিতা হইলেন এবং মহামায়ার মাতার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'চল মাসি! আমাদের বাড়ীতে।'

বৃদ্ধা, কন্যার মুখপানে চাহিল। উত্তমা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মহামায়ার হস্ত ধরিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে বলিলেন, 'চল বোন্! আমাদের বাড়ী যাবে, তাতে লজ্জা কি? আমরা ত পর নই!'

মহামায়ার মাতা উত্তমার মাতার সহিত 'সই' পাতাইয়াছিল ; সেই সম্পর্কের বলে উত্তমা বলিলেন, 'আমরা ত পর নই।' আজ উত্তমার মাতার কথা মনে পড়িল—তিনি বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিলেন। মহামায়া ও তাহার মাতা উত্তমার সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছিল, কিন্তু মুখে তাহারা উভয়েই প্রথমতঃ নানা কথা বলিয়া অসম্মতি জানাইল। তার পর উত্তমার মৃতা জননীর গুণের কথা ও ভালবাসার কথা বলিয়া অশ্রুজল ও দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া উপসংহার করিল। অবশেষে উত্তমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মহামায়া, তাহার জননী ও সন্তানগণ সহ তাঁহার বাড়ীতে গেল। রাইমোহন যাইবার সময় একটি কথাও বলিল না। উত্তমা স্বহস্তে তাড়াতাড়ি ভাতেভাত রাঁধিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতিথি-সৎকার করিলেন। আহারান্তে মহামায়া উত্তমার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'আমাদের উপায় কি হবে দিদি?'

পাড়ায় নবীনচন্দ্র ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি রেঙ্গুনে চাকরী করেন। বেতন তাঁহার পঞ্চাশ টাকা—অন্ততঃ দেশে এইরূপই প্রকাশ। তিনি সপরিবারে কার্য্যস্থলে থাকেন। পাঁচ বৎসরের পর এবার দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা! কন্যা দুইটি নাবালিকা। এদিকে পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। সুতরাং গিন্নী-ঠাকুরাণীকেই প্রতিদিন

দুই বেলা রাঁধিতে হইত। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তাই রন্ধন-কার্য্যের জন্য নবীনবাবু একজন অসহায়া ব্রাহ্মণ-রমণী খুঁজিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সঙ্গে সুদূর রেঙ্গুনে যাইতে স্বীকৃতা হয় নাই। উত্তমা এ সংবাদ অবগত ছিল। উত্তমার মুখে এ বিবরণ শুনিয়া মহামায়া যেন হাতে আকাশ পাইয়া বলিল, 'দিদি! আমায় যদি দয়া ক'রে কেউ নেয়, আমি যেঁতে প্রস্তুত আছি। স্বামী বেঁচে আছে, না কি হ'য়েছে, জানি না; মায়ের পেটের ভাই, সে ত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে। এখন আর দিদি, মানের ভাবনা ভেবে কি হবে? উপোষ করে ক'দিন থাকা যায়?—আমার জন্য আমি ভাবি না। ননীগোপাল, নবলক্ষ্মী না খেয়ে মরবে, এ কি দিদি, সহ্য ক'ত্তে পারা যায়? বাছা নন্দগোপাল আমার কোথায়, কি অবস্থায় আছে, ভগবান্ জানেন। আজ যদি সে আমার কাছে থাক্ত, তবে আমার কি ভাবনা ছিল?'

বলিতে বলিতে মহামায়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল, মহামায়ার রেঙ্গুনে যাওয়ার প্রস্তাবে তাহার মাতা বড় সম্মতি প্রদান করিল না। কিন্তু মহামায়া নবীনবাবুর সঙ্গে রেঙ্গুন যাইবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইল। অগত্যা উত্তমা তাহাকে নবীনবাবুর নিকট লইয়া গেলেন। মহামায়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া, নবীনবাবুর নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিল। নবীনবাবু শিকার জুটিয়াছে দেখিয়া, আহ্লাদে গদগদ হইয়া স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া বলিলেন, 'দেখ—এই স্ত্রীলোকটিকে রাখিবে কি না—সে যাইতে স্বীকৃত আছে।'

নবীনবাবুর স্ত্রী অবাক্ হইয়া বলিল, 'সে কি কথা? এ দের অবস্থা এরূপ হ'ল কিরূপে? ওঁদের নাকি ঢের টাকা ছিল—ওঁকে নিলে লোকে নিন্দে ক'রবে যে।'

'লোকের কথায় আমাদের কি হবে?—আমরা ত আর সাত আট বৎসরের মধ্যে দেশে আস্‌ছি না?'

'তা হ'লে কি হয়, উঁহার স্বামী বাড়ী ফিরে এলে তিনি-ই বা কি ভাব্‌বেন ?'

স্ত্রীর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নবীনবাবু মহামায়াকে সঙ্গে নেওয়া উচিত বোধ করিলেন। কিন্তু নবলক্ষ্মী ও ননীগোপাল সঙ্গে যায়—ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। কারণ, তাহাতে ব্যয় অধিক পড়িবে। নবীনবাবু মিষ্টবাক্যে মহামায়া ও তাহার জননীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, নবলক্ষ্মী ও ননীগোপাল জননীর সঙ্গে যায়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সুতরাং তাহাদিগকে দেশে রাখিয়া যাইতে হইবে। অনেক কাঁদাকাটা করিয়া মহামায়া ননীগোপালকে সঙ্গে লইবার অনুমতি পাইল। নবলক্ষ্মীর ভার তাহার দিদিমার স্কন্ধে পড়িল। সপুত্রা মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে রেঙ্গুনে চলিয়া গেল। তথায় প্রতিদিন দুই বেলা সুস্থ কি রুগ্ন শরীরে রাঁধিতে ত হইতই, তদুপরি আরও অনেক কাজ করিতে হইত। নবীনবাবু কিন্তু কিছুতেই মহামায়ার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন না। রেঙ্গুনে আসিয়া অবধি তিনি ভুলিয়াও একদিন মহামায়া বা ননীগোপালকে একটি মিষ্টবাক্য বা একখানি নব-বস্ত্র দান করেন নাই। তাঁহার স্ত্রীপুত্রের পরিত্যক্ত শতগ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ বস্ত্র দ্বারাই মহামায়া ও ননীগোপালের লজ্জা-নিবারণ করিতে হইত। মর্ম্মযাতনায় অধীরা হইয়া মহামায়া কখন একটু অশ্রুজল ফেলিলে অমনি বাবু রাগতস্বরে বলিতেন, 'সখের কান্না কাঁদ্‌তে হয়, দেশে গিয়ে কেঁদো—আমার বাড়ীতে রোজ রোজ এ সব উৎপাত কেন।'

সুদূর রেঙ্গুন হইতে মহামায়ার একাকিনী দেশে যাওয়া অসম্ভব—বিশেষতঃ তাহার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। নবীনবাবু তাহা জানিতেন। মহামায়া আপনার অদৃষ্টকে শত-সহস্র ধিক্কার দিয়া মনে মনে ভাবিত, 'কেন আমি এখানে এসেছিলুম ? দেশে থেকে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা ক'রে খাওয়াও আমার ছিল ভাল।'

হতভাগিনীর সকল দিন পেট পূরিয়া ভাত খাওয়াও ঘটিত না। গৃহিণী

স্বহস্তে প্রতিদিন চাউল মাপিয়া দিতেন। তাঁহাদের সকলের খাওয়া-দাওয়া হইয়া ভাত থাকিলে ননীগোপাল ও মহামায়ার আহার হইত, নতুবা উপবাসে থাকিতে হইত। এইরূপ আধ-পেটা খাইয়া দু'বেলা রাঁধিতে রাঁধিতে, হতভাগিনী মহামায়া-রোগগ্রস্তা হইয়া পড়িল। ননীগোপাল তাহার পরিবর্ত্তে রন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। বাবুর স্ত্রী একটি দিনও তাহার সাহায্য করিতে আসিত না। ইহার উপর রান্না একটু খারাপ হইলে, নবীনবাবু ননীকে গালাগালি দিতেন। সুকুমারীর আদরের ননীগোপালের আজ এই অবস্থা! সুকুমারী কিন্তু এ বৃত্তান্ত জানিতেও পারিল না। তাহার মনে বিশ্বাস যে, ননীগোপাল মাতুলালয়ে বাস করিতেছে। এ দিকে নবলক্ষ্মীও যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার বিবাহ হয় নাই। কে বিবাহ দেয়? বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিবাহ দিতে হইলে অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন। অবশেষে তাহার দিদিমা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া এবং পেট চালাইতে একেবারে অসমর্থ হইয়া—একটি অশিক্ষিত, অসামাজিক, সুরাপায়ী, ঋণ-গ্রস্ত, কুকর্ম্মরত ব্যক্তির নিকট হইতে কুলমর্য্যাদা-ব্যপদেশে পাঁচ শত টাকা গ্রহণ করিয়া, নবলক্ষ্মীকে তাহার করে সমর্পণ করিলেন। এরূপ স্বামীর হস্তে পড়িয়া নবলক্ষ্মী যে কিরূপ সুখে কাল কাটাইতে লাগিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সুখের দিন নিকটবর্ত্তী

সুকুমারীকে এখন আর চিনিতে পারা যায় না। চন্দনচর্চ্চিতা, গরদ-বস্ত্র-পরিহিতা, মৃগচর্ম্মে উপবিষ্টা সুকুমারী—স্বামি-চিন্তা, স্বামীর স্বর্গকামনা এবং স্বামীর 'শেষ চিহ্ন' সুধীরচন্দ্রের মঙ্গলপ্রার্থনা—জীবনের ব্রত

করিয়াছেন।" সুকুমারী এখনও বৃদ্ধা কিংবা প্রৌঢ়া হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ভক্তিপূর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী সন্দর্শন করিলে, তাঁহাকে স্বর্গচ্যুতা মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়াই ভ্রম হয়। কলিকাতা আসা অবধি সুকুমারী একবারমাত্র সুধীরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে গিয়াছিলেন, তাহাও দুই সপ্তাহের জন্য মাত্র। কিন্তু সুকুমারী কলিকাতায় বসিয়াও কৃষ্ণকমল, মুক্তকেশী ও সুশীলা, সরলার সংবাদ লইতেন। কৃষ্ণকমল বহু চেষ্টা করিয়া পুনরায় একটি পাঠশালা খুলিয়াছে। সরলা, সুশীলা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিল, কিন্তু কৃষ্ণকমল অর্থাভাবে তাহাদের বিবাহ দিতে পারিল না। সুকুমারী স্বয়ং চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া তাহাদের বিবাহ দেওয়াইয়া দিলেন। সেই বিবাহোপলক্ষেই সুকুমারী ও সুধীরচন্দ্র গঙ্গা-তীরে গিয়াছিলেন। তখন সুধীরচন্দ্র অজাতশ্মশ্রু বালক। জন্মস্থান ও পৈতৃক ভদ্রাসন দেখিয়া সুধীর প্রীত হইল, কিন্তু বাড়ীর হীনাবস্থা দেখিয়া তাহার বড় দুঃখ বোধ হইল। কালীকান্ত রায়ের ও জনক-জননীর প্রশংসাবাদ শুনিতে শুনিতে সুধীরচন্দ্র অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। সেই বিবাহোপলক্ষে রায় বাড়ীতে যত স্ত্রী-পুরুষ আসিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই সুধীরকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। কিন্তু সেই আনন্দ-প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই রামকমলের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে ছাড়ে নাই।

সুকুমারী ও সুধীরচন্দ্রের অমায়িকতা ও সুব্যবহারে গ্রামের সকলেই তাহাদের প্রতি বড় প্রীত হইল। তাহারা দেশে আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, সুকুমারীর হাতে অনেক টাকা জমিয়াছে। সকলেই সুকুমারী ও সুধীরচন্দ্রকে পুনরায় গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। সুধীর এই দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের সকলের সহিত আলাপ-পরিচয় করিল। তাহার স্বদেশভক্তি জন্মিল। ভগবান্

দিন দিলে, সে পৈতৃক ভদ্রাসনের শ্রী পরিবর্ত্তিত করিবে, মনে মনে স্থির করিল। সুকুমারীও তাহাই ভাবিলেন।

রামকমল যথাসময়ে মুক্তিলাভ করিলে, দীনেশবাবু তাহাকে বহুবাজারের নিজ বাসাবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। রামকমল সুকুমারীকে দেখিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল, 'মা গো! আমিই তোমার সকল দুঃখের মূল।—আমায় মন খুলে ক্ষমা ক'র্‌বে ত কর, নতুবা আমি আত্মহত্যা ক'রে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব। আমি আর পাপের যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পারি না।'

রামকমলের কঙ্কাল-মূর্ত্তি দেখিয়া সুকুমারী মর্ম্মাহত হইলেন। কাঁদিয়া সুধীরচন্দ্রকে বলিলেন, 'তোমার জ্যেঠা মশাইকে দুঃখ ত্যাগ করিতে বল। ওঁর প্রতি আমার আর কোনই রাগ নাই।'

রামকমল একটু স্থির হইল এবং দীনেশবাবু, সুধীরচন্দ্র ও তাহার জননীর বিশেষ অনুরোধে সেদিন সেখানেই আহার করিল। সুকুমারী তাহাকে কালবিলম্ব না করিয়া গৃহে যাইতে বলিলেন। গৃহের অবস্থা রামকমল সমস্তই জানিতে পারিয়াছিল। সে অশ্রু ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিল, 'আর নয়!'

পরদিন প্রাতঃকালে তাহাকে আর কেহ বাসায় দেখিতে পাইল না—সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এ দিকে নবলক্ষ্মী ঋণগ্রস্ত, মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র স্বামীর হস্তে পড়িয়া নানাপ্রকার কষ্ট পাইতে লাগিল। চরিত্রহীন স্বামীর কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া হতভাগিনী নবলক্ষ্মীও চরিত্রহীনা হইয়া পড়িল। কুশিক্ষাপ্রাপ্ত নন্দগোপাল মুক্তিলাভ করিয়া নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়া নানারূপ অসদুপায়ে, অতি কষ্টে উদর পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মদ্য, গাঁজা, গুলী, চণ্ডু ইত্যাদি নবগুণ তাহাতে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাকে দেখিলে আর ভদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

এ দিকে দীনেশবাবুর যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয় সফল হইল।

সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণ একই বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সুকুমারী সুধীরচন্দ্রের পাঠের ক্রমোন্নতি দেখিয়া প্রীত হইতেছিলেন, আজ তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে সুধীরচন্দ্র জননীর মনোগত ভাব বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহার পিতা-মাতা কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মাখনলাল কিরূপে শৈশবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহার স্নেহময়ী ঠাকুর-মা কিরূপে অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ইত্যাদি সকল কথাই সুধীরচন্দ্র অবগত হইয়াছে। মায়ের মুখ প্রীতি-প্রফুল্ল দেখিবার জন্য অনেক দিন ধরিয়া সুধীর বড় ব্যস্ত হইতেছিল। পাঠত্যাগ করিয়াই সে চাকরী অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইল। ইন্দুভূষণ আইন পাঠ করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

মানবী, না দেবী!

সুধীরচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুন্দরী, সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী ও বুদ্ধিমতী ভার্য্যা পাইয়া সুধীরচন্দ্র সুখে কালযাপন করিতেছে। তাহার জননীও গুণবতী, নত-স্বভাবা পুত্রবধূ পাইয়া সুখী হইয়াছেন। সুধীরবাবু সপরিবারে পরমসুখে জন্মভূমিতে বাস করিতে লাগিলেন। গঙ্গাতীরের পৈতৃক ভদ্রাসন এখন আর চামচিকা, ইঁদুর ইত্যাদির আবাসস্থল নহে। হরিদাস বণিক্য প্রাপ্য টাকার জন্য রামকমলের ইষ্টকালয় ও ভদ্রাসনের অংশ দখল করিয়া মহামায়া প্রভৃতিকে গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। সুধীরচন্দ্র পূর্ব্ব-সঞ্চিত অর্থ দ্বারা হরিদাস বণিক্যের নিকট হইতে সেই সমস্ত সম্পত্তি সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়া

ক্রয় করিয়া লইলেন। সেই অবধি রামকমলের সকল সম্পত্তি সুধীরচন্দ্রের হইল। অনতিবিলম্বে কালীকান্ত রায়ের অর্দ্ধনির্ম্মিত ইষ্টকালয় সম্পূর্ণ হইল। তদুপরি দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইল। পুষ্করিণী ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটে সুশোভিত হইল। বাড়ী, ঘর, বাগান, প্রান্তর, রাস্তা, ঘাট সুপরিষ্কৃত হইল। লক্ষ্মীর আগমনে বাড়ীর সেই লক্ষ্মীছাড়া মূর্ত্তি দূর হইল। গ্রামবাসিগণ, স্বর্ণকমলের 'শেষ চিহ্ন' সুধীরচন্দ্র ও তাহার রূপগুণসম্পন্না সহধর্ম্মিণীকে সন্দর্শন করিয়া প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা শ্রীসম্পন্ন নবদম্পতীকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রৌঢ়ারা দলে দলে আসিয়া সুকুমারীকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে রত্নগর্ভা বলিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সুকুমারী গরদবস্ত্র পরিয়া নামাবলী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, সর্ব্বদা মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিয়া, একমনে স্বর্গকামনা ও হরিপদ চিন্তা করিতেন। পূর্ব্বপরিচিত প্রতিবেশিনীগণ আসিলে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে সস্ত্রীক সুধীরচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিতেন। সকলেই তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া বলিতেন, 'এমন রতন ছেলে—এমন সোণার বৌ—এদের আশীর্ব্বাদ ক'রব না, ত ক'রব কাকে ?'

সুকুমারীর দিন ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হন নাই। এ সুখের সময় তাঁহার সেই দুঃখের কথা মনে পড়িত; সেই প্রেমময়, স্নেহশীল স্বামীর সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি মনে পড়িত, আর অমনি তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইত। সকলে তাঁহাকে সৌভাগ্য-শালিনী, রত্নগর্ভা ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার অদৃষ্টের প্রশংসা করিত, তিনি তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতেন। এইরূপে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সুকুমারীর দেশে আগমনে কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশীর যথেষ্ট উপকার হইতে লাগিল। সুধীরবাবু তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন

করিতেন, ইহাতে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। কৃষ্ণকমলের ইষ্টকালয়ের কড়ি ও বরগাগুলি অতি জীর্ণ ও কীটদষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং মেরামত অভাবে প্রকোষ্ঠগুলির মূর্ত্তি অতি কদর্য্য হইয়াছিল। অর্থাভাবে কৃষ্ণকমল ইহার মেরামত করিতে পারে নাই। সুধীরচন্দ্র বাড়ী আসিয়া নিজ ইষ্টকালয় প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠতাত-দ্বয়ের ইষ্টকালয় দুইটির জীর্ণ-সংস্কার করিয়া দিলেন। লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। মঙ্গলা ও ভজহরি সুধীরবাবুর প্রশংসা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

সুধীরবাবু যে উচ্চ বিদ্যালয় হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সে কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ নেল সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। সুধীরবাবু পাঠত্যাগের পরও সাহেব মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট পত্র লিখিতেন। সুধীরচন্দ্র গঙ্গাতীরে পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন, এমন সময় একদিন নেল সাহেবের পত্র আসিল। পত্রে সাহেব তাঁহাকে অতি শীঘ্র কলিকাতায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সুধীরবাবু কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা যাইয়া প্রাতে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। সাহেব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। ভাল ত?'

'আজ্ঞে, হাঁ মহাশয়! আপনি যে আমায় দয়া ক'রে পত্র লেখেন, এতে আমার সুখের সীমা থাকে না।'

এইরূপ কিয়ৎকাল আলাপের পর সাহেব বলিলেন, 'তুমি কি চাকরী করতে চাও?'

'তা ভিন্ন আর উপায় কি?'

'আমি আজ ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি। আমার সঙ্গে চল, তোমাকে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব।'

সুধীর সাহেবের সঙ্গে চলিলেন। গাড়ী যথাসময়ে আলিপুর রাজ-প্রাসাদের প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সোপানশ্রেণীর তলদেশে

থামিল। সাহেবের সঙ্গে সুধীরচন্দ্রও দ্বিতলোপরি উঠিয়া লাট-সাহেবকে অভিবাদন করিয়া বসিলেন। অন্যান্য দুই চারিটি কথার পর, নেল সাহেব সুধীরচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ইনি আমার প্রিয় ছাত্র। নাম সুধীরচন্দ্র রায়। গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।'

ছোট লাট সস্মিত-বদনে সুধীরবাবুর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার সহিত পরিচিত হয়ে সুখী হ'লাম।'

সুধীরবাবু ছোট লাটের মিষ্টবাক্যে তুষ্ট হইলেন। অতঃপর সাহেবদ্বয় ফিস্-ফিস্ করিয়া দুই চারিটি কথা বলিলেন, সুধীরবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যথাসময়ে নেল সাহেবের সহিত তিনি লাটভবন হইতে বহির্গত হইলেন। নেল সাহেব বাড়ী পৌছিয়া সুধীরবাবুকে বলিলেন, 'তুমি বোধ হয় শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছ?—তা, সম্প্রতি যাও। আমি তোমার চাকরীর জন্য চেষ্টা করিব।'

সুধীরচন্দ্র সাহেবকে শত-সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা হইতে সুধীরবাবুর গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার এক পক্ষ অতীত হইতে না হইতেই দেশে রাষ্ট্র হইল যে সুধীরবাবু হাজার টাকা বেতনে ডেপুটীগিরি পাইয়াছেন। সুধীরবাবু অবশ্যই কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে তাঁহার নিকট একখানি সরকারি লেপাফা আসিল। ব্যস্ততা-সহকারে সুধীরবাবু তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন। সত্য সত্যই সেখানা ছোটলাটের নিয়োগ-পত্র। সুধীরবাবু আড়াই শত টাকা বেতনে নলকাটী নামক স্থানে ডেপুটী ম্যাজিষ্টর নিযুক্ত হইলেন। গঙ্গাতীর গ্রামের রায়-পরিবারে আজ আনন্দস্রোত বহিল। সুকুমারী আজ এই সুখসংবাদ শ্রবণ করিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না।

দোল-দুর্গোৎসব ও পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ এত দিন বন্ধ ছিল, আবার তাহা আরম্ভ হইল। এই সুখের সময় সহৃদয়া সুকুমারী, ননীগোপাল,

নন্দগোপাল, নবলক্ষ্মী ও তাহাদের জনকজননীকে ভুলিতে পারিলেন না।—তাঁহার সাধ হইল, একবার সকলে মিলিয়া সুখ-শান্তিতে বাস করেন। মাতৃ-বৎসল সুধীরচন্দ্র তাহাদের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, নবলক্ষ্মী মাতুলালয়ে বাস করিতেছে, বড়-বৌ ও ননীগোপাল রেঙ্গুনে আছে। নন্দগোপাল কিংবা তাহার পিতার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। নবলক্ষ্মীকে গঙ্গাতীরে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। হতাদরা নবলক্ষ্মী অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছিল, আজ হাসিতে হাসিতে পিতৃগৃহে আসিল। সুকুমারী ননীগোপালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হ্রাস হয় নাই। জননীর তুষ্টি-সম্পাদনার্থ সুধীরচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া রেঙ্গুনে লোক পাঠাইলেন। মঙ্গলা সঙ্গে গেল। গিয়া দেখিল, রুগ্না মহামায়া তখনও নবীনবাবুর পাচিকাস্বরূপ কাজ করিতেছে; আর ননীগোপাল সেই রেঙ্গুনেই আর এক বাবুর বাসায় পাচক নিযুক্ত হইয়াছে। নবীনবাবু অতি অনিচ্ছার সহিত মহামায়াকে যাইতে অনুমতি দিলেন। মহামায়া হাতে আকাশ পাইল। ননীগোপাল অর্থাভাবে এতদিন দেশে যাইতে পারে নাই, আজ তাহারও আনন্দের সীমা রহিল না। উভয়ে আজ কারামুক্ত বন্দীর ন্যায় গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিল। নবীনবাবুর স্ত্রী রন্ধনকার্য্য প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহাকে তাহা শিখিতে হইল। বড়-বৌ চোরের মত বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং পুত্র-কন্যার সহিত মিলিত হইয়া একটু সুখী হইল। মহামায়া ও ননীগোপালের মূর্ত্তি এত শুষ্ক, ক্ষীণ ও রুগ্ন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে পারা যায় না। মহামায়ার আজ স্বামীর কথা ও নন্দগোপালের কথা মনে পড়িল। চক্ষু জলপূর্ণ হইল। সুকুমারীর সুমধুর চরিত্র ভাবিয়া সে আজ মনে মনে বড় লজ্জিতা হইল। সে ভাবিল, 'ইহার প্রতি আমরা কত অসদাচরণ করিয়াছি, কত প্রকারে ইহাকে লাঞ্ছনা দিয়াছি—পতি-পুত্রে বঞ্চিতা করিয়াছি, কিন্তু তবুও ছোট-বৌর কত দয়া! ছোট-বৌ নিজ

টাকায় আমাদের বাড়ী-ঘর সমস্ত ক্রয় করিয়া লইয়াছে, আজ আবার তাহা আমাদিগকে দান করিল ! এমন ক'জনে করিতে পারে ? আমাদিগকে সে ঠিক আপনার মত দেখিতেছে। আহা ! ছোট-বৌ কি দেবী, না মানবী ? আজ যে ঠাকুর-পো নাই, মাখনলাল নাই, সে ত আমাদেরই জন্য। ভগবান্ ! আমাদের উপায় কি হবে ?'

ভাবিতে ভাবিতে মহামায়া কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন, 'বড়-দিদি ! তুমি কেঁদ না। আমি প্রাণপণ ক'রে নন্দগোপাল ও তার পিতার সন্ধান ক'রব। তুমি কেঁদ না, দিদি !'

মহামায়া আরও কাঁদিয়া বলিল, 'আমি তাদের জন্য কাঁদ্‌ছি না।'

'তবে কেন কাঁদ দিদি ?' মহামায়া সে কথার উত্তর দিতে পারিল না, কেবল অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কেঁদ না দিদি ! সে তোমার দোষ কি ? ভগবান্ অদৃষ্টে যা লিখেছেন, তা হয়েছে! এখন সে জন্য কিসের দুঃখ, দিদি ?'

সুকুমারী অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিলেন। বড়-বৌ এখন আর সে বাঘিনী রহিল না। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পীর ন্যায় সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া দিনপাত করিতে লাগিল। সুকুমারীকে এখন দেখিলে তাহার ভয় হয়, তাহার সহিত অধিক কথা বলিতে লজ্জাবোধ হয় ! ননীগোপাল রেঙ্গুনে কেবল রন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল, কাগজ কলমের সহিত তাহার একটা সম্বন্ধ ছিল না। সুধীরবাবু প্রকারান্তরে জ্যেষ্ঠতাতজ-ভ্রাতার সামান্যরূপ লেখা-পড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

নলকাটীর ফৌজদারী আদালতে আজ লোকে লোকারণ্য। ডেপুটী-বাবু একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী বারবিলাসিনীর জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছিলেন, তাই আদালতে লোকের এত ভিড়। ডেপুটীবাবুর সম্মুখে, দক্ষিণ পার্শ্বে, বাদিনী বারবিলাসিনী জবানবন্দী দিতেছিল, তাহার বামদিকে আসামীর বাক্সে একটি রুক্ষকেশ, মলিনবদন, রক্তচক্ষু যুবক ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসামীর বয়স ত্রিশ কিংবা বত্রিশ বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু চেহারা দেখিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক অনুমান হইয়া থাকে। মোক্তার বাদিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নাম কি?'

'হরিমতি।'

'বয়স কত?'

'সতের বছর।'

'থাক কোথা?'

'এই বন্দরে।'

'তোমার কি নালিশ?'

হরিমতি আসামীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিল, 'ঐ বামুন ঠাকুর—ওর নাম রাধারমণ—আমার বাড়ীতে থাকত। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন সে আমার গহনার বাক্স, টাকা, পয়সা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে। ধর্ম্মাবতার! ঠাকুর দাগী চোর আর একবার চুরি ক'রে জেল খেটেছে।'

হরিমতির পক্ষসমর্থন জন্য কয়েকজন মোক্তার নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা অনেকেই তাহার অভিযোগের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে লাগিল। কিন্তু আসামী অর্থহীন, অজ্ঞাতকুলশীল; কেহই তাহার পক্ষ গ্রহণ করে

নাই। কি কারণে বলিতে পারি না, বিধুভূষণ নামক একজন মোক্তার হরিমতির প্রতি একটু বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসামীর পক্ষে হরিমতিকে জেরা করিতে লাগিল।

বিধু। তুমি ব'ল্লে, 'আসামী তোমার বাড়ীতে থাকৃত।'—তোমার বাড়ীতে থাকৃত কেন?

হরিমতি। ওর বাড়ী-ঘর নাই ব'লে—

বিধু। যাদের বাড়ী-ঘর নাই, তারা সকলেই কি তোমার বাড়ীতে থাকে?

হরিমতি। তা কেন?—তবে—তবে—

বিধু। তবে কি? বল, কেন?

হরিমতি আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল, এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, ওর বাড়ী-ঘর নাই, কিসে জান্‌লে?'

হরিমতি। ওর মুখেই শুনেছি।

বিধু। ওর সঙ্গে তোমার কত দিনের চেনা?

হরিমতি। সাত আট বছরের—

বিধু। আচ্ছা, তোমার বাড়ী থেকে আসামী কি ক'র্‌ত?

হরি। হাটবাজার ক'র্‌ত—পান-তামাক সাজ্‌ত—

বিধু। খেতো কোথা?

হরি। আমার বাড়ীতে।

বিধু। কে খেতে দিত?"

হরি। আমি।

বিধু। শুতো কোথা?

হরি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে শুতো—তখন ছিল ভাল। এখন ওর বুদ্ধি বিগ্‌ড়ে গেছে ব'লে—

বিধু। চুপ্ কর—এখন শোয় কোথা ?

হরিমতি একটু বিরক্তিসহকারে বলিল, 'তা তুমি ত জান—তবে কেন আমায় জ্বালাতন ক'চ্ছ ? তুমিই ত সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছ।'

বিধু। চুপ্ কর—যা জিজ্ঞাসা করি তাই বল। একটিও বেশী কথা ব'লো না।—আচ্ছা, আসামীর স্বভাব কেমন ?

হরি। গাঁজাখোর মদখোরের স্বভাব আবার ভাল কবে ?

বিধু। ওর গাঁজা-মদের পয়সা জোটে কোথা থেকে ?

হরি। দশজনে দিয়ে থাকে, এই ত সেদিন তোমরা ওকে কত মদ-মাংস খাওয়ালে—

বিধুভূষণ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'চুপ্ কর—ফের বেশী কথা ক'য়ো না,—ওর স্বভাব ভাল না হ'লে এতদিন তবে তোমার বাড়ীতে থাক্‌তে দিলে কেন ?'

অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও হরিমতি এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। ইহার পর, তাহার পক্ষের দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইলে হরিমতির মোক্তারগণ বক্তৃতা করিল, 'ধর্ম্মাবতার! মোকদ্দমা সম্পূর্ণ সত্য। আসামী একজন বদ্ধ মাতাল ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়ে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ ক'রে বারবিলাসিনীর ক্রীতদাস হ'য়েছে—এতেই এর চরিত্র বুঝে নিন্। লোকটা অভাবে প'ড়ে এই দুষ্কর্ম্ম ক'রেছে। ধর্ম্মাবতার! দুষ্টের দমন ক'রে দেশে শান্তি স্থাপন করুন।'

অতঃপর মোক্তার বিধুভূষণ আসামীর পক্ষে বলিল, 'ধর্ম্মাবতার! এই মোকদ্দমাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, আপনার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিমের বুঝ্‌তে কালবিলম্ব হবার সম্ভাবনা নাই। হরিমতি আসামীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল, কিন্তু আসামী কিছু দিন যাবৎ অন্য কোন বারবিলাসিনীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে হরিমতির গৃহ ত্যাগ ক'রে যাওয়ায়, ওর হিংসার উদ্রেক হ'য়েছে এবং অনেক চেষ্টা ক'রেও আসামীকে পুনরায় বাড়ীতে নিতে না পেরে

প্রতিশোধ নেবার দুরাশায় আসামীর বিরুদ্ধে এই ক্লেশদায়ক মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত ক'রেছে।'

বিধুভূষণের বক্তৃতা শুনিয়া হরিমতির ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল; সে হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, 'হুজুর! ঐ মোক্তার, বিধুবাবু আমার শত্রু—ওর কথা বিশ্বাস ক'রবেন না। ওই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে। আমার মোকদ্দমা মিথ্যা নয়।'

হাকিম হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার সঙ্গে মোক্তার বাবুর কি শত্রুতা?'

হরিমতি। আজ্ঞে, সে কথা এত লোকের মাঝে ব'লতে পারি না।

সমস্ত লোক সে কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু বিধুভূষণ তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'আমরা মোক্তার, আমাদের কেহই শত্রু-মিত্র নাই। যে আমাদের নিযুক্ত করে, আমরা তার পক্ষই সমর্থন করি।'

হাকিম আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি মোক্তার দিয়েছ?'

আসামী। আজ্ঞে না, আমি পয়সা কোথায় পাব?

ডেপুটীবাবু বিধুভূষণকে চুপ করিতে বলিয়া পুনরায় আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি গহনার বাক্স চুরি ক'রেছ?'

আসামী। আজ্ঞে না, ওর বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় গাঁজার জন্য একটি পয়সা নিয়েছিলুম মাত্র।

ডেপুটীবাবু মোক্তারের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া রায় লিখিলেন,—

'রাধারমণ যে গহনার বাক্স চুরি করিয়াছে, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ নাই, সুতরাং সে অভিযোগ হইতে আমি আসামীকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু আসামী নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, গাঁজা সেবনের জন্য একটি পয়সা চুরি করিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে দশ বেত খাইতে হইবে।'

আসামীকে পুলিশ-প্রহরীরা ধরিয়া লইয়া গেল। ডেপুটীবাবুর আজ্ঞা

কার্য্যে পরিণত হইল। আসামী বেত্রাঘাত-যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, কেহ তাহার দুঃখ দেখিল না, কেহ তাহার জন্য কাঁদিল না।

সেই দিনই মহকুমায় একটা কথা উঠিল, 'আসামী ডেপুটীবাবুর আপনার ভাই। বহুদিবস যাবৎ বাড়ী-ঘর ত্যাগ ক'রে কুসংসর্গে মিশে ছদ্মবেশে আছে ব'লে, ডেপুটীবাবু তাকে চিন্‌তে পারেন নাই।'

কথাটা ক্রমে ডেপুটীবাবুর কর্ণে গেল। তাঁহার মনে বহুকাল-বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় একটা কথা জাগিয়া উঠিল। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাতজ-ভ্রাতা যে বাল্যকালে চুরি করিয়া চরিত্রসংশোধক কারাগারে গিয়াছিল এবং এখন নিরুদ্দেশ আছে, এ কথা সুধীর জানিতেন। আজ তাঁহার সন্দেহ হইল। তৎক্ষণাৎ আসামীকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। আসামীকে দেখিয়া ডেপুটীবাবুর সন্দেহ আরও বাড়িল। তিনি ব্যগ্রতা-সহকারে আসামীকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্য করিয়া বল—তোমার নাম কি, তুমি কাহার পুত্র?'

সেই মদ্যপায়ী, গঞ্জিকাসেবক আসামী মাতালের ন্যায় বলিল, 'কেন, আবার বেত মার্‌তে হুকুম দেবেন নাকি? একবার সত্যকথা ব'লে বেত খেয়েছি! আবার সত্যকথা?'

ডেপুটীবাবু যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'না, আর ভয় নাই। সত্য ক'রে বল, তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ত জানেনই—রাধারমণ।'

'সত্য-সত্যই কি তোমার নাম রাধারমণ?'

'অত সত্য-মিথ্যার প্রয়োজন কি? বেত মার্‌তে হয় মারুন।' বলিয়া সে স্বীয় ছিন্নবস্ত্রের এক কোণ হইতে একটু গাঁজা বাহির করিয়া বামহস্তের তলায় রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহা টিপিতে লাগিল। আসামী বেত্রাঘাত ভোগ করিয়া গিয়াই গাঁজায় খুব দম লাগাইয়াছিল, কিছু মদিরা

পানও করিয়াছিল। সেই নেশা না ছুটিতেই সে আবার গাঁজা প্রস্তুত করিতে লাগিল। ক্রমে ডেপুটীবাবুর সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার নাম, ধাম ও পরিচয় ব'লতে পারি।'

রাধারমণ গাঁজা টিপিতে টিপিতে, চিত্রপুত্তলীর ন্যায় ডেপুটীবাবুর মুখের দিকে চাহিল। ডেপুটীবাবু বলিলেন, 'তোমার নাম নন্দগোপাল, পিতার নাম রামকমল রায়—বাড়ী গঙ্গাতীর গ্রামে। সত্য কি না, বল?'

এত পরিচয় শুনিয়া রাধারমণের ভয় হইল, সে তখন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু ডেপুটীবাবু তাহাকে যাইতে দিলেন না। রাধারমণের মুখ শুকাইয়া গেল, সে ভাবিল, তাহাকে আবার কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ডেপুটীবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'এ আপনার নিজের বাড়ী—আপনার কোন চিন্তা নাই। রামকমল রায় মহাশয় আমার সাক্ষাৎ জ্যেঠা, আপনি আমার জ্যেষ্ঠতাতজ-ভ্রাতা, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

লজ্জায় উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিলেন। নন্দগোপালের পরিচর্য্যার জন্য আজ লোক নিযুক্ত হইল। সুধীরবাবুর বিশেষ অনুরোধ-ক্রমে নন্দগোপালকে আজ সেই অপরাহ্ণ-সময়ে শীতল জলে স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান করিতে হইল। সন্ধ্যার পর, নন্দগোপাল বেশ পরিতৃপ্ত-রূপে আহার করিল। গৃহত্যাগের পর নন্দগোপাল আর এরূপ পরিতৃপ্ত আহার ও শান্তিপূর্ণ নিদ্রা লাভ করিতে পারে নাই।

পরদিন প্রত্যূষে ডেপুটী নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। নন্দগোপাল একটু অন্তরালে যাইয়া গাঁজা টিপিতে লাগিল। এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহার পরিধানে অতি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র, স্কন্ধদেশে ব্রাহ্মণের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত। ভিক্ষুক কাতর-কণ্ঠে বলিল, 'বাবু মশায়! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, অতি দুঃখে প'ড়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছি, কা'ল আহার হয় নাই, দয়া ক'রে খেতে দিন।'

ডেপুটীবাবু তাহাকে দুই গণ্ডা পয়সা প্রদান করিলেন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিল।

নন্দগোপাল গাঁজা টিপিতেছে দেখিয়া, সে একটু দাঁড়াইল। নন্দগোপাল তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈঙ্গিত করিল। উভয়ে কয়েকটি দম লাগাইল—বাক্যালাপ চলিতে লাগিল। হঠাৎ উভয়ের মনে অস্ফুটা সন্দেহ উপস্থিত হইল—উভয়ে নিমেষশূন্য-লোচনে পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সন্দেহের পর কৌতূহল, কৌতূহলের পর পরিচয়, পরিচয়ের পর লজ্জা।

নন্দগোপাল পিতার নিকট ডেপুটীবাবুর পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধ রামকমল সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। ডেপুটী-বাবু এ সংবাদ অবগত হইয়া তাহার জন্য লোক পাঠাইলেন; প্রেরিত লোক মিষ্টবাক্যে বৃদ্ধকে পুনরায় লইয়া আসিল। বৃদ্ধ রামকমল লজ্জায় ও দুঃখে কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিল না। আজ তাহার আবার পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। অন্যান্য শত কথার মধ্যে আজ তাহার স্বর্ণকমল ও সুকুমারীর অমায়িক চরিত্র ও নিজ পত্নী মহামায়ার হিংসাপূর্ণ কুটিল বুদ্ধির কথা মনে পড়িল—আর আজ সে চক্ষের উপর দেখিতে পাইল—আপন পুত্র নন্দগোপাল, আর স্বর্ণকমলের পুত্র সুধীরচন্দ্র। আজ বৃদ্ধ ভালরূপ বুঝিতে পারিল যে, ভগবান্ আছেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত, হিংসুকের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। বৃদ্ধ রামকমল কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, কিছুতেই তাহার প্রাণ স্থির হইল না। জেলের মধ্যে সুধীরচন্দ্রকে দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হয় নাই, আজ নয়ন ভরিয়া সে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিতে লাগিল। আজ বহুদিন পরে বৃদ্ধ রামকমলের মস্তকে তৈলজল পড়িল। এতদিন ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া তাহার যত কষ্ট ও অনুতাপ না হইয়াছে, আজ বিমল ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া ও উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিয়া সে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কষ্ট ও অনুতাপ করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে

ডেপুটীবাবু সাত দিবসের ছুটী লইয়াছিলেন। পরদিন তিনি জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিলেন। পিতা-পুত্রের বেশ পরিবর্ত্তিত হইল—বহুদিবসের পর আজ সুবিমল ধৌত বস্ত্রে তাহাদের অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধিত হইল। যথাসময়ে সকলে গঙ্গাতীরে পৌঁছিলেন।

উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

রামকমলের পরিণাম

সুধীরবাবুর স্ত্রী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিত এ পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরেই বাস করিতেছেন। মহামায়া ও নবলক্ষ্মী সুকুমারীর শরণাগত হইয়া তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। সুধীরবাবুর অনুরোধে কৃষ্ণকমল সপরিবারে সুধীরবাবুর গৃহেই আহারাদি করিতে লাগিলেন। সুধীরবাবু কৃষ্ণকমলের উপর সংসারের তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিলেন। সুকুমারী পূর্ব্বকথা যেন একেবারে বিস্মৃত হইয়া সকলের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটি সাধ এই যে, মহামায়াকে স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়া আর একবার তাহাদিগকে সুখী করিবেন।

মাতৃ-আজ্ঞানুসারে সুধীরবাবু কলিকাতা, কাশী, গয়া প্রভৃতি অনেক স্থানে রামকমল ও নন্দগোপালের অনুসন্ধান করাইয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন স্থানে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভগবানের অনুকম্পায় ও সুকুমারীর পুণ্যফলে, আজ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সুধীরচন্দ্র তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন।

গ্রামের অধিকাংশ লোকের নিকটই এখন রামকমল ও নন্দগোপাল অপরিচিত। আজ বিশ বৎসরের অধিক সময় যাবৎ তাহারা গ্রাম-ছাড়া। ইতিমধ্যে গ্রামের কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহাদের নিকট নিজ জন্মস্থান অপরিচিত গ্রাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রামকমল ও

নন্দগোপালের আজ অপরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতেও লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তাহাদের মনে হইতে লাগিল যে, সকলেই তাহাদের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিতে আসিতেছে। রায়-বাড়ীতে আজ লোকের ভিড় হইতে লাগিল। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব তামাসা দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া রায়বাড়ী যাইতে লাগিল।

বহুদিবস পরে আজ রামকমলের পরিবারবর্গের সহিত পরস্পরের সম্মিলন হইল—স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, জননী, ভগিনী প্রভৃতির পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু মিলন বড় সুখের হইল না—এ মিলনে তাহাদের কেহই যেন বড় শান্তি বোধ করিতে পারিল না। নন্দ-গোপাল মায়ের পদধূলি লইল, তার পর মায়ের উপদেশানুসারে সুকুমারীর পদধূলি লইল। সুকুমারী প্রফুল্লমুখে মহামায়াকে বলিল, 'বড়-দিদি! আজ আমার সাধ পূর্ণ হ'য়েছে। আজ তোমাদিগকে একত্র দেখে আমি সুখী হ'য়েছি—ভগবান্ করুন, তোমরা সুখী হও।'

তার পর ক্রন্দন। রামকমলের কারাগারে গমনের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, এ পর্য্যন্ত সে তদ্বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই। আজ সে নিজে পরিবারের অবস্থা ও সুকুমারীর সদ্ব্যবহারের কথা অবগত হইল। প্রবল বন্যার জলের ন্যায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সবেগে তাহার মনে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল, রামকমল আর স্থির থাকিতে পারিল না। বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল, 'ভাই রে স্বর্ণকমল!'

একবার নহে, দুবার নহে, বৃদ্ধ রামকমল গভীর আর্ত্তনাদ-সহকারে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, 'প্রাণের ভাই স্বর্ণকমল! আজ তুমি কোথায় ভাই?—বাবা মাখনলাল! কোথা রহিলে বাবা!—মা গো! আমাদের ফেলে তোমার সুপুত্র স্বর্ণকমলকে নিয়ে তুমি কোথায় লুকিয়ে র'য়েছ মা! আমরা কুপুত্র ব'লে কি আর দেখা দেবে না?'

রামকমল কাহারও বারণ না শুনিয়া, কাহারও প্রবোধবাক্য না মানিয়া, বক্ষে ও শিরে করাঘাত করিয়া—ভাই, ভাই-পো ও জননীর জন্য কাঁদিতে লাগিল। স্বহস্তে যাহাদের প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই স্বর্ণকমল, সেই ভ্রাতুষ্পুত্র মাখনলাল ও সেই বৃদ্ধা জননীর জন্য আজ রামকমল কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া, নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল কাঁদিতে লাগিল, মুক্তকেশী কাঁদিতে লাগিল, সুকুমারী সান্ত্বনা-বাক্য বলিতে আসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া বসিয়া পড়িলেন, সুধীরচন্দ্রও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। রায়বাড়ীতে এই সম্মিলনের দিনে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সকলেই শান্ত হইল, কিন্তু রামকমল শান্ত হইল না। তাহার ভ্রাতৃশোক ও মাতৃশোক যেন ক্রমেই বাড়ীতে লাগিল। সারা রাত্রি সে 'ভাই রে!' 'মা গো!' 'স্বর্ণকমল রে!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সত্য-সত্যই রামকমল পাগল হইল!

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

পাঠক-পাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি নিবারণের জন্য, এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া, আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

দ্রুতগতিতে সুধীরবাবুর পদোন্নতি হইতে লাগিল। এখন তিনি মাসে পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। রায়-পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তির আয় দ্বারা গঙ্গাতীরে পারিবারিক খরচ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। সুধীরবাবুর স্বোপার্জ্জিত ধন দ্বারা নূতন সম্পত্তি খরিদ এবং সুরম্য ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইতে লাগিল। গঙ্গাতীরের রায়বাড়ী দ্বিতল ইষ্টকালয়-পরিশোভিত হইতে লাগিল। ৺কালীকান্ত রায়ের সেই অর্দ্ধনির্ম্মিত ইষ্টকালয় ইতিপূর্ব্বে দ্বিতল অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠকগণকে বলিয়াছি। রায়বাড়ীতে এখন আর খড়ের ঘর রহিল না।

বহির্ব্বাটীতে সুধীরবাবু 'স্বর্ণকমল বিদ্যালয়' স্থাপন করিলেন। গ্রামের বালকগণ এখানে বিনা বেতনে বঙ্গভাষা ও সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা পাইতে লাগিল। আরও স্থাপন করিলেন—'কৃপাময়ী দাতব্য-চিকিৎসালয়।' এখানে দীন-দুঃখীগণ বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়া সুধীরবাবুকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

সুকুমারী কখন সুধীরবাবুর কার্য্যস্থলে, কখন বা গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। সুধীরবাবু প্রতিমাসে জননীর নিজ ব্যয়সম্পাদনার্থ তাঁহার হস্তে একশত টাকা দিতেন। সুকুমারী দেবসেবা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, যাগ-যজ্ঞ, তীর্থ-পর্য্যটন, ব্রতোপাসনাদি কার্য্যে তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতেন—অবশিষ্টাংশ অনাথ বালকবালিকা, বিধবা স্ত্রীলোক, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও গৃহদগ্ধ ব্যক্তিগণকে দান করিয়া ফেলিতেন—তাহার এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতেন না। পরদুঃখকাতরা সুকুমারী পরদুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিয়া চন্দনচর্চ্চিতা দেবী সুকুমারী পরমানন্দলাভ করিতে লাগিলেন। দেশে তাঁহার নামে ধন্য ধন্য হইতে লাগিল।

রামকমলের উন্মত্ততা সারিল না, বরং ক্রমে আরও বাড়িতে লাগিল। 'কৈ স্বর্ণকমল?' রবে রামকমল গগন পূর্ণ করিতে লাগিল। তার পর সে লগুড়হস্ত হইল। 'আমার ভাইকে এনে দে, নতুবা আমি সব শালাকে খুন ক'রে ফেল্‌ব' বলিয়া সে যাহাকে তাহাকে তাড়া করিয়া যাইত। একদিন এই কথা বলিতে বলিতে সে হতভাগিনী মহামায়াকে আক্রমণ করিল। মহামায়া ভীতা হইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

'হারামজাদি! নচ্ছারি! এখনো আমার ভাইকে এনে দিলি না?' বলিয়া সে মহামায়ার মস্তকেই লগুড়াঘাত করিল। আহা! সেই আঘাতেই মন্দভাগিনীর মস্তক কাটিয়া গেল, দর-দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল!

ইহার পর আর মহামায়ার জ্ঞান হইল না। দ্বিতীয় রজনীতে মন্দকপালিনী মহামায়া ভবলীলা শেষ করিয়া চলিয়া গেল!

অতঃপর রামকমল লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। তিন বৎসর লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া সেও অনন্তধামে চলিয়া গেল।

দীনেশবাবু স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইতি-পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ইন্দুভূষণ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেশ কৃতিত্বের সহিত হাইকোর্টে ওকালতী করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইন্দুভূষণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গিরিবালার সংসার সুখের সংসারই রহিল।

সুকুমারী গুণবান্ পুত্র ও মনোমত পুত্রবধূ পাইয়া পরম-সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। রায়-পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণও তাঁহাদের সঙ্গে সুখী হইল।

নন্দগোপাল গাঁজা, মদ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কর্ম্মে মনোযোগ প্রদান করিল। সুধীরবাবু তাহার বিবাহের জন্য কন্যা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল না। ননীগোপাল একটু লেখা-পড়া শিখিয়াছে। সে সুকুমারীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত; দাদা বিবাহ করিল না বলিয়া সেও বিবাহ করিল না।

সুধীর বাবুর অবস্থার ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি নূতন নূতন জমিদারী খরিদ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকমল, নন্দগোপাল ও ননীগোপালের মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির তিনিই মালিক হইলেন। পুত্র, কন্যা, আমলা, কর্ম্মচারী, দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনবর্গে রায়বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। রায়পরিবারের পূর্ব্ব খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। ধনে জনে গৌরবে "**রায়-পরিবার**" সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

সমাপ্ত

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

নূতন, মনোহর, বিচিত্রঘটনাপূর্ণ বৃহৎ গার্হস্থ-উপন্যাস

রায়-পরিবার

ইহা একখানি সর্ব্বজন-প্রশংসিত বৃহৎ উপন্যাস গ্রন্থ। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। ২২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পঞ্চদশ সংস্করণ। স্বর্ণাক্ষরশোভিত উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

বঙ্গবাসী।—* * * পূর্ব্বের সোণার সংসারে কি পিশাচের খেলা খেলিতেছে, গ্রন্থকার বেশ লিপিচাতুরী দেখাইয়া সেই বীভৎস চিত্রই দেখাইয়াছেন। এ বর্ণনা পড়া ভাল, এ চিত্র দেখা ভাল। গ্রন্থকারের সকল শ্রম সার্থক। **হিতবাদী**।—এখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইহার রচনা সরল, ভাষা প্রাঞ্জল, উপাখ্যানাংশও কৌতূহলোদ্দীপক। সতীশ বাবু নূতন লেখক নহেন। তাঁহার পুস্তক সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। উপন্যাস পাঠকদিগের নিকট যে "রায়-পরিবারের"ও বিশেষ আদর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। **ঢাকা গেজেট**।—সতীশবাবু বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক। * * * বস্তুতঃ তাঁহার 'রায়-পরিবার' সত্য সত্যই বঙ্গসাহিত্যে এক অতি উপাদেয় অভিনয়-সামগ্রী বলিতে স্পর্দ্ধা হইতেছে। "রায়-পরিবারে"র অপূর্ব্ব মনোমোহিনী চরিত্রচ্ছটায় আমরা একবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। আদ্যোপান্ত শেষ না করিয়া পুস্তকখানা ছাড়িতে পারি নাই। বস্তুতঃ কি বর্ণনার চাতুর্য্যে, কি রচনার সমাবেশে, কি চরিত্রচিত্রণে, কি মুদ্রাঙ্কনে, সর্ব্ববিষয়েই রায়-পরিবার এক অভুতপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে। ভরসা করি, যাহারা বঙ্কিমের, তারকনাথের,

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সতীশচন্দ্রের "রায়-পরিবারে"র মাধুর্য্য অনুভব করিতে ভুলিবেন না। **বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী**।—"রায়-পরিবার" পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। পুস্তকের ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। * * * আমরা পাঠকগণকে এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারা সুখী হইবেন। **বিক্রমপুর**।—* * * আমরা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাষা যতদূর হয় প্রাঞ্জল ও মধুর এবং একান্ত বিশুদ্ধ। সুতরাং ভাই, ভগিনী, স্বামী, স্ত্রী, পিতাপুত্র, বন্ধুবান্ধব সকলেরই যুগপৎ পাঠ্যগ্রন্থরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। **সারস্বত পত্র**।—আমরা উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই উপন্যাসখানি বিশেষ আদর ও সম্মান পাইবার যোগ্য।

এতদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য ইংরাজী বাংলা সংবাদপত্র শতমুখে "রায়-পরিবারের" বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

দম্পতি-সুহৃদ্

যুবক-যুবতীর পরম সুহৃদ্। পঞ্চম সংস্করণ। বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

নব্য-ভারত, বঙ্গনিবাসী, সময়, ঢাকা গেজেট, বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, হিতবাদী, সহযোগী, শক্তি, সম্মিলনী, সারস্বত পত্র, কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়ান মিরর, হোপ প্রভৃতি অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্র "দম্পতি সুহৃদের" বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ তাহা উদ্ধৃত করা গেল না।

স্বামী-স্ত্রীর পত্র

৮০ পৃষ্ঠা ; কাগজ ও ছাপা ভাল, বাঁধাই মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সময়।—* * * ইহাও ললনা-সুহৃদের শ্রেণীর পুস্তক, স্ত্রীলোক-দিগের প্রয়োজনীয় নানাবিধ গার্হস্থ্য উপদেশে পূর্ণ। তবে সুখ-পাঠ্য করিবার নিমিত্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পত্র লেখালেখির ভাবে লিখিত। এই পুস্তক পাঠে অনেক বঙ্গাঙ্গনার বিশেষ উপকার হইবে। **সারস্বত পত্র**।—পত্র লেখালেখি দ্বারাও কিরূপে প্রকৃত উপকার হইতে পারে, স্বামী কিরূপে স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা ও স্ত্রী কিরূপে স্বামীকে অনুরক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন, সতীশ বাবু এই গ্রন্থে কতিপয় পত্র রচনা করিয়া তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। * * * **বঙ্গবাসী**।—পত্রে ভাল কথা আছে। **বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী**।—পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। * * * **ঢাকা গেজেট**।—স্বামী-স্ত্রীর পত্র পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহাতে রহস্য-কৌতুকের সঙ্গে সুকথা ও সদুপদেশ আছে। **বিক্রমপুর**।—স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী কতকগুলি উপদেশ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। **সারস্বত পত্র**।—(দ্বিতীয় সমালোচনা)—এদেশের নবদম্পতিগণ প্রণয়পত্রে রসিকতার ছড়াছড়ি না করিয়া এইরূপ হিতকর উপদেশ প্রদান করিতে শিখিলেই পত্র লেখার প্রকৃত সার্থকতা ঘটে।

"হিতবাদী" প্রভৃতি আরও অনেক বাংলা ইংরাজী সংবাদ ও সাময়িক পত্র স্বামী-স্ত্রীর পত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

ললনা-সুহৃদ্

দ্বাদশ সংস্করণ—১৫০ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। স্বর্ণাক্ষর শোভিত, উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই, মূল্য বার আনা।

সহচর—ললনা-সুহৃদ্-প্রণেতা বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঙ্গবালিকাগণের প্রকৃত সুহৃদ্। তিনি তাহাদিগকে সুভার্য্যা, সুজননী ও সুগৃহিণী হইবার নিমিত্ত যে সকল সদুপদেশ দিয়াছেন, তাহা অবশ্যপালনীয়। **বিজলী**—বঙ্গীয় রমণীগণের প্রত্যেকের এ পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। **সময়**—আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থখানি মহিলাদিগের উত্তম উপযোগী হইবে। **গরীব**—এরূপ সদুপদেশপূর্ণ স্ত্রীশিক্ষার পুস্তক বঙ্গভাষায় কমই আছে। **ঢাকা গেজেট**—"ললনা-সুহৃদ্"-প্রণেতা যে ললনাগণের যথার্থ সুহৃদ্, তাহা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায়। **শ্রীমন্ত সওদাগর**—ইহার ভাষা ধীর, শান্ত, নম্র, মধুর, পবিত্র।" কুসুমকোমলা রমণীর আদরের যত্নের ধন—'ললনা সুহৃদ্।" এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ আর কৈ? **বঙ্গবাসী**—এই পুস্তক পড়াইলে বালিকা স্ত্রীগণের অনেক উপকার হইবে। পুস্তকখানি বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে। **বামাবোধিনী পত্রিকা**—এই পুস্তক পাঠে স্ত্রীলোকসাধারণ বিশেষ উপকৃতা হইবেন। ইহাতে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে। **চারুবার্ত্তা**—বইখানি হিন্দুমহিলাদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। **প্রজাবন্ধু**—* * * যাহাদের জন্য ইহা বিরচিত হইয়াছে, তাহাদের করকমলে ইহা দেখিলে বড়ই সুখী হইব। **রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ**—হিন্দুললনার "ললনা-সুহৃদ্" বড়ই আদরের জিনিস। যিনি "ললনা সুহৃদ" পড়িয়া চরিত্র

গঠন করিবেন, তিনি আদর্শ হিন্দু নারী হইতে পারিবেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস। **মুর্শিদাবাদ পত্রিকা**—আমরা এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকখানি প্রত্যেক বঙ্গমহিলাকে পড়িতে অনুরোধ করি। প্রত্যেক বাবু ভায়ার স্ব স্ব স্ত্রীকে এক একখানি "ললনা-সুহৃদ্" ক্রয় করিয়া দেওয়া উচিত। **নব্য-ভারত**—গ্রন্থখানিতে মেয়েদের শিখিবার কথা আছে। **প্রচার**—ললনাগণের "এই সুহৃদের" সঙ্গে পরিচয় হয়—আমাদের ইচ্ছা। **ভারতী**—ললনাগণের নিকট বইখানি আদৃত হউক, এই বাসনা।

ইহা ব্যতীত কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ, ইণ্ডিয়ান মিরর, হোপ, ষ্টেট্‌শম্যান্, অমৃতবাজার-পত্রিকা প্রভৃতি সংবাদ পত্র এই পুস্তকের শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

আমার নিকট সতীশ বাবুর সকল পুস্তক প্রাপ্তব্য।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।